যুগল উপন্যাস

আরণ্য
ও
দীপিতা

বুদ্ধদেব গুহ

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

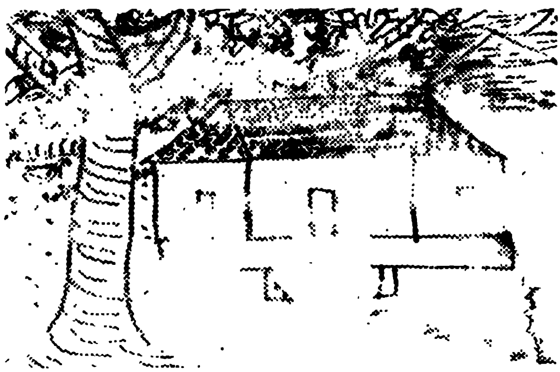
প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৬৩

প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর :
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস
বাণীরূপা প্রেস
৯এ, মনমোহন বসু ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

এই দুটি উপন্যাসে বর্ণিত কোনো চরিত্রের
সঙ্গে বাস্তবের কোনও চরিত্রের কিছুমাত্র
মিল থাকলে তা সম্পূর্ণই অনিচ্ছাকৃত এবং
দুর্ঘটনাপ্রসূত বলেই জানতে হবে।

মুক্তি মুখোপাধ্যায়
কল্যাণীয়াসু



তারা কোথায় গেল বল তো? পেছনে নেই তো?

চিকরাসি স্বগতোক্তি করল, বম্বে রোডে গাড়ি চালাতে চালাতে, সামনে তাকিয়ে।

পেছনে থাকতেই পারে না। ওরা কত আগে বেরিয়েছে।

জারুল বলল।

সবে সন্ধে নামছে। ওদের গাড়িটা বিদ্যাসাগর সেতু পেরিয়ে কলকাতার চক্কর এড়িয়ে এসে বম্বে রোড ধরে প্রায় কোলাঘাটের কাছাকাছি চলে এসেছে।

চিকরাসির গাড়ি চালাচ্ছে চিকরাসিই। সামনে বাঁদিকে বসে আছে গামহার। পেছনে জারুল। জারুল চিকরাসির বান্ধবী। আজকালকার বান্ধবী। তুই-তোকারি করে একে অন্যকে। বিয়ে এখনও হয়নি। তবে যে-কোনো সময়েই হতে পারে। ওরা আজকালকার ছেলে-মেয়ে বলেই আবার কোনোদিনও নাও হতে পারে। চিকরাসির স্টিভেডর বাবা নেপাল ব্যানার্জি প্রতি মাসে গাড়ি পাল্টাতেন। পুরনো দিনের রাজা মহারাজাদের যেমন আস্তাবল আর পিলখানা থাকত তেমনই ব্যানার্জির গাড়ির গ্যারাজ ছিল দেখবার মতো। দশ-বারোখানা নতুন গাড়ি এবং পাঁচ-ছটি অ্যান্টিক গাড়িও থাকত। 'The Statesman'-এর Vintage Rally-তে প্রথম দিন থেকে যোগ দিতেন নেপাল ব্যানার্জি। নেপাল ব্যানার্জির ছেলে চিকু ব্যানার্জি বাবার ব্যবসাতে যায়নি। সে সফটওয়্যারের ব্যবসা করে। ইনফরমেশান টেকনোলজি নিয়ে পড়াশুনা করেছে। সে তার বাবার মতো প্রতি মাসে গাড়ি পাল্টায় না কিন্তু প্রতি ছ'মাসে বান্ধবী পাল্টায়। তবে বান্ধবীরা পিলখানা অথবা গ্যারাজে থাকে না বলেই তাদের তার বাবার গাড়িগুলোর মতো একইসঙ্গে দেখা যায় না এক জায়গাতে পাশাপাশি।

চিকরাসি ওরফে চিকু ব্যানার্জি কলকাতার নাম-করা প্লে-বয়। প্লে-বয় যদিও কিন্তু চল্লিশেই তার গভীরতা, ব্যক্তিত্ব এবং বুদ্ধি অনেক পরিণত বয়স্ক মানুষের থেকেও বেশি। এটা অন্য অনেকেরই মতো গামহার ঘোষ-এরও মত।

গামহার, বয়সে চিকরাসির চেয়ে অনেকই বড়। ওরা যদিও গামহারকে দাদা বলে, সে বয়সের দাবীতে ওদের কাকাও হতে পারত সহজেই। গামহার আর্টিস্ট। জলরঙ তার মাধ্যম। অ্যাকোয়ার কাজও করে। আজকাল জল ছেড়ে অ্যাক্রিলিক-এ গেছে। স্বভাবে বোহেমিয়ান। এতোদিন তার আঁকা ছবি, ছবির বাণিজ্যিক জগতে কল্কে পায়নি। ক্রিকেটারদেরই মতো, অ্যাড মডেলদেরই মতো, এখন চিত্রকরদের বাজারও খুবই ভাল।

প্রৌঢ়ত্বের শেষে পৌঁছে গামহার অর্থ এবং স্বীকৃতি দুই-ই পেয়েছে। তবে তাতে সে অভিভূত বা উত্তেজিত হয়নি। জাগতিক অসাফল্য এতো বছর তাকে যেমন পীড়িত করেনি, সাম্প্রতিক অতীত থেকে অর্থ ও যশের এই চকিত উৎসারও তাকে আদৌ বিচলিত বা উত্তেজিত করেনি। যেমনটি ছিল, তেমনটিই আছে। ব্যর্থতা ও সাফল্য একই পর্দাতে তার মনে বেজেছে, সে প্রকৃত আর্টিস্ট বলেই। কবিতা লিখলে বা ছবি আঁকলে বা গান গাইলেই শুধু সে কারণেই সৃষ্টিশীল শিল্পীসত্তা কোনো মানুষের মধ্যে বর্তে যায় না। তার লক্ষণ আলাদা।

বিয়ে একটা করেছিল গামহার অতি অল্পবয়সে। বিয়ের মানে না জেনেই। সে নিজেও ঠিক করেনি পাত্রী। তার বিধবা মা-এর একজন সঙ্গী ও খেলার পুতুলের প্রয়োজন ছিল বলে তিনিই পছন্দ করে এনেছিলেন লালিকে। গামহার-এর মানসিকতা ও রুচির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। থাকবার মধ্যে তার সুস্পষ্ট লক্ষণ-যুক্ত একটি নারী-শরীর ছিল। ক্যাটক্যাটে লাল রঙ পছন্দ করত। রবীন্দ্রসঙ্গীত পছন্দ করত না। এবং একসঙ্গে চারটে হাঁসের ডিমের ওমলেট খেতো। গামহারকে পৌনঃপুনিকভাবে সাহেবদের মতো আদর করতে উপদেশ দিতো বলে বিয়ের দেড় মাস পরই তাদের ডিভোর্স হয়ে যায়। নৈকট্য তেমন কখনও যেমন হয়নি, বিচ্ছেদটা তাই আদৌ বুঝতে পারেনি গামহার।

গামহার ঘোষ অত্যন্তই সূক্ষ্ম রুচির শিল্পী মানুষ। তার সূক্ষ্মতাটা লোক-দেখানো নয়। শুধু অন্য সূক্ষ্ম মানুষই তার সূক্ষ্মতাটা বুঝতে পারত। নিজেকে অন্যের কাছে জাহির করবার বা নিজেকে বোঝানোর কোনো তাগিদও তার ছিল না কোনোদিনও। তার নিজের নিজস্ব একটা পৃথিবী ছিল। সেখানে সে একা-একাই সুখী ছিল নিরন্তর। এবং এখনও আছে। এই অতি-সূক্ষ্ম রুচির কারণেই অনেক স্থূল-রুচি পুরুষ তাকে মেয়েলি বলে এসেছে। তার চেহারাটা একটু নরম-সরম। তার জাগতিক সাফল্যের অভিঘাত তার উপর পড়েনি যে, তার আরও একটা কারণ এই যে, নিজের নাম-যশ-অর্থের জন্যে কখনও কাঠ-খড় পোড়ায়নি। যারা তা পোড়ায়, তাদের সে তার শিল্পীসুলভ মানসিকতাতে ঘেন্না করে। সে ঘেন্নাটা প্রকাশ করার নয় বলেই সেই ঘেন্নাটা তার অভ্যন্তরে সঞ্চিত হয়। সঞ্চিত হতে হতে তা পুঞ্জীভূত হয়ে গেছে। কোনোরকম ঘেন্না প্রকাশ করাতেই সব ভদ্রলোকেরই জন্মগত অনীহা, তাই সেই ঘেন্নার প্রকাশ ঘটেনি। কোষবৃদ্ধি-হওয়া পুরুষের মতো অন্যের চোখের আড়ালে এই ঘৃণার ভার স্ফীত-অণ্ডকোষের মতোই বয়ে বেড়িয়েছে গামহার। এবং বয়ে বেড়াচ্ছে।

বছর তিনেক হলো, বলতে গেলে হঠাৎই একজন ফরাসিনীর চোখে পড়াতে গামহার ঘোষের ছবির কদর হয়েছে সারা পৃথিবীতে এবং ক্রমশ আরও হচ্ছে। এই বিলম্বিত সাফল্যে তেমন আনন্দিত বা আলোড়িত হতে পারেনি গামহার। যে-মানুষের সৃষ্টি দেশের মানুষের চোখেই পড়ল না গত তিরিশ বছর, সেই মানুষই এখন পাদপ্রদীপের আলোর সামনে চলে এলো শুধুমাত্র একজন বিদেশিনী সমালোচকের প্রশংসাতে, এটা মনে করেই গামহার-এর লজ্জা হয়। এই লজ্জা নিজের কারণে যতটা না হয় তার চেয়ে অনেকই বেশি হয় দেশের মানুষদেরই কারণে। লজ্জার কারণটা বুঝিয়ে বলতে পারে না সকলকে। বোঝানোর বোধহয় প্রয়োজনও তেমন বোধ করে না।

কী ভাবছ গামহারদা। চুপচাপ কেন?

জারুল বলল।

ভাবছি, জুনিপারকে নিয়ে এলে বেশ হতো। জঙ্গল না দেখলে তো ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। কলকাতা, দিল্লী, বম্বে, ব্যাঙ্গালোরে আর যাই হোক আসল ভারতবর্ষ তো নেই।

তা ঠিক। তা, নিয়ে এলেই পারতে। ও গাড়িতে তো অনেকই জায়গা ছিল।

ও যে পরশুই চলে গেল মনট্রিয়ালে। আবার আসবে পুজোর পরে, প্যারিস হয়ে।

ঠিক আছে। তখন একবার জঙ্গলে নিয়ে চলো। শীতে ওঁর কষ্টও কম হবে।

কষ্ট কিসের? এখনকার গাড়ি তো সবই এয়ার-কন্ডিশানড। এপ্রিলই হোক, কী মে।

তা বটে। তবে জঙ্গল তো আর এয়ার-কন্ডিশানড নয়। তাছাড়া মে মাসে পাগল আর চোরাশিকারী ছাড়া কেউই জঙ্গলে যায় না।

জারুল বলল, এই এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেও গরম কম পাবে না গামহারদা। জঙ্গলের গরমটা অনেকটা প্রেমে পড়ার মতো। হঠাৎ, কখন যে ব্যাপারটা ঘটে যায়, বোঝা পর্যন্ত যায় না! গভীরে ঢুকে যাওয়ার পরে, অবশ্য গরম কম লাগে, তবে রাতে তো খুবই প্লেজেন্ট। কম্বল গায়ে দিয়ে শুতে হবে। মার্চ মাসেই ভীষণ গরম পড়ে যায় ওড়িশাতে।

দেখি! নাম শুনেছি এতো সিমলিপালের। কেমন জায়গা দেখা যাবে। তোমাদেরই কল্যাণে।

জারুল বলল, তুমি আর কোন কোন জঙ্গল দেখেছ গামহারদা?

আমি? না, না। কোনো জঙ্গলই প্রায় দেখিনি। মামাবাড়ি ছিল কেষ্টনগরের নেদেরপাড়াতে। ছেলেবেলাতে সে-পাড়ার সব বাড়িতেই প্রায় বড় বড় বাগান ছিল। আম-জাম-কাঁঠালের। জঙ্গল বলতে ওই। আর খুব ছেলেবেলাতে একবার গেছিলাম হাজারিবাগে। সেখানে খুবই জঙ্গল ছিল। আবছা আবছা মনে আছে। বড়মামার সঙ্গে গেছিলাম মামার এক বন্ধুর বাড়িতে। ওঁরা ওখানকারই বাসিন্দা। মামা খুবই ভীতু মানুষ ছিলেন। বাঘ দেখার কোনো ইচ্ছাই তাঁর ছিল না কিন্তু কলকাতা থেকে এসেছি শুনে বাঘই আমাদের দেখবার জন্য রামগড়ের ঘাটের পথের মাঝে বসেছিল। সবে সন্ধে হয়েছে তখন। বাঘ দেখে তো বড়মামা তাঁর বন্ধুকে আলোয়ান সমেত এমনই জড়িয়ে ধরেন যে, গাড়ি প্রায় খাদে চলে যায় আর কী। আর আমার মা নাকি বাঘ দেখে গাড়ির মধ্যে অজ্ঞানই হয়ে গেছিলেন। কথায়ই বলে, নরানাং মাতুলক্রমঃ। যার বড়মামা এতো ভীতু তার ভাগ্নে সাহসী হয় কী করে বল?

চিকরাসি আর জারুল হেসে ফেলল গামহার-এর সরল স্বীকারোক্তিতে।

ওরা দু'জনে হাসতেই পারে। জঙ্গলের পোকা ওরা দু'জনেই। জারুল জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বন্যপ্রাণী ও পাখির ছবি তোলে। পরিবেশ-প্রতিবেশ নিয়ে একটি কাগজও করার ইচ্ছা আছে। কানহার জঙ্গলেই গত শীতের আগের শীতে ওদের দু'জনের আলাপ হয়। তারপরই ঘনিষ্ঠতা। তারপর থেকে চিকরাসি আর জারুল জঙ্গলে গেলে একই সঙ্গে যায় দু'জনে। কলকাতাতেও প্রায় প্রতি উইক-এন্ডেই দেখা-সাক্ষাৎ হয়। চিকু ব্যানার্জির এই বান্ধবী প্রায় বছর দুই টিকে যে গেল, এনিয়ে কলকাতার হাই সোসাইটিতে গুজ-গুজ ফুস-ফুস-এর শেষ নেই।

জারুল তার তোলা ওয়াইল্ড-লাইফ-এর ছবি বিক্রি করে দেশি-বিদেশি নানা পত্র-পত্রিকায়। আজকাল ওয়াইল্ড-লাইফ ফোটোগ্রাফি রীতিমতো একটি লাভজনক পেশা হয়ে গেছে। বন ও বন্যপ্রাণী নিয়ে লেখালেখি তো প্রফেসন হয়েছেই। পেশা হয়ে উঠছে বলেই

ভালবাসা কমছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তো আর পয়সার জন্য অরণ্যকে ভালবাসেননি।

ক্যালকাটা স্যুইমিং ক্লাবে শুক্রবার রাতে ক্যান্ডল-লাইট ডিনার খায়, তাজ-এর কফিশপে টুকটাক, ওবেরয়ের নতুন থাই-রেস্তোরাঁতে শনিবার রাতে ডিনার। পয়সা রোজগারটা ওদের কাছে কোনো সমস্যাই নয়, পয়সা কীভাবে খরচ করবে সেইটাই সমস্যা। যত টেনশান, তা নিয়েই।

গামহার ঘোষের যৌবন চলে গেছে বলেই যৌবনের দাম সে বোঝে। বোঝে যে যৌবন, দাঁত অথবা জন্মদাত্রী মায়েরই মতো। থাকতে, কম মানুষই কদর করে তার, প্রকৃত দাম বোঝে।

নিজের যৌবন চলে গেছে অবশ্যই। তবে সেটা শরীরেরই যৌবন। মনে মনে গামহার ঘোষ অনেক যুবকের চেয়েও অনেকই বেশি যুবক। এবং সে-কারণেই সে প্রায়ই ভুলে যায় যে, সে যুবক নয়। ফলে, নানারকম বিপদ-আপদ-এরও সম্মুখীন হতে হয়। ছোট-বড়। শারীরিক এবং মানসিক।

ঐ তো ঝাঁঝিরা!

জারুল, গামহারকে চমকে দিয়ে পেছন থেকে বলে উঠল।

চিকরাসিদের গাড়ি ততক্ষণে কোলাঘাটের ব্রিজ পেরিয়ে ওপারে নামছে।

হারিত আর ঝাঁঝি ওদের মারুতি এস্টিম গাড়ি থেকে নেমে, গাড়িটা পথের বাঁদিকে দাঁড় করিয়ে গাড়িতে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছিল চিকরাসিদের জন্যে। সাদা গাড়ি।

চিকরাসি ঘাড় নিচু করে গামহার-এর কাঁধের পাশ দিয়ে হারিতকে বলল, কি? তোমরা কতক্ষণ?

মিনিট পনেরো।

এগিয়ে গেলে না কেন?

বাঃ। একটা রাঁদেভু পয়েন্ট ঠিক না করে এগিয়ে যাওয়া কি ঠিক হতো? বলো, কোথায় দাঁড়াব?

চলো, সোজা গ্রীনফিল্ডস-এ গিয়ে দেখা হবে। খড়গপুরের গোলাই-এর পরে।

ওখানে যাবে? শুনেছি জায়গাটা খারাপ হয়ে গেছে। মালিকে মালিকে কেস চলছে।

সে কি! সর্দারজীরাও বাঙালি হয়ে গেল কবে থেকে?

আরে এতোদিন এখানে আছে, জল-হাওয়া তো লেগেছে।

তা ঠিক।

চলোই, না দেখা যাক। শুনেছি একটা নতুন হোটেলও হয়েছে গ্রীনফিল্ডস-এর আগে। পথের বাঁদিকে।

কোথায় যাবো তাহলে? ঠিক করে বলো।

না। গ্রীনফিল্ডস-এই চলো। আ নোন ডেভিল ইজ বেটার দ্যান অ্যান আননোন ওয়ান। ওখানেই খেয়ে-দেয়ে রাতটা কাটিয়ে ভোরে এক কাপ করে চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ব। তাহলে চাহালাতে দশটা নাগাদ পৌঁছে যাব।

ঠিক আছে। তাহলে এসো তোমরা।

আমরা এগোই। বলে, ওরা এগিয়ে গেলো।

চিকরাসি স্টিয়ারিংয়ে গিয়ে বসলো।



হারিত আর ঝাঁঝির সঙ্গে গামহার-এর একবারই আলাপ হয়েছে চিকরাসির বাড়ির এক পার্টিতে। প্রথম দর্শনেই এই ঝাঁঝি মেয়েটিকে ভারী ভাল লেগেছিল গামহার ঘোষের। এই ভাল লাগাটার মধ্যে এক বিশেষত্ব আছে। এই ভাললাগার রকমটা সকলের বোঝার নয়। হোসেইন-এর যেমন মাধুরী দীক্ষিতকে ভাল লাগে, হিমতোষ-এর কাজলকে, গামহার-এর তেমনই ভাল লেগেছে ঝাঁঝিকে। একজন সাহিত্যিক যেমন কোনো নারীকে ভাল লাগলে তাকে তাঁর উপন্যাসের নায়িকা করেন, নাম-ধাম, গায়ের রঙ, সামাজিক প্রতিবেশ বদলে দিয়ে। একজন শিল্পী কিন্তু তা করেন না। হয়ত পারেনও না। তাঁর ভাললাগার নারীকে রক্তমাংস ধার দেন তিনি তুলি আর রঙ দিয়ে, তাঁর কামনা আর কল্পনা দিয়ে। কারোকে ভাললাগার ঝুঁকিটা তাই একজন শিল্পীর, একজন সাহিত্যিকের কোনো নারীকে ভাললাগা বা ভালবাসার ঝুঁকির চেয়ে অনেকই বেশি। সাহিত্যিক নিজেকে আড়াল করতে পারেন, ক্যামোফ্লেজ করতে পারেন কিন্তু শিল্পী সহজেই ধরা পড়ে যান। সে-কারণেই হয়ত একজন শিল্পীর ভালবাসা নারীরা সহজে বুঝতে পারেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই সেই ভালবাসার প্রতিদানও দেন। সাহিত্যিক তাঁর নিজের সৃষ্টির জালে নিজেই ঢাকা পড়ে যান। তাঁর ভাললাগা বা ভালবাসা তাঁর ভাললাগার নারীর কাছে অনেক সময়ে পৌঁছয়ই না পর্যন্ত। সে-নারীর বই-টই পড়ার অভ্যেস না থাকলে বা সেই নারী বুদ্ধিহীন বা কম বুদ্ধিমতী হলে তো পৌঁছয় নাই-ই।

লম্বা, কালো, ছিপছিপে, ভারী সুন্দর করে সাজাতে জানে নিজেকে ঝাঁঝি। সাধারণে সুন্দরী বলতে যা বোঝান তা সে আদৌ নয়। ফিগারটি সুন্দর। ব্যক্তিত্বময়ী। মুখটি যে খুব একটা সুন্দর তাও নয়। বরং সাধারণ। এই সাধারণের মধ্যেই অসাধারণত্ব খুঁজে পায় সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক অথবা শিল্পীর চোখ। তাঁরা যে তাঁদের কলম এবং তুলি দিয়ে ভিখারিণীকে রানীতে পর্যবসিত করতে পারেন মুহূর্তে সে-কথা তাঁদের নিজেদের মতো আরও কেউই জানেন না। জানেন না বলেই, তাঁদের এই ঐশী ক্ষমতাতে তাঁরা ন্যায্যত গর্ববোধ করেন। বাস্তবকে তুচ্ছ করার ক্ষমতা, নস্যাৎ করার ক্ষমতা, একমাত্র বিধাতার আছে আর আছে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের। তাই তো তাঁরা দ্বিতীয় বিধাতা। গামহার আসলে সঠিক বুঝতে পারে না ব্যাপারটা ঠিক কি? ঝাঁঝিকে দেখলেই তার মধ্যে ঝাঁঝিকে শারীরিকভাবে পাবার আকাঙ্ক্ষা জাগে। গামহার যে এখনও এতখানি যুবক আছে তা ঝাঁঝিকে যতবারই দেখে ততবারই বুঝতে পারে। কোনো পুরুষ অথবা কোনো নারীই যে-কোনো নারী বা

পুরুষকে দেখে শারীরিক আকর্ষণ বোধ করেন না। এই ব্যাপারটা আগে থাকতে বোঝা পর্যন্ত যায় না। যখন বোঝা যায়, তখন শরীরে বৈদ্যুতিক শক লাগে।

নিজের ভাবনার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে গামহার একটু কেশে, গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, একটু চা খেলে হতো না চিকু?

এয়ার-কন্ডিশানড গাড়িতে গামহার-এর গলা ধরে যায়। গামহার-এর আবার সায়নাসাইটিস আছে। এয়ার-কন্ডিশানার থেকে যে ধুলো বেরোয়, তা থেকে অনেক সময়ে ন্যাজাল অ্যালার্জিও হয়। চিকরাসির গাড়ি রীতিমতো ফ্রিজের মতো ঠাণ্ডা।

চিকরাসি বলল, তুমি যা বলবে দাদা। অলওয়েজ অ্যাট ইয়োর সার্ভিস।

বলেই, বলল, চলো। সামনে ডানদিকে একটা ভাল ধাবা আছে। সেখানে খাব।

শুধু চাই-ই তো?

হ্যাঁ। আবার কি?

লেড়ো বিস্কুট পাওয়া যাবে না?

জারুল বলল।

ওর কথাতে হেসে উঠল চিকরাসি আর গামহার।

একটু পরেই গাড়ি থামাল চিকরাসি।

আমার কিন্তু কম দুধ কম চিনি।

গামহার বলল।

আমার শুধুই পাতলা লিকার। দুধ-চিনি ছাড়া।

জারুল বলল।

আমার বেশি দুধ বেশি চিনি।

চিকরাসি দরজার কাছে এসে-দাঁড়ানো ধাবার ছেলেটিকে বুঝিয়ে দিল তিনরকম চায়ের কথা।

জারুল বলল, লেড়ো বিস্কিট হ্যায় ভাই?

কী বিস্কিট বইলতেচেন মা?

লেড়ো।

নাই। ব্রিটানিয়া আচে।

দু-স্স্। শুধু চা-ই দাও।

চিকরাসি হেসে উঠল।

বলল, ঠিক আছে। জঙ্গলে তোমাকে লেড়ো বিস্কিট খাওয়াব।

কী করে?

বাঃ। চপ-এর ক্র্যাম-এর জন্য আনিনি বুঝি সঙ্গে? চিকু ব্যানার্জির বন্দোবস্তে কিছুমাত্র খুঁত-খামতি পাবে না। বুঝেছো ম্যাম।

সেই জন্যেই তো তোমার উপরে এমনই নিশ্চিন্তে বডি ফেলে দিই।

হাসতে হাসতে বলল জারুল।

চা খেতে খেতে গামহার ভাবছিল, ঝাঁঝি নামটাও খুব সুন্দর। একবার ওদের পাড়ার লেবুদার সঙ্গে মল্লিকপুরের বিলে তালের ডোঙা করে মাছ ধরতে গিয়ে নৌকো উল্টে দম বন্ধ হয়ে মারা যেতে বসেছিল ও। সেই জলজ গন্ধের হালকা ও গাঢ় উজ্জ্বল সবুজ ও হলুদ-

রঙা গোছা গোছা মসৃণ ঝাঁঝির কথা গামহার কখনও ভুলবে না। সেই ঝাঁঝিজনিত বিপদে ও মারাত্মকভাবে জড়িয়ে গেছিল। তাই ঝাঁঝি শব্দর উচ্চারণেই ও বিপদের গন্ধ পায় নাকে। সত্যি ঝাঁঝি নয়, মানবী ঝাঁঝিকে দেখলেও সেইরকম অনুভূতিই হয়। মৃত্যুর গন্ধ আসে নাকে।

প্রথমবার যখন দেখা হয়, তখন সেই রাতে চিকরাসির বাড়ির পার্টিতে সামান্যক্ষণ-দেখা ঝাঁঝিকে ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেনি। তারপরেও বার তিনেক দেখা হয়েছে। যতই দেখেছে ততই সেই মল্লিকপুরের বিলের ঝাঁঝিরই মতো ঝাঁঝিতে জড়াচ্ছে গামহার, বুঝতে পারে।

একে অন্যকে সঠিকভাবে বোঝাবুঝির জন্যে প্রকৃতিই সবচেয়ে ভাল জায়গা বোধহয়। মনে হয়। গামহার ঘোষ প্রকৃতি নিয়ে এ-পর্যন্ত তেমন কিছু আঁকেইনি। চিকরাসিই বলতে গেলে জোর করেই ওকে নিয়ে চলেছে এবারে। বলেছে, বসন্তর বনই না দেখে তুমি এতো বছর ছবি আঁকলে কী করে গামহারদা তা তো আমি বুঝেই উঠতে পারি না। ন্যাংটো মেয়ে এঁকে এঁকে কি আর্টিস্ট হওয়া যায় সত্যিকারের! তোমাদের ঐসব আর্ট কলেজের শিক্ষা-পদ্ধতিটাই ভুল। আর্টিস্টের মতো আর্টিস্ট তৈরি করতে হলে তাদের প্রথমেই সব সেরা আর্টিস্টের স্টুডিওতে নিয়ে যাওয়া উচিত।

সেটা কোথায়? কার স্টুডিও?

অন্যমনস্ক গামহার জিজ্ঞেস করেছিল।

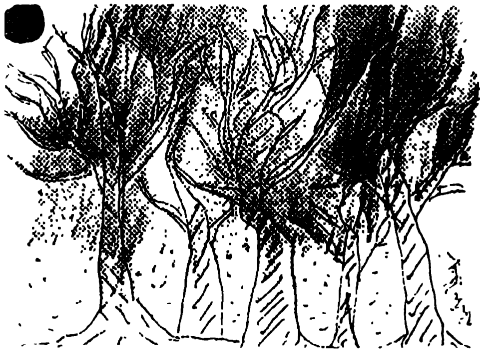
জারুল বলল, সত্যি তুমি গামাদা! সেটা প্রকৃতি। ঈশ্বরবাবুর স্টুডিও। সেখানেই তো নিয়ে যাচ্ছি তোমায় আমরা। একবার গেলে, বারবার যেতে হবে, হিমালয়েরই মতো টানবে বন-জঙ্গল তোমাকে। যে-কোনো পর্বতারোহী আর ট্রেকারদের জিজ্ঞেস করে দেখো তুমি, তারা তোমাকে বলবে সেই টান-এর কথা। যারা জানে, তারাই জানে।

গামহার বলল, ডাকো ছেলেটাকে। পয়সাটা দিই। তারপর যাওয়া যাক।

তুমি পয়সা দেবে কি? তুমি আমাদের গেস্ট। তোমার সঙ্গে যে পার্স আছে সে-কথাটাই ভুলে যাও। তুমি বরং পরে আমাদের একবার বেড়াতে নিয়ে যেও, তখন আমরা আমাদের পার্স বাড়িতে রেখে আসব। এ যাত্রা তোমার পার্স-এ তুমি হাতই ছোঁয়াতে পারবে না।

যা বলো তোমরা। 'পড়েছি যবনের হাতে খানা খেতে হবে সাথে'।

সুন্দরী মাত্রই বিপজ্জনক। কে যে কার চোখে সুন্দরী, কার জন্যে কে বিপজ্জনক তা ঈশ্বরই জানেন। একে ঝাঁঝি-জনিত বিপদের কথা ভেবেই আতঙ্কিত গামহার ঘোষ তার উপর আবার Mummy of All Mummies—প্রকৃতি। এক অজানা, নিরাবয়ব, অপ্রত্যক্ষ ঝাঁঝি টু দ্যা পাওয়ার এন-এর ভয়ে গামহার-এর মন জঙ্গলে পৌঁছবার অনেক আগে থেকেই ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।



চিকরাসি যখন গাড়িটা ঢোকাল ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে ডানদিকে কিছুটা গিয়ে গ্রীনফিল্ডস-এর হাতাতে তখন রাত হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। তবে চাঁদ ওঠেনি তখনও। চতুর্থী কী পঞ্চমী। চাঁদ উঠতে এখনও দেরি আছে।

হারিতরা ততক্ষণে পৌঁছে গিয়ে চেয়ার-টেয়ার বাইরে বের করিয়ে লন-এ পাতিয়েছে। গ্রীনফিল্ড লজ-এর একটা অংশ কোনো ব্যাঙ্ককে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। গামহাররা গাড়ি পার্ক করে নামতে নামতে ব্যাঙ্কের আলোগুলো সব নিভে গেল এক এক করে। লন-এ একটা আলো আছে। কয়েকটা রোগা-রুখু ইউক্যালিপটাস গাছ। ওরা গিয়ে বসতে না বসতেই মশা ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। গামহার যেদিকে বসেছে সেদিকটা আধো-অন্ধকার। আলোটা আটকে যাচ্ছিল ইউক্যালিপটাসের ডালে। কামড়াতে লাগল মশা। গামহার জিনস পরে রয়েছে, তাই পায়ের পাতা গোড়ালি, মুখ এবং হাত ছাড়া অন্যত্র অবশ্য কামড়াতে পারছিল না। ঝাঁঝি ঠিক গামহার এর উল্টোদিকের চেয়ারে বসেছিল। একটা ঝাঁঝি-রঙা ফিকে হলুদ শিফনের শাড়ি পরেছিল সে। গায়ে সবুজ ব্লাউজ-এর সঙ্গে হাতে সবুজ ব্যান্ডের হাতঘড়ি। তার মুখের একটা দিকে আলো পড়ে তাকে আরও ব্যক্তিত্বময়ী দেখাচ্ছিল। পাছে ঝাঁঝির মুখটাকে দু'চোখ ভরে দেখতে না পায় তাই যথেচ্ছ মশা কামড়ানো সত্ত্বেও ওই চেয়ার ছেড়ে গামহার বেশি আলোতে পাতা অন্য চেয়ারে উঠে গেল না। ও যে আর্টিস্ট। ওর দেখার চোখই আলাদা, ও ফুল দেখে, প্রজাপতি দেখে, সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখে যেমন আনন্দ পায় তেমনই এক অতীন্দ্রিয় আনন্দ পাচ্ছিল ঝাঁঝির মুখের দিকে চেয়ে। একজন আর্টিস্ট বা কবির চোখ যা দেখে, তা কি সাধারণে কখনও দেখতে পায়?

গ্রীনফিল্ডস-এ খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত নেই। হাইওয়ের ওপরে সর্দারজীদের ভাল ধাবা আছে। সেখান থেকে খেয়ে আসেন অনেকেই। এদের বললে, এরাও এনে দেয়। তবে চিকরাসি সঙ্গে করে চারটি বড় ক্যাসারোল নিয়ে এসেছে। গাড়ি নিয়ে গিয়ে ও গরম গরম খাবার নিয়ে আসবে।

গামহার বলল, আমাকে কী করতে হবে বলো?

তোমাকে কিছুই করতে হবে না। রিল্যাক্স করো। এনজয় করো। আমরা ছোট ভায়েরা আছি কী করতে!

গামহার-এর কোনো ভাই নেই। এক দিদি। দিদি তো স্পেইন-এ থাকতেই মারা গেছেন। বড় জামাইবাবু ফরেন সার্ভিসে ছিলেন। তিনিও আর নেই। রিটায়ার করার পরেই

মারা গেছেন। গামহার লক্ষ্য করেছে যে অধিকাংশ চাকরিসর্বস্ব চাকরিজীবীরাই রিটায়ার করার পরপরই চলে যান। যাদের চাকরি ছাড়াও অন্য কোনো শখ, বা নেশা, বা ধ্যান থাকে তারাই চাকরি ছাড়ার পর বাঁচেন এবং আনন্দেই বাঁচেন। গামহার যেহেতু চাকরি করে না, ছবি আঁকে, ওর রিটায়ারমেন্ট নেই। যতদিন শরীরে কুলোবে, ইচ্ছে করবে, ততদিন ছবি এঁকে যাবে। তবে চিকরাসির কথাতে মনে পড়ল যে, ওর ভাই-বোন না থাকার দুঃখ চিকরাসির মতো অগণ্য ভায়েরা পূর্ণ করে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলতেন না যে, যেই আত্মার কাছে থাকে সেই তো আত্মীয়। রক্তসূত্রের আত্মীয়তার মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই। যে আত্মীয়তা মানুষে জীবনের পথে চলতে চলতে অর্জন করে নিজের ব্যবহারে, গুণে, রুচিতে, মানসিকতাতে সেই আত্মীয়তাই আসল আত্মীয়তা। সেই অর্থে এই চিকরাসি তার আসল ভাই-এর চেয়েও হয়তো আপন। আপন ভাই থাকলে হয়তো তুলনা করে দেখতে পারত। নেই বলে, সেই তুলনা করার উপায় নেই। ভাগ্যিস নেই।

জারুল গাড়ি থেকে নেমেই বাথরুমে গেছিল। তিনটি ঘর খুলে দিয়েছে এরা। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে ঘরে। হারিত হুইস্কি ও রাম-এর বোতল এনে টেবিলের ওপরে রাখল। গ্লাসগুলো, কলকাতা থেকে আনা ন্যাপকিন দিয়ে ভাল করে মুছল। আইস-বক্সে করে বরফও এনে দিল বেয়ারা।

চিকরাসি বলল, দাদার জন্যে স্কচ এনেছি। দাদা স্কচই খান। বুঝলে, হারিত।

গামহার বলল, তোমাদের জন্যে একটি জ্যাপানীজ হুইস্কি এনেছি আমি। সানটোরি। টুয়েলভ ইয়ার্স ওল্ড। আমার ছবির একজন অ্যাডমায়রার তপন মিত্র টোকিও থেকে নিয়ে এসেছেন। টোকিওতে ওঁদের কোম্পানির ব্রাঞ্চ আছে। প্রায়ই যেতে হয় কাজে।

হারিত বলল, ওটা জোরান্ডাতে গিয়ে খোলা হবে।

চিকরাসি কী একটা বলতে যাচ্ছিল এমন সময়ে প্রচণ্ড আর্তনাদ করে প্রায় লাফাতে লাফাতে জারুল ঘর থেকে বাইরে এল দড়াম করে দরজা খুলে।

ওরা সকলেই দাঁড়িয়ে উঠল, কী হলো? কী হলো? বলে। দম নিতে কষ্ট হচ্ছিল জারুল-এর। সে বিবর্ণ মুখে বলল, ইঁদুর।

কোথায়?

ঝাঁঝি শুধোল।

কোথায় নয় বলো? ঘরে, বাথরুমে। এত বড় বড় ইঁদুর যে নাক-কান খেয়ে ফেলবে মুহূর্তের মধ্যে।

চিকরাসি বলল, সেজন্যে এমন চিৎকার করবে! আমি তো ভাবলাম ঘরের মধ্যে কেউ লুকিয়ে থেকে তোমাকে রেপই করতে গেল বুঝি। প্রত্যঙ্গ খেয়ে ফেলার ভয় তো তোমাদের থেকে আমাদের, মানে পুরুষদেরই বেশি।

ঝাঁঝি মুখ ফিরিয়ে নিঃশব্দে হাসল।

জারুল চিকরাসির কথাটার মানে প্রথমে বুঝতে পারল না, পরক্ষণেই বলল, এত অসভ্য না তুমি!

গামহার বলল, চলো তো ঘরগুলো একটু দেখে আসি। থাকার মতো না হলে কিন্তু রাতে থাকব না। তার চেয়ে সারারাত গাড়ি চালিয়ে চলি চলো, এখানে খাদ্য-পানীয়র শ্রাদ্ধ করে।

তারপর হারিতের দিকে চেয়ে বলল, জঙ্গলে প্রথমে আমরা যেখানে যাব সেখানে পৌঁছতে ক'ঘণ্টা লাগবে?

এখান থেকে কখন বেরোব আমরা তারই ওপর ডিপেন্ড করছে।

এখন বাজে সাড়ে ন'টা প্রায়। যদি এখানে না থেকে রাত এগারোটা নাগাদ বেরোই তবে আস্তে আস্তে চালিয়ে গেলে যোশিপুরের আগেই বাঁদিকে ঢুকে গিয়ে চাহালা পৌঁছে যাব সকালেই।

তাহলে তো ভালই।

তার আগে ঘরগুলো তো দেখা যাক। বলে, ওরা তিনজনেই গেল ঘর দেখতে। বিছানা, বেড-কভার, বালিশের তেলচিটে ও মর্দিত চেহারা দেখে হারিত বলল, এসব ঘর তো দেখছি ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া দেওয়া হয়।

গামহার বলল, ইঁদুর কেন? এখানে বাঘ থাকাও আশ্চর্য নয়।

চিকরাসি বলল, তার চেয়েও বড় কথা এই বিছানাতে রাত কাটালে এইডস হবে নির্ঘাৎ।

যে বেয়ারা বরফ নিয়ে এসেছিল, সে বলল, ভাল করে স্প্রে মেরে গুডনাইট জ্বালিয়ে দেব স্যার। মচ্ছর লাগবে না।

গুডনাইটে কি ইঁদুর মরবে?

ইঁদুর কোথায়? মাঠ থেকে হয়তো জানালার ভাঙা কাঁচ দিয়ে একটা হঠাৎই ঢুকে এসেছিল।

তার কথা শেষ হতে না হতেই বাথরুম থেকে একটা এবং খাটের তলা থেকে আরেকটা বেড়ালের মতো ইঁদুর লাফ মেরে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে ওদিকের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

হারিত বলল, দ্যা ডিসিশন ইজ মেড। চলো, খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়ি। সারারাত গাড়ি চালালে রাফিং হবে। ছেলেবেলায় জি টি রোড দিয়ে গাড়ি চালিয়ে বার্নপুরে বড়পিসের বাড়ি যেতাম। রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর বেরোতাম। ধীরে সুস্থে গিয়ে গরম গরম সিঙ্গাড়া-জিলিপি কিনে নিয়ে পিসি-পিসেকে হল্লাগুল্লা করে ঘুম থেকে তুলতাম সকালে।

ছেলেবেলা আবার কি! তুমি তো এখনও ছেলেমানুষই।

আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক গামহারদা। আমার বউকে শুনিয়ে আরেকবার বলুন। এই যে শুনছো!

শুনেছি। আমি তো জানিই যে তুমি ছেলেমানুষ। তুমি যেটাকে গুণ ভাবছ, আমি তোমার মধ্যে সেটাকেই দোষ বলে মনে করি। সব বুড়োমানুষী সব ছেলেমানুষকে যেমন মানায় না, সব ছেলেমানুষী তেমনই সব বুড়োমানুষকে মানায় না। সব ফুলদানীতে কি সব ফুল মানায়? আধারে আধারে তফাৎ থাকেই।

হারিত বলল, দেখলেন স্যার। একটা সরল কথার পিঠে কী দার্শনিক এবং গোলমেলে তত্ত্ব আওড়ালো আমার বউ।

আবার স্যারট্যার কেন ভাই। গামহারদাই বোলো।

তাই বলব।

কে কি খাবে বল। আমি অর্ডারটা দিয়ে আসি তারপর সয়ে গিয়ে নিয়ে আসব।

যা হয় বলো কিন্তু সকলের জন্যে একই মেনু বল। একি জামাইষষ্ঠী না কি? অত ঝামেলা করার কি দরকার।

নাই বা কেন? নানারকম জিনিস যখন পাওয়া যায় তখন আপরুচিসে খানার অসুবিধা কোথায়? মেয়েদের অন্তত ওই সম্মানটা দেওয়া যাক।

সবসময় মেয়ে মেয়ে কোরো না তো। আমরা মানুষ তো। অনেক ব্যাপারে তোমাদের চেয়েও আমরা এগিয়ে, তবু সবসময়ে এমন করো যেন আমাদের সত্যি সত্যিই তোমরা মাথায় করে রাখো। লোক-দেখানো ভড়ং না করাই ভাল।

ঝাঁঝি বলল, ঝংকার তুলে।

গামহার-এর ভাল লাগল। ঝাঁঝির গ্রীবা উঁচু করে কথা বলার ভঙ্গি, তার গলার ভরা-কলসের মতো স্বর, তার বক্তব্য। সবকিছুই। যাকে ভাল লেগে যায় গামহারের এমনই সবকিছুই ভাল লাগে আর যাকে পছন্দ হয় না তার চরণও বাঁকা লাগে।

চিকরাসি গাড়ি স্টার্ট করে বেরিয়ে গেল। হারিত স্কচ-এর বোতলটা খুলে একটা গ্লাসে ঢেলে বলল, টেল মি হোয়েন টু স্টপ।

এটা কি?

জন হেইগ।

বাস্। বাস্। বলে উঠল গামহার।

জল না সোডা?

জল। জল। বিদেশ বিভুঁই-এ সোডা পাওয়া যায় না। তাই জল দিয়েই খাই, যখন খাই।

বরফ?

হ্যাঁ বরফ দেবে বেশি করে।

যখন খান মানে? রোজ খান না? সে কি?

না।

তবে যেদিন খাই সেদিন গুণে গুণে খাই না।

তাই?

হ্যাঁ। যারা গুণে গুণে ড্রিঙ্ক করে তারা মানুষ খুন করতে পারে, সুদের কারবার করে। সেইসব মানুষকে কখনও বিশ্বাস করবে না।

ঝাঁঝি বলল, উনি কিন্তু তোমার মতো হিসেবী চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট নন উনি একজন আর্টিস্ট। হিসেব আর আর্ট কখনও সহাবস্থান করে না। করলে, দুটির একটিরও মঙ্গল হয় না।

বাঃ।

খুশি হয়ে বলল, গামহার।

তারপর বলল, ঠিক সে জন্যেও নয়। ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের 'তিনসঙ্গী'র একটি গল্প পড়েছিলাম। 'রবিবার' তার নায়ক অভীকের মুখে একটা সুন্দর কথা ছিল। এই কথাটি অবশ্য আমি প্রায়ই বলি। তোমরাও হয়তো আগে আমার মুখেই শুনে থাকবে...

শুনে থাকলেও আবার শুনব।

জারুল বলল।

অভীক বলেছিল, আমি কোনো নেশাকে পেতে পারি কিন্তু কোনো নেশা আমাকে পাবে সেটি হচ্ছে না। বা এই রকমই কিছু।

বাঃ। সত্যিই ভারি সুন্দর কথা। তোমরা গামহারদাকে দেখে শেখো। সন্ধে হলেই 'আজ কাথায় বসা যায়' নইলে 'বাড়িতেই বসা যাক' এই বাক্য শুনে শুনে তো কান পচে গেল।

যেদিন বৃষ্টি পড়ে তোমরা সেদিনও খাও, যেদিন বৃষ্টি পড়ে না সেদিনও। কোনোদিন আনন্দ হলে খাও, অন্যদিন দুঃখ হলে। কোনো কিছুতেই নেশাগ্রস্ত হলে তাতে আর আনন্দ থাকে না।

জারুল বলল।

ঠিক। কোনোরকম কম্পালসিভনেসই আনন্দর মধ্যে গণ্য নয়।

নেশারই মতো একজন নারীতে অভ্যস্ত হওয়াটাও অনুচিত। তাতে নারী বা পুরুষ কারওই গৌরব বৃদ্ধি হয় না, যে কারণে বিয়ে ব্যাপারটাই শিক্ষিত, সচ্ছল সমাজে বাতিল হয়ে যেতে বসেছে। বিয়েটা একঘেয়েমির সংজ্ঞা হয়ে গেছে। যুগ বদলাচ্ছে, কাল বদলাচ্ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমাজ ব্যবস্থা বদলাতে বাধ্য।

ঝাঁঝি বলল।

তা ঠিক। একঘেয়েমির মতো এত বড় অভিশাপ আধুনিক মানুষের জীবনে সম্ভবত আর নেই। তাই হয়ত অসচ্ছল সমাজেও বাতিল হতে বসেছে।

এই যে। নিন গামহারদা।

তোমার?

তারপর ঝাঁঝিদের দিকে ফিরে বলল, তোমরা খাবে না কিছু?

ঝাঁঝি বলল, মদ-এর চেয়েও অনেক বেশি নেশা হয় আমি তেমন তেমন নেশাতে বিশ্বাস করি।

সে কেমন নেশা? গামহার বলল।

আমরা কোক খাব। জারুল বলল।

যেমন প্রকৃতি, যেমন পূর্ণিমা রাত, যেমন মনের মতো পুরুষ, ভাল লাগার গান, বহুদিন মন-খারাপ অথবা মন-ভাল করে-রাখা সাহিত্য। সেটাই আমার হ্যাঙ্গ-ওভার।

বাঃ। তুমি ভারি ভাল কথা বলো তো। ঝাঁঝি বলল।

সেটা বুঝি একমাত্র আপনাদেরই প্রেরোগেটিভ করে রাখতে চান? ভাল কথা বলি বুঝি আমি? পারলে তো ভালই হতো। একসঙ্গে এত কথা আমার মনে আসে, নানা শেডস এরই মতো যে, surealistic ছবি আঁকতে গিয়ে নিতান্তই daub হয়ে যায়।

হারিত জারুলকে কোক-এর সঙ্গে রাম মিশিয়ে দিয়ে নিজে জলের সঙ্গে রাম নিল। ঝাঁঝিকে শুধু কোক দিল গ্লাসে ঢেলে।

তারপর চেয়ারে বসে বলল, একটু ব্যাখ্যা করে বলুন দাদা। ঝাঁঝির বাবা আর্টিস্ট ছিলেন। আমার বাবা তো ছিলেন না। এইসব আর্টিস্টিক টার্মস আমরা জানি না।

ঝাঁঝি বলল, হ্যাঁ। আমি চিত্রীরই মেয়ে। তবে আমার বাবাদের প্রজন্ম আপনাদের মতো অর্থ, যশ, প্রচার কিছুই পাননি। বরং সমাজের উপেক্ষাই পেয়ে গেছেন। আমার মা বড়লোকের মেয়ে ছিলেন। চালচুলোহীন, ফাইন-আর্ট করা আর্টিস্টকে ভালবাসার অপরাধে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বাড়ি থেকে বিপুল অর্থবান, হাওড়ার ঢালাইওয়ালা দাদু। মাকে নিয়ে বাবা বস্তীতে গিয়ে উঠেছিলেন। তখন শিল্পীদের জনগণায়নও হয়নি। সরকার অথবা মিডিয়ার তাঁবেদারী করে তখনকার শিল্পীরা কিছুই পেতে চাইতেন না। সেই সময়ের কবি, সাহিত্যিক, গায়ক, বাদক, নাচিয়ে, চিত্রী সকলেরই আত্মসম্মানজ্ঞান ছিল প্রখর। কোনো প্রলোভনেই নিজস্বতাকে তাঁরা বিকোতেন না।

একটু চুপ করে থেকে বলল, তবে আপনার বেলাতে এই সব নিন্দামন্দ যে খাটে না, তা জানি। কিন্তু চারদিকে যা দেখি! কবি সাহিত্যিক গাইয়ে চিত্রীদের যে পরিমাণ তৈলমর্দন করতে দেখি মন্ত্রী ও মিডিয়াদের তাতে তাঁদের আর শ্রদ্ধা করতে পারি না। আমার বাবা তো মরে গিয়ে বেঁচে গেছেন। সাহিত্য-শিল্পী-সঙ্গীতের এমন পণ্যায়ন, জনগণায়ন, তাঁকে দেখে যেতে হল না!

গামহার বলল, চিয়ার্স।

জারুল বলল, ইসস, তোমাদের বরফ লাগবে কি না জিগ্গেস করতে একদম ভুলে গেছি। আপনাকে আরও কি দেব গামহারদা!

দাও। আই লাইক প্লেন্টি অফ আইস। তারপর বলল, আউ গুট্রে দিয়ন্তু।

জারুল বলল, আপনি ওড়িয়া বলতে পারেন?

সামান্য।

কী করে শিখলেন?

একটি ওড়িয়া মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম।

কোথায়? কটকে?

না, না। কটকে নয়, কলকাতাতেই। আমাদের পাশের বাড়ি তার বাবা ভাড়া নিয়েছিলেন। কাস্টমস-এর বড় অফিসার ছিলেন বাবা। অমন নরম, সুশ্রী, সভ্য, ভদ্র, সুগায়িকা মেয়ে আর দেখিনি। সুনন্দা পট্টনায়কের ছাত্রী ছিল। ওদের পরিবারের সঙ্গে আমি উটি, ভুবনেশ্বর, সম্বলপুর, সাতকোশীয়া গণ্ড সব ঘুরেছি।

তাহলে বিয়েটা হলো না কেন?

ওই একই কারণ।

কি কারণ?

ওই ঝাঁঝির বাবারই মতন আমার চালচুলো ছিল না। আমাকে কুমুদিনী বিয়ে করতে চায় শুনে তার প্রতিষ্ঠিত বাবাও কুমুদিনীকে তাড়িয়ে দেবেন বলেছিলেন।

তা আপনি কুমুদিনীকে নিয়ে চলে গেলেন না কেন?

গ্লাসে, গামহার একটা বড় চুমুক দিয়ে বলল, আসলে আমার সাহস কম ছিল। বেশ কম। তাছাড়া, সেই সঙ্কটে পড়ে দুটো জিনিস হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম। দুটোই গ্রেট রিভিলেশান। জীবনে খুবই কাজে লেগেছিল। পরে।

কি? কি?

ঝাঁঝি তার দু'চোখের মণি গামহার-এর দু'চোখের মণিতে না-ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে রাখল এমন করে, যেন একফোঁটা চাউনিও উপচে না পড়ে যায় বাইরে।

ঝাঁঝি বলল, বলুন, কি? কি?

হারিত একটু অবাক হয়ে তাকিয়েছিল ঝাঁঝির দিকে। ঝাঁঝির মধ্যে কী যেন একটা পরিবর্তন লক্ষ করছিল ও। এই গামহার ঘোষ লোকটার মধ্যে এমন কিছু আছে যাতে মেয়েরা দারুণভাবে আকৃষ্ট হয়। লোকটা ডেঞ্জারাস। লেখক-শিল্পীদের মধ্যে বেশ কিছু আছেন ওরকম। গোলমেলে। এই কিছুটা যে কি? তা সিমলিপালে পৌঁছে জঙ্গলের মধ্যে গামহার ঘোষকে মশলা বেটে দেখতে হবে। সেটার উপাদানগুলিকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

বলল, হারিত মনে মনে। চলো জঙ্গলে মক্কেল, তোমার আক্কেল গুড়ুম করব। তোমার মধ্যে কী ডেবিট কী ক্রেডিট হয়ে আছে দেখব ইনসাইড আউট করে।

বললেন না, কি কি?

হ্যাঁ। বলছি।

প্রথমটা হল, ভালবাসার শেষ, প্রাপ্তিতে নয়, হারানোতেই।

চলো, হারানো আরও বোঝাব ভাল করে।

মনে মনে আবারও বলল হারিত। রাম-এর গ্লাসে এক চুমুক দিয়ে।

আমি যে সত্যিই কুমুদিনীকে ভালবেসেছিলাম। ও যে বড় আদরে মানুষ হয়েছিল। ওড়িয়া সমাজে আমার চেয়ে হাজারগুণ ভাল ভাল ছেলেরা ওর জন্যে পাগল ছিল।

গামহার বলল।

কুমুদিনী তাহলে আপনাকে ভালবাসেনি আসলে?

না, না, সেও বেসেছিল বইকি। অমন ভালবাসা এ জীবনে আমাকে আর কেউই বাসেনি। জানি না, বললে তোমরা বিশ্বাস করবে কি না, তার সঙ্গে কোনরকম শারীরিক সম্পর্কই হয়নি আমার। একমাত্র হাতে হাত রাখা ছাড়া।

ন্যাকা ব্যাটা! নেকু-পুষু-মুনু! না বলে বলল, হারিত।

তাতেই যেন ইলেকট্রিক শক লাগত —ভাললাগার। ওকে ভালবেসেছিলাম আমি, ও আমাকে ভালবেসেছিল। ওর গায়িকা-সত্তা আমার শিল্পী-সত্তাকে ভালবেসেছিল। তাই ওর কষ্ট হোক তা আমি হতে দিইনি। তাছাড়া, আমাকে বিয়ে করলে ওর গান নষ্ট হয়ে যেত। বাঙালি সমাজে ওড়িশী সংস্কৃতির প্রভাব কম। সেটা আমাদেরই উচ্চমণ্যতা আর কূপমণ্ডুকতারই দোষ। নইলে অসম আর ওড়িশা থেকে আমরা অনেক কিছু নিয়ে আমাদের শিল্প-সংস্কৃতি-সঙ্গীতকে অবশ্যই আরও অনেক সমৃদ্ধ করতে পারতাম।

ওরা চোখ বড় বড় করে গামহার-এর কথা শুনছিল।

ব্যাঙ্কের দারোয়ান বোধহয় চৌপাইটা টানল সান-বাঁধানো বারান্দার উপরে। কর্কশ শব্দে নিস্তব্ধতা খান খান হলো। এমন সময়ে চিকরাসি ফিরল। গাড়ি থেকে নেমে এসে বলল, কী ব্যাপার! তোমাদের সকলের ঠোঁটে আঠা কেন?

আঃ চুপ করো তো। তোমার ড্রিঙ্কটা নিয়ে এসে বসো। আমরা গামহারদার কথা শুনছি।

এই তো। সাব্বাস দাদা! শুরু করে দিয়েছ তোমার Spell!

চিকরাসি বলল, গামহারকে।

তারপর ঝাঁঝি আর হারিতকে বলল, তোমরা তো গামহারদার সঙ্গে বাইরে কোথাও আসোনি। ইটস অ্যান এক্সপীরিয়েন্স। তোমার প্রফেশান চুজ করাই ভুল হয়ে গেছে গামহারদা। মেয়েদের তুমি যেরকম চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতে পারো তাতে তোমার কোনো গুরুটুরু হয়ে যাওয়াই উচিত ছিল। দেশে এখন প্রফেশান বলতে তো মাত্র দুটো। এক রাজনীতি আর দ্বিতীয় গুরুগিরি।

প্রফেশান চুজ করার কথাই যখন ওঠালে তখন একটা গল্প মনে এল। গল্পটা অনেককেই বলেছি আগে। বয়স হলে এক কথাই বার বার বলে সবাই একই জনকে। ভাবে, আগে কখনও বলেনি বুঝি!

চিকরাসি বলল, আমি শুনেছি কিন্তু ওরা তো শোনেনি। বলেই ফেলো আরেকবার।

এক ভদ্রলোক উদ্বাস্তু হয়ে এসেছেন রাজশাহী থেকে। বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ। এল. এম. এফ. ডাক্তার কিন্তু খুব ভাল ডাক্তার। চার ফিট দশ ইঞ্চি হাইট। মুখে বসন্তের দাগ। ওজন দু'মন। রং সেভেন্টি-এইট রেকর্ডের মতো কালো।

রাজশাহীতে অনেক মাড়োয়ারী রোগী দেখতে দেখতে চমৎকার মাড়োয়ারী বলতে পারতেন তিনি। তাই উদ্বাস্তু হয়ে এসে মধ্য কলকাতার এমন একটি জায়গাতে বাড়ি ও চেম্বার করলেন যেখানে মাড়োয়ারীদের বাস বেশি। অল্প ক'দিনেই পসার জমে গেল। তবে খাটতে হতো প্রচুর। অবসর বলতে, বিনোদন বলতে কিছুমাত্রই ছিল না।

তারপর?

যে সময়ের ঘটনার কথা বলছি, তখন উত্তমকুমারের একেবারে রমরমে দিন চলেছে। ডেট পাওয়াই মুশকিল। একদিন সেই ডাক্তার ভদ্রলোক তাঁর ছেলেদের জিগ্গেস করলেন, তোরা যে উত্তমকুমার উত্তমকুমার কইর‍্যা লম্ফ-ঝম্ফ করিস তা লোকটা মাসে কত রোজগার করে রে? পাঁচ হাজার টাকা হইব?

বড় ছেলে রেগে গিয়ে বলল, তুমি কও কী বাবা! আমাদের কইল্যা কইল্যা, বাইরের কাউরে যেন কখনও কইও না। মানষে শুইন্যা হাসব।

ক্যান? হাসব ক্যান?

আরে পাঁচ হাজার তো তার ঘণ্টার রোজগার।

ডাক্তার একটা ধাক্কা খেলেন জোর।

তারপর বললেন, দুসস শালা। লাইন চুজ করাই ভুল হয়্যা গিছে।

যেন উনি ইচ্ছে করলেই উত্তমকুমার হতে পারতেন!

ওরা সকলেই হো হো করে হেসে উঠল। আগে শোনা থাকলেও চিকরাসিকেও হাসতে হলো নতুন করে গামহার এর কথা বলার সরস ভঙ্গীর কারণে।

বলতে বলতে ও রাম ঢালল গ্লাসে, কোক মেশাল। তারপর এসে বসল।

জারুল বলল, তুমি দিলে রসভঙ্গ করে। বলুন তো গামহারদা, যা বলছিলেন।

বলি! কিন্তু কেমন করে বলি! আমি তো লেখক নই। আমি যে চিত্রী! রবীন্দ্রনাথের কথা ধার করে বলতে পারি 'সংসারে মোরে রাখিয়াছ যেই ঘরে, সেই ঘরে রব সকল দুঃখ ভুলিয়া/করুণা করিয়া নিশিদিন নিজ করে, রেখে দিয়ো তার একটি দুয়ার খুলিয়া।' আসলে ভালবাসা যত বেশি গভীর হয় তার দুঃখও তত গভীর। ভালবাসা আর ভাললাগাতে চিরদিনই তফাৎ ছিল। ভালবাসা, ভালবাসার ধনকে না পেলেই বেঁচে থাকে চিরদিন।

আর দ্বিতীয়টা।

ঝাঁঝি বলল।

দ্বিতীয়টা বুঝিয়ে বলা একটু মুশকিল। টি. এস. এলিয়টের কথাতে বললে কি তোমরা বুঝবে?

কী কথা?

'Time present and time past
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past.'

যে যার মতো করে বুঝে নাও এখন।

চিকরাসি বলল, তাহলে কি ঠিক হলো? খাওয়া তো আধঘণ্টার মধ্যে হয়ে যাবে। ড্রিঙ্কটিঙ্ক করে খাওয়া-দাওয়ার পরে সারারাত গাড়ি চালিয়ে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?

ঝাঁঝি বলল হারিতকে, তুমি কিন্তু বেশি ড্রিঙ্ক করো না। ড্রাইভ করবে সারারাত। মনে থাকে যেন।

আরে না, না।

তোমার কষ্ট হবে গামহারদা সারারাত জেগে বসে যেতে? "ZEN" তো আর বড় গাড়ি নয়!

আরে, জারুলের গান শুনতে শুনতে চলে যাব।

জারুল বলল, আর তুমি গান গাইবে না?

চিকরাসির ঘুম পেয়ে গেলে ঘুম তাড়াবার জন্যে গাইতে পারি।

হারিত আর ঝাঁঝি হেসে উঠল গামহারের কথায়।

জারুল আর চিকরাসি সমস্বরে বলল, হেসো না। গামহারদা কিন্তু বেশ ভাল গান করেন।

তাই? বাবাঃ। কোন গুণ নেই আপনার?

কোনো গুণই নেই। আমি 'Jack of all trades master of none.'

বেরোতে বেরোতে সাড়ে এগারোটা হয়ে যাবে।

কটা বাজে এখন?

পৌনে দশটা।

আমি আর পনেরো মিনিট পরে গিয়ে ধাবা থেকে খাবারটা নিয়ে আসি।

চালাতে চালাতে চোখ লেগে গেলে গাড়ি রাস্তার ধারে লাগিয়ে ঘুমিয়ে নেবে। তখন কিন্তু একদমই চালাবে না গাড়ি।

চিকু বলল, হারিতকে।

আরে জানিরে বাবা জানি। হোল-নাইট ড্রাইভ কি করিনি না কি? একসময়ে র‍্যালি করতাম তা কি জানো?

ফাস্ট রেসিং?

গামহার জিজ্ঞেস করল।

না না, এনড্যুরেন্স র‍্যালি। চব্বিশ ঘণ্টায় কলকাতা থেকে দিল্লি। রাতে রেস্ট। পরদিন দিল্লি-বম্বে। তার পরদিন বম্বে-মাড্রাস এবং তার পরদিন মাড্রাস-ক্যালকাটা। আমরা সেকেন্ড হয়েছিলাম।

আমরা মানে?

আমরা মানে বিশ্বজিৎ ইন্দ্রজিৎ ছিল। গুহ ব্রাদার্স।

ননীও।

মানে? কোন ননী?

ননীগোপাল চন্দ। এখন পাকপাড়ার রানীর বেয়াই। এই তো সেদিন বিয়ে হলো। রূপোর মিনিয়েচার কুলোতে নেমন্তন্নর চিঠি করেছিল। দেখার মতো। সারা কলকাতা শহরেরই নেমন্তন্ন ছিল।

রানী কে? রীতা? দেবাশিস সিনহার স্ত্রী তো।

হ্যাঁ। ও আপনি চেনেন?

চিনতাম বইকি। অল্প বয়সে দুম করে চলে গেল। রীতা তো নর্থ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবে রাইফেলও ছুঁড়ত। ন্যাশনালেও গেছিল। তাই না?

হ্যাঁ। আপনি তো সবই জানেন দেখছি।

ঐ ক্লাবে আমার কিছু চেলা আছে। তাদের মাধ্যমেই চিনতাম।

আপনি ক্ষেপুখেনু 'ক্লাব'-এ যান কি? আপনাকে তো কখনও দেখিনি!

না আমি যাই না।

কেন?

ভাল লাগে না। তাছাড়া আমি পায়জামা-পাঞ্জাবি পরি। তা পরে তো যাওয়া বারণ। কিছু মানুষ মূর্খের স্বর্গে বাস করে প্রকৃত মূর্খজনোচিত আনন্দ ও শ্লাঘা বোধ করেন। তাঁদের আহ্লাদ নিয়ে তাঁরা থাকুন। বকমধ্যে হংস হতে যাবই বা কেন? এ সব ক্লাব-এর চেয়ে অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশনও ভাল। মেম্বারদের সঙ্গে সাহিত্য, সঙ্গীত, ছবি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা যায়। ওইসব ক্লাবের অধিকাংশ মেম্বারই তো বড়লোক বাবার ট্যাড়শ ছেলে। নিজেরা জীবনে করেছেটা কি?

আপনি কি কখনও Black-balled হয়েছিলেন? এত রাগ কেন? দ্রাক্ষাফল টক?

Apply করলে তো Black-balled হবার প্রশ্ন! আমার কি ল্যাজ গজাবে সেখানের মেম্বার হলে?

হারিত বলল, যাই বলো চিকু, গামহারদা একজন ওরিজিনাল মানুষ।

তা ঠিক। কলকাতা শহরটাই ভরে গেছে প্রোটোটাইপ-এ আর দু-নম্বরীতে।

অত সব জানি না। আমি আজে-বাজে মানুষের সঙ্গে মেশার চেয়ে ভাল গান শুনতে, ভাল বই পড়তে ভালবাসি। ছবি আঁকি নিজের মনে। চানঘরে গান গাই। মেশার মতো মানুষ নইলে মিশে লাভ কি?

তা ঠিক। দু-ঠ্যাঙে মাত্রই তো আর মানুষ নয়।

চিকু বলল।

আমি পুরনো দিনের মানুষ। কত 'কল্লোল-যুগ' 'কৃত্তিবাস-যুগ' হেজে-মজে গেল। রবীন্দ্রনাথ, লেসার মর্টালসদের সব নিন্দামন্দ সত্ত্বেও এখনও রবীন্দ্রনাথই। কোনো বিকল্প হয়নি আজ অবধি। হবে কি না, তাও জানি না। এখনও তিনি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। মৃত্যুর পরে পাঁচ যুগ পেরিয়ে এসেও।

বলেই, আবৃত্তি করল গামহার,

'প্রলয় সৃজন না জানি এ কার যুক্তি
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।'

আমরাই তাহলে আগে যাচ্ছি?

যেমন বলবে।

তাই যাও। হারিত বলল, চিকুকে।

হারিত একটু বেশি রাম খেয়ে ফেলেছে মনে হল। আন্ডা-তড়কা আর চিকেন-ভার্তা দিয়ে রুটিও কম খায়নি। স্বাস্থ্যও খুব ভাল হারিতের। তাছাড়া রীতিমতো সুদর্শন। ফ্রেঞ্চকাট দাড়িসমেত 'মড' চেহারা। প্রাইস ওয়াটারহাউসের রূপেন রায় রূপেন রায় দেখতে অনেকটা, তবে রূপেনের চেয়ে অনেক লম্বা এবং ওয়েল-বীল্ট হারিত। দেখে মনে হয় না চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, মনে হয়, ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইনস-এর পাইলট বুঝি।

কতরকম মুহুরীই যে আছে! ভাবছিল গামহার। ছেলেবেলাতে মুহুরীদের দেখেছে ধুতির সঙ্গে হাতের বোতাম না-আটকানো ফুল শার্ট পরতে আর লাগাতার নস্যি নিতে। তাঁদের একেকজনের হাতের লেখার রকম আবার আলাদা আলাদা ছিল হিগলোগ্রাফির মতো। নিজস্ব হরফ উদ্ভাবন করতেন একেকজনে, পাছে তাঁর হাতের লেখা ইনকাম-ট্যাক্স বা সেলস-ট্যাক্স অফিসারের সামনে অন্য কোনো মুহুরী পড়ে দিয়ে তার চাকরিটি খেয়ে দেয়। মালিককে তাঁবে রাখার ওই একটা উপায় ছিল মুহুরীবাবুদের, মালিকদের যেমন ছিল অজস্র, তাঁদের তাঁবে রাখবার।

ভাবছিল গামহার, হারিতও একজন মুহুরী আর গামহারদের পাশের বাড়ির তেলকল - ধানকলের মালিক হরিপদ খাঁ-এর কর্মচারী প্রসন্নবদন ও মুহুরীই ছিলেন অথচ দু'যুগের দুই মুহুরীর মধ্যে কত তফাৎ। প্রসন্নবদন দলুই-এর কোনো ডিগ্রী-টিগ্রী ছিল না। হারিত এম. কম এবং চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। প্রসন্নবদন খেতে পেতেন না, হারিতের সল্টলেক-এ বাড়ি, মারুতি এস্টিম গাড়ি, সে "ক্ষেপুখেনু" ক্লাবের মেম্বার। তাকে দেখলে এবং তার কথাবার্তা হাবভাব দেখলে মনে হয় তার জীবনে সবই পাওয়া হয়ে গেছে। মনুষ্যজীবন কানায় কানায় সার্থক। মানুষ অথবা ঈশ্বর কারো কাছেই চাইবার কিছুমাত্রই আর নেই।

যুগ ও কাল সত্যিই পাল্টেছে। গামহারদের যুগ শেষ হয়ে গেছে। সত্যিই যুগান্তর ঘটেছে সবকিছুর। যুগান্তরই নয়, এখন তো নতুন শতাব্দীরও মুখোমুখি এসে পৌঁছল ওরা। যন্ত্রপাতি, ইনফরমেশন-টেকনোলজি সবেতেই অভাবনীয় সব পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তন এসেছে মানুষের চেহারায়, সাজ-পোষাকে। তার চেয়েও বেশি এসেছে ধ্যান-ধারণাতে, চাওয়া-পাওয়ায়, মানসিকতাতে এবং চরিত্রে। মানুষের সঙ্গে গাড়ির শক-অ্যাবসরবার বা কম্প্যুটারের ফ্লপির তফাৎ নেই আর কোনো। কথা ছিল যে, বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি যন্ত্রকে দাস বানিয়ে মানুষকে সম্রাট বানাবে। বিজ্ঞান, মনে হয়, মানুষকে শিব গড়তে গিয়ে বাঁদরই গড়ে ফেলল। মানুষ শিব হলো না বাঁদর, তা আর কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা যাবে।

কী হল গামহারদা? ঘুম পাচ্ছে না কি?

চিকু বলল, গাড়ি চালাতে চালাতে।

নাঃ।

তবে? একেবারে চুপচাপ কেন!

ভাবছি।

কী এতো ভাব বলো তো সবসময়?

তাই তো। কত কী। কেটে-যাওয়া ঘুড়ির মতো ভাবনা আমার ভেসে যায় নিরুদ্দেশে। কারো কাছে জবাবদিহির দায়িত্ব নেই। তুমিও জবাবদিহি চেও না।

একজনের ভাবনা অন্যে দেখতে পেলে বেশ হতো। না?

জারুল বলল, পেছন থেকে।

তা হতো। তবে তা বেশ না হয়ে বিপদও ডেকে আনতে পারত নানারকম।

গামহার-এর এই কথাতে ওরা তিনজনেই হেসে উঠল একইসঙ্গে।

গামহার বলল, একটা গান শোনাবে নাকি জারুল।

আমার গান আর কি শুনবেন, জঙ্গলে পৌঁছে ঝাঁঝির গান শুনবেন। চণ্ডীদাস মালের কাছে পুরাতনী গানের তালিম নিচ্ছে। নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, গোপাল উড়ে, গিরীশ ঘোষ, বর্ধমানের মহারাজা আরও কত জনের গান যে তুলেছে কী বলব! আশ্চর্যময়ী দাসী, আঙুরবালা, গহরজান, ইন্দুবালা এঁদের নানা পুরনো রেকর্ড থেকেও অনেক গান তুলেছে। সেসব গান শুনলে অবাক হয়ে যাবেন।

সে কি! ঝাঁঝি না ছায়া সেনের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখত।

চিকু বলল অবাক হয়ে।

তা শিখত। তবে কবে ছেড়ে দিয়েছে।

কেন?

হারিতও রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখছে ছায়া সেন-এর কাছে। তাই রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়াই ঝাঁঝি ছেড়ে দিয়েছে।

চিকু বলল, সে কি! এ যে চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া। বেচারী রবীন্দ্রনাথ কি দোষ করলেন! বা ছায়া সেন?

আঃ তুমি একটু চুপ করবে। চিকুকে বকে বলল জারুল।

চাঁদটা উঠেছে। দু'পাশের মাঠপ্রান্তর কী চমৎকার দেখাচ্ছে! জঙ্গলও।

আমি ছিন-ছিনারি দেখলে গাড়িকে কে দেখবে?

কোথায় চুপ করে দেখবে না বকর বকর করেই চলেছ।

আমরা বিসোই-এর ঘাট-এ পৌঁছব কখন?

দেরি আছে। বঙ্গভূম ছেড়ে লাল্লুভূমে পড়েই বেশ কয়েক কিমি পথের এমনই অবস্থা যে মনে হবে চাঁদে বাইচুং চাষ করছ।

শব্দটা বাইচুং না ভাইচুং। প্রথমটি ভাইচুং ফুটবলার, দ্বিতীয়টি তাইচুং ধান।

ওই হলো।

সামনের ওই রাস্তাটুকুর নাম গিনেস বুক অফ রেকর্ডস-এ অবশ্যই উঠতে পারে। দৈত্যর মতো মার্সিডিস ট্রাকগুলো পর্যন্ত হালে পানি পায় না আর আমার তো মারুতি জেনই। রাজপথেরই মধ্যে এমন পথ-ভোলানো ব্যাপার-স্যাপারের কথা ভাবাই যায় না।

তবে কী হবে?

উদ্বিগ্ন গলাতে বলল জারুল।

"যা হবার তা হবে। যে আমারে কাঁদায় সে কি অমনি ছেড়ে রবে?/পথ হতে যে ভুলিয়ে আনে পথ যে কোথায় সেই তা জানে,/ঘর যে ছাড়ায় হাত সে বাড়ায় - সেই তো ঘরে লবে।"

চিকু বলল।

জারুল বলল, এটা কার কবিতা? তুমি কটা হুইস্কি খেয়েছ? থুরি, রাম? কবিতা আওড়াচ্ছ যে বড়! কোন কবির এতো সৌভাগ্য?

সরি। এটা গান। রবি ঠাকুরের। সৌভাগ্য না বলে দুর্ভাগ্য বলো। নইলে চিকুতে গান

গায়? তোমরা তো সব রিমেক আধুনিকের আর্টিস্ট। রবিঠাকুরকে তোমরা তথাকথিত শিক্ষিতরা দল বেঁধে ছাড়লে বলেই তো পীযূষকান্তির মতো কুমীরেরা এসে তাঁকে ঠ্যাং কামড়ে ডোবাতে ডুবিয়ে মারার মতলব করেছে।

গানটা জানেন গামহারদা?

না।

তবে অন্য একটা গান করুন।

প্লীজ! চিকুর এই ভ্যাজভ্যাজানি আর সহ্য হচ্ছে না।

গামহার ধরে দিল বিনা ওয়ার্নিং-এ 'তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে তখন ছুটি ফুরিয়ে গেছে কখন অন্যমনে।'

গামহারের গান গাওয়া শেষ হলে জারুল বলল, হোয়াট আ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ! কী সুন্দর ভাব আপনার গলাতে, কী দারুণ গলা। গান শেখাবেন আপনি আমাকে?

স্টুডিওর দরজা বন্ধ করে নগ্ন মডেলদের কী শেখান গামহারদা তা তিনিই জানেন। দরজা বন্ধ করে দেওয়ার পরও তুমি কি শুধু গানই শিখবে?

অন্য অনেক কিছুই শিখতে পারি। সেটা আমার ব্যাপার। সীরিয়াস কথার মধ্যে ইয়ার্কি আমার ভাল লাগে না।

সীরিয়াসলি বলছি গামহারদা। শেখাও না জারুলকে রবীন্দ্রনাথের গান। রুচিটা ভাল হয়ে যাবে।

রুচি তুলে কথা বলবে না চিকু। মানা করছি।

গামহার ওদের ঝগড়া বন্ধ করার জন্যে ধরে দিল হঠাৎ 'ও যে মানে না মানা, আঁখি ফিরাইলে বলে, না, না, না।/যত বলি নাই রাতি - মলিন হয়েছে বাতি/মুখপানে চেয়ে বলে, না, না, না।/বিধুর বিকল হয়ে খেপা পবনে/ফাগুন করিছে হা-হা ফুলের বনে।/আমি যত বলি তবে এবার যে যেতে হবে/দুয়ারে দাঁড়ায়ে বলে, না, না, না।'

তারপর বলল, গানের বাণী শুনলে? রবীন্দ্রনাথের গানের কথাই শুনবে? না সুর। কথা ও সুরের মধ্যে এমন সুষম প্রতিযোগিতা সম্ভবত আর অন্য কোনো গানেই পাবে না। এমন বসন্তের মধ্য-রাত, চাঁদে ভেসে যাচ্ছে পৃথিবী, চলেছ এমন চাঁদ-চকচক বনের মধ্যে দিয়ে আর এখনই কি তোমাদের খুনসুটি করার সময়! ছিঃ। চুপ করো দু'জনেই।

জারুল বলল, সত্যি। কী সুন্দর কথা আর কী দারুণ সুর। এটাও কি রবীন্দ্র-সঙ্গীত?

হ্যাঁ। বাঙালি হয়েও রবীন্দ্রনাথকে পড়লে না, তাঁর গান গাইলে না, তোমরা সত্যিই জানো না তোমরা কি হারালে!

এইবার দেখো, আরম্ভ হলো লাল্লুজী কি খেল। বিহারে পড়েছি আমরা।

চিকু বলল। গামহার কী বলল তা না শুনেই।

এ কী! এই পথ দিয়ে যেতে হবে আমাদের? একে কি পথ বলে! বলো গামহারদা? জারুল বলল আতঙ্কিত গলায়।

গত বছর আমাদের ওয়েস্ট-বাংগালকি রাস্তা এর চেয়েও খারাপ ছিল। অসীম দাশগুপ্ত ক্ষিতি গোস্বামীকে বে-ইজ্জৎ করার জন্যে টাকা ছাড়ছিলেন না, তাই বেচারী পূর্তমন্ত্রী গভীর খাদে ছিলেন। নিজে উঠবেন তবে না রাস্তা মেরামত হবে। এতদিনে হয়েছে।

জারুল বলল, এবারে চুপ করে গাড়িটা চালাও। জানি না, এ পথ পেরোবে কী করে।

খুব মনোযোগ দিয়ে গাড়ি চালাও। উল্টো থেকে লাইন দিয়ে আসা ট্রাকগুলোর হেডলাইটে চোখ যে ঝলসে যাচ্ছে। কিছু একটা করা যায় না?

চিকু বলল, মাইক স্যাটো, ফাস্ট রেসিং-এর ড্রাইভার একজায়গাতে লিখেছিলেন, উল্টোদিকের হেডলাইট থেকে নিজের চোখ এবং গাড়ি বাঁচাবার ফর্মুলা।

কি?

'ডোন্ট লুক অ্যাট দ্যা হেডলাইট। ডোন্ট লুক অ্যাট দ্যা হেডলাইট। ডোন্ট লুক অ্যাট দ্যা হেডলাইট।' শুধু তোমার বাঁদিকে কতটুকু জায়গা আছে তা দেখে চোখ নামিয়ে গাড়ি চালাও।

বাঃ।

বেশ কিছুক্ষণ তটস্থ হয়ে সোজা বসে থেকে ওই পথটুকু পেরিয়ে বহড়াগড়ার দিকে যখন গাড়ি এগোল তখন গামহার বলল, 'মনে হলো যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ।'

বহড়াগড়াতে একটু চা খাবার জন্যে দাঁড়াবে নাকি? হারিত যতগুলো রাম খেল, একটা কাণ্ডই না বাধায়।

মন্দ বলোনি। চা খাবার সঙ্গে সঙ্গে ওর অবস্থাটাও একটু চেক করে নেওয়া দরকার। হাওয়া ঠিক আছে কি নেই!

গাড়ির চাকার হাওয়া?

আজ্ঞে না। হারিতের।

চলো, বহড়াগড়ার মোড়ে দাঁড়াব ধাবাতে।

তারপরে কোন কোন জায়গা পড়বে?

বহরাগড়াতে গিয়ে পথের একটা হাত ডানদিকে চলে গেছে ধলভূমগড়, ঘাটশিলা, টাটা, বুণ্ডু হয়ে রাঁচী। আর সোজা পথটি গেছে বম্বে। ওড়িশা এবং আরও নানা রাজ্য পেরিয়ে। বাংরিপোসির আগে ন্যাশনাল হাইওয়ে ফাইভ আর সিক্স মিলেছে...

বাংরিপোসি! নামটা চেনা চেনা লাগছে যেন।

জারুল বলল।

গামহার বলল, 'বাংরিপোসির দু রাত্তির' নামের একটা উপন্যাস আছে। ইন ফ্যাক্ট, শুনেছি যে ওই উপন্যাসটিই বাংরিপোসিকে এক বিখ্যাত ট্যুওরিস্ট স্পটে পরিণত করেছে।

কার লেখা?

জারুল জিজ্ঞেস করল।

জারুলের কথার উত্তর না দিয়ে চিকু বলল, ওরা তো আবার চিন্তায় ফেলল।

কারা?

আরে হারিতরা।

কেন?

পিছনে তো ওদের দেখছি না। কোনো মার্সিডিস ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি ভিড়িয়ে দিল না তো!

উদ্বিগ্ন হয়ে বলল জারুল।

খারাপ রাস্তাতে কখনও অ্যাকসিডেন্ট হয় না। প্রত্যেক ড্রাইভারই তখন তীব্র তীক্ষ্ণ সজাগ থাকে। রাতের বেলা অ্যাকসিডেন্টের ভয় দারুণ থাকে ভাল রাস্তাতে। কখন যে

চোখ জুড়ে আসে তা আগের মুহূর্তেও বোঝা যায় না। আর সেই ঘুমই চিরঘুম হয়ে যায়। চলো তো, চায়ের অর্ডার দিই। আশা করি এসে যাবে।

আসবে না তো যাবে কোথায়?

চিকু বলল।

গামহার ঝাঁঝির মুখটিকে মনে করল। ওর মুখটি যেন কোনো দূরের নদীর হাঁসুলি বাঁক। জলজ গন্ধ মাখা তার ঠোঁটদুটিতে, বুনো হাঁসের ডানার আঁশটে গন্ধ, আর তলপেটের মসৃণ নরম পালকের ওম্। মনে মনে বারবার আঁকল বারবার মুছল সেই মুখের ছবিটি কিন্তু তবু ঠিকঠাক সেই মুখের ভাবটি কিছুতেই ফুটল না। কখন যেন চুরি হয়ে গেছে।

গামহার ভাবল, এবার ওরা এসে পৌঁছলে অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ঝাঁঝির মুখটার ছবি নিজের চোখের তারাতে জলছবির মতো সেঁটে নেবে।

দেখতে দেখতে হারিতরা এসে পড়ল।

বলল, এক ব্যাটা ট্রাক কিছুতেই সাইড দেবে না। হর্ন দিয়ে দিয়ে আঙুল ব্যথা হয়ে গেল। সে জন্যেই দেরী হয়ে গেল।

চা খাওয়ার সময়ে দেখা গেল হারিত একেবারে Fit as a fiddle! ঝাঁঝিও নামল গাড়ি থেকে। বলল, বাবাঃ, পা দুটো একটু ছাড়িয়ে নিই। ধরে গেছে একেবারে।

চিকু বলল, পা টিপে দেব?

অসভ্য।

বলল ঝাঁঝি।

মেয়েরা এই 'অসভ্য' শব্দটা যে কত কীই বোঝাতে ব্যবহার করে, তা বলা যায় না। বিরাট রেঞ্জ।

হারিতের ইচ্ছে করল ঝাঁঝির পা-টা সত্যি সত্যিই টিপে দেয় একটু।

চুপ করে ঝাঁঝির মুখের দিকে চেয়ে রইল গামহার। ছবিটার যেখানে যেখানে রঙ ফিকে হয়ে গেছিল, অদৃশ্য কল্পনার তুলি দিয়ে সেখানে সেখানে রঙ লাগিয়ে দিল। ঝাঁঝিকে আজ সন্ধে থেকে গামহার একজন চিত্রীর চোখ দিয়েই দেখছে। যে চোখের কথা শুধু আর্টিস্টরাই জানেন।

চা খাওয়ার পরে চিকুরাই এগিয়ে গেল। যেমন গ্রীনফিল্ডস ছাড়ার পর থেকেই এগিয়েছিল। ঝাড়ফুকুরিয়ার মোড় হয়ে বাংরিপোসি হয়ে বিসোই-এর ঘাটে উঠতে লাগল গাড়ি। পাহাড়ের উপরে ঘুরে ঘুরে উঠেছে পথ। ডানদিকে একটা মন্দির পড়ল। চিকু গাড়ি থামিয়ে সেখানে পুজো দিতে গেল।

গামহার বলল, চিকু এসব মানে নাকি?

ও তেমন মানে না। তবে একেবারে মানে না যে তাও নয়। কিন্তু হারিত বার বার করে বলে দিয়েছে এই বাংরিপোসির ঠাকুরানি নাকি খুবই জাগ্রত। পুজো না দিলে অ্যাকসিডেন্ট হবেই।

জারুল বলল।

তাই? ইনফোটেক এক্সপার্ট আর চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদেরও এতো কুসংস্কার।

কুসংস্কার এমনই একটা ব্যাপার গামহারদা যে. It runs in the blood. বাইরের ইংরেজিয়ানাতে ভিতরের এইসব ব্যাপারগুলো আনএফেক্টেড থাকে। তবে আমি বাধা দিই

না। আমি নিজে বিশ্বাস করি না বলেই আমার অবিশ্বাস জোর করে কারো উপরে চাপাব কেন? সেই অধিকার তো আমাকে কেউ দেয়নি। যে যা ভাল মনে করবে, করবে। এসব জিনিস এতই ব্যক্তিগত যে এতে কোন্ জোর চলে না। চালানো উচিতও নয়।

তা অবশ্য ঠিকই।

চিকু পুজো দিয়ে এল। তারপর গাড়ি স্টার্ট করল।

বিসোই জায়গাটা একটা মালভূমির মতো। সমতল। দুপাশে বন। ভারী ভাল লাগল গামহার-এর।

এগুলো কি গাছ জারুল? চাঁদের আলোতে চকচক করছে পাতা।

এগুলো সব শালগাছ। চলুন সিমলিপালে। আপনাকে গাছ চেনাবো। পাখি চেনাবো।

বেশ। মানুষ চেনার চেয়ে গাছ পাখি প্রজাপতি চেনা অনেকই ভাল, তাই না? তবু মানুষকে যদি চেনা যেত নিশ্চিত। মানুষকে হাড়ে-হাড়ে চেনার চেয়ে এদের চেনা হয়তো অনেক সহজও। তাই না?

তারপরই বলল, ঝাঁঝিও কি গাছটাছ চেনে? তোমার মতো?

চেনে কিছু কিছু হয়তো। তবে ওরা তো আমাদের দু'জনের মতো জঙ্গলের পোকা নয়। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরে না। এই রাস্তা দিয়ে একবার রাইরাংপুরে গেছিল নাকি, তাই বিসোইর ঘাটটা চেনে। ওরাও তো এই প্রথমবার যাচ্ছে সিমলিপালে। তবে ঘাটশিলা যায় প্রায়ই। বহড়াগড়া অবধি তো রাস্তা একই। তাই গ্রীনফিল্ডস-টিল্ডস চেনে। ঘাটশিলাতে ওদের একটা বাড়ি আছে একেবারে সুবর্ণরেখার উপরে।

তাই? তা ঘাটশিলাতে তো বিভূতিভূষণের ডেরা ছিল। ধারাগিরি পাহাড়। সেখানের জঙ্গল দেখেনি ওরা?

হাঃ। ওদের এসব ব্যাপারে ইন্টারেস্ট তো নেই। ঝাঁঝির কথা বলতে পারব না। তবে হারিতের নেই। যখন যায়, তখন খায়, ড্রিঙ্ক করে, তাস খেলে, ঘুমোয়। নিজেকে আনওয়াইন্ড করতেই যায়। এ পর্যন্ত ধারাগিরিতেও নাকি যায়নি একবারও। তবে হারিত এখানে Stag-Party নিয়েই আসে। ঝাঁঝি বিশেষ আসে না। দু'জনের মধ্যে অনেকই অমিল। ঝাঁঝি খুব গভীর মেয়ে। ও যে সুখী নয় আদৌ, তা বোঝা যায়।

গামহার বলল, সংসারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সুখী আর ক'জন মানুষ? তাছাড়া অধিকাংশ সুখী মানুষেরাই স্থূল হয়, সাধারণ হয়। সুখ সকলকে মানায়ও না।

অন্য অ্যাকাউন্ট্যান্টরা, ওর বন্ধুস্থানীয়, ইনকাম ট্যাক্সের কমিশনাররা আসেন বলে শুনেছি ওর সঙ্গে। ওঁরা নির্মল প্রশ্বাস নিয়ে যান আর কী। গাছপালা পাখিতে তো সকলের ইন্টারেস্ট নেই।



আধঘণ্টার মধ্যে ওরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে চলে এল। এখন রাস্তা চমৎকার। চওড়া এবং মসৃণ। চাঁদের আলো দুপাশের জঙ্গলে যেমন চকচক করছে মনে হচ্ছে পথের উপরে যেন আলোছায়ার ডোরাকাটা সতরঞ্জি বিছিয়ে দিয়েছে কেউ।

আপনি আর্টিস্ট, আপনার ভাবনাচিন্তা অন্যরকম। আমি সাধারণভাবে কথাটা বলেছিলাম।

গামহার এককলি ওড়িয়া গান গেয়ে উঠল, 'ওরে মোর সজনী ছাড়ি গল্বা গুণমনি/কা কর ধরিবি?"

বাঃ। জারুল বলল।

মানেটা তো বলবে। আমরা কি ওড়িয়া জানি?

চিকু বলল।

মানে হলো, ও আমার প্রিয়া, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে, আমি কার হাতে হাত রাখব এখন?

বাঃ। ভারী সুন্দর তো।

তোমার কাছে সুন্দর। যার প্রিয়া ছেড়ে গেল তার পক্ষে প্রাণান্তকর।

হেসে বলল, গামহার। ওরাও হেসে উঠল।

ওড়িশার রাস্তা দেখেছ গামহারদা? গত সপ্তাহে চারমল-এর জঙ্গলে গেছিলাম ঝাড়সুগুদা থেকে সম্বলপুর হয়ে। একটা রাস্তা বানিয়েছে ওড়িশা সরকার রাউরকেলা থেকে সম্বলপুর, দুশো কিমি, দেখার মতো। সব গাড়ি ও বাস থেকে টোল নিচ্ছে। কয়েক বছরের মধ্যেই খরচা উঠে আসবে। সেই পয়সাতে আবার অন্যত্র রাস্তা করা যাবে। ও রাজ্যে সেন্ট্রাল রোডওয়েজ করপোরেশনের পথঘাটও বেশ ভাল।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এমন করা যায় না?

আমি কী করে বলব বলো। এম এল এ-দের বলো, মন্ত্রীদের বলো। পশ্চিমবঙ্গে যা করা সবচেয়ে সোজা তা হচ্ছে নাম বদল। এতোদিনের ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হয়ে গেল, আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভিন্যু।

তিনি কে? কোনো বড়লোক অবশ্যই।

শুনেছি প্রমথ চৌধুরীর দাদা, যিনি ছোটভাই-এর সঙ্গে কমপিটিশনে নেমে নাকি হেরে গেছিলেন।

কোন প্রমথ চৌধুরী? বীরবল?

ইয়েস!

কিসের কমপিটিশন?

ইন্দিরা দেবীকে বিয়ে করার।

স-ও-ও-ত্যি, বলে বড় হেঁচকি তুলল একটা জারুল।

সত্যি।

ড্যালহাউসি স্কোয়ার যে বিবাদী বাগ হলো, আজকালকার ছেলেমেয়েরা তাকে জানে বাদী-বিবাদীর বিবাদী বলেই। কে যে বিনয়? কে যে বাদল? আর কে যে দীনেশ তা কি তারা জানে?

তাও ভাল যে, লেনিন-স্ট্যালিন মার্গ হয়ে যায়নি নাম।

বলা যায় না, এখনও হতে পারে যে-কোনো দিন।

তা অবশ্য ঠিক।

একটু দাঁড়িয়ে, চাঁদনি রাতের জঙ্গলের ছিনছিনারী একটু ভাল করে দেখে গেলে হতো না? চাঁদনি রাতের জংলী রূপ।

এখানে কি দাঁড়াবে গামহারদা? জঙ্গলের রূপ দেখাতেই তো তোমাকে নিয়ে এসেছি এবার। এই মহিলার প্রেমে তুমি একবার পড়লে আর কোনো মহিলাকেই চোখে ধরবে না।

চিকু বলল।

কার প্রেমে? ঝাঁঝির?

অন্যমনস্ক হয়ে-যাওয়া গামহার বলল।

জারুল আর চিকু একসঙ্গে জোরে হেসে উঠল।

চিকু বলল, তুমি ঝাঁঝির প্রেমে পড়েছ মনে হচ্ছে।

গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে গামহার বলল, ঠিক প্রেম নয়। Artist's Interest। ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। তাছাড়া প্রেমে পড়লেই বা কি? প্রেম কি দোষের? একেবারেই দোষের নয়।

আমার তো মনে হয় প্রেম একটা আঙ্গিক যা নইলে ব্রহ্মা জগন্নাথ হতেন। তাছাড়া, গামাদা তোমাকে বলি, হারিত, প্রেম যে কাকে বলে, তা আদৌ বোঝে না। ঝাঁঝি মেয়েটা ভীষণই লাভ-সিক। সর্বার্থে। Artist's Material হিসেবে আইডিয়াল।

বলেই, হাসল চিকু।

হারিত বুঝি ভীষণ আনরোম্যান্টিক। জানি না, সব অ্যাকাউন্ট্যান্টরাই কি এমন হন?

বাঃ। তা হবে কেন? বেরসিক সব প্রফেশনেই থাকে। অধ্যাপক, গায়ক, এঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার। জেনারালাইজ করা যায় না কখনওই অমন করে।

তুমি যদি আধমরা হয়ে থাকো তো ঝাঁঝির গান শুনলে যে একেবারেই মরবে। মরে ভূত হয়ে যাবে। বাঁচার কোনো পথই থাকবে না।

জারুল বলল।

মরতে দুঃখ নেই। যদি তেমন মরণ হয়।

কটা হলো, রাত এখন? দেখো তো তোমার ঘড়িটা।

চিকু জিজ্ঞেস করল জারুলকে।

দুটো। ঠিক দুটো।

বাঃ। ভাবতেই ভাল লাগছে। বহু বছর বাদে এমন সারারাত গাড়ি চালিয়ে কোথাও চলেছি। আগে তো রাতেই বেরোতাম খাওয়া-দাওয়া করে। এখন ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন যা।

ওড়িশা কিন্তু সেফ।

তাই?

আমরা সাড়ে-চারটে পাঁচটা নাগাদ যোশীপুরে পৌঁছে যাব। যদি চা খেতে চাও গামহারদা তবেই যোশীপুরে যাব নইলে আগেই আমরা ঢুকে যাব জঙ্গলে বাঁ দিকের পথ দিয়ে।

বলল, জারুল।

বাঃ! যোশীপুরে তো যেতে হবেই ফরেস্ট অফিসে। পাস নিতে হবে না? আমাদের রিসার্ভেশন তো ফোনে করা আছে। সেখানে কোনো গণ্ডগোল হলেই কেলো।

ও তাই তো! ভালই হলো তাহলে।·গরম গরম চা-সিঙ্গাড়া খেয়েই যাওয়া যাবে চাহালাতে।



গাড়ি চলেছে মসৃণ চওড়া পথ বেয়ে পাহাড় বনের মাঝের চন্দ্রালোকিত রাতে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো বন-অনভিজ্ঞ গামহার চেয়ে আছে বাইরে। গাড়ির ড্যাশবোর্ডের প্যানেলের বহুরঙা নরম আলোগুলিকে যেন দূরের আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র নিচয় বলে মনে হচ্ছে। কেউই কোনো কথা বলছে না। সবাই অনেকক্ষণ চুপচাপ। অনেকক্ষণ। যে যার ভাবনায় মগ্ন।

প্রত্যেক মানুষই সামাজিক বেষ্টনীর মধ্যে থেকেও যে আলাদা, একেবারেই আলাদা তা বোঝা যায় মানুষ যখন একা থাকে, একা ভাবে।

ভাবছিল গামহার। স্বামী-স্ত্রী, লিভ-টুগেদারের পার্টনার, প্রেমিক-প্রেমিকা, বাবা-ছেলে, মা-মেয়ে, ভাই-বোন সকলের সঙ্গে সকলের যোগসূত্র একটা থাকলেও তারা প্রত্যেকেই মূলত আলাদা আলাদা মানুষ। তাদের এই একলা থাকা, একলা ভাবা যতদিন থাকবে, মানুষের মনুষ্যত্বও ততদিনই থাকবে। জারুল যেমন বলেছিল, একজনের ভাবনা অন্যে দেখতে পেলে বেশ হতো, তা কোনোদিনই সম্ভব হবে না। ভাগ্যিস হবে না।

দীর্ঘ নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে চিকু বলল, তোমরা এমন চুপ মেরে গেলে অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে যে। এই শেষ-রাতটাই বিপজ্জনক। নাও জারুল এবার একটা গান শোনাও তো। মৃণাল চক্রবর্তীর একটা গান গাও।

গামহারদার সামনে গান গাইতে ভয় করে। ভোর হয়ে আসছে, একটা ভৈরবী ধরো না গামহারদা, বড়ে গুলাম আলি খাঁ নয়তো ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের।

ভোর এখনও হয়নি।

তুমি কেমন গাইয়ে? গান গেয়ে মিএঞা তানসেন আগুন জ্বালাতেন, বৃষ্টি নামাতেন, বৈজু বাওয়ারা পাথরের মূর্তির চোখে জল আনতেন আর তুমি সূর্য ওঠাতে পারবে না।

আমি তো আর পরশুরামের থুরি, সত্যজিৎ রায়-এর "পরশ পাথরের" সাধু নই যে, "ওঠ ওঠ" বলব আর সূর্য লাফিয়ে লাফিয়ে উঠবে।

তারপর বলল, সকালের রাগের মধ্যে কী রাগ ভাল লাগে তোমার?

ভাল গাইলে, সকালের সব রাগই ভাল লাগে। ভীমসেন যোশীজী অথবা রাশিদ খাঁর মতো যদি কেউ গায় তো চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়। অজয় চক্রবর্তীর মেয়ে কৌশিকীর গান শুনেছেন আপনি গামহারদা?

শুনেছি। ভারী মিষ্টি মেয়ে। একদিন ভারতের এক নম্বর গাইয়ে হতে পারে। ওর বাবাই ওর ভরসা এবং ওর বাবাই ওর বিপদও বটে। মেয়েকে প্রকৃত ক্লাসিকাল আর্টিস্ট করে

তুলতে হলে অজয়বাবুর উচিত ওকে তাঁর নিজের সবরকম প্রভাবমুক্ত করা। আমার মতে, অজয়বাবুর উপরেও ঈশ্বরের অনেক আশীর্বাদ ছিল কিন্তু তিনি হয়ত সস্তা খ্যাতি আর অর্থের জন্যে দলেবলে নিজেকে বাণিজ্যিক করে ফেলছেন। জানি না, আমি ভুলও হতে পারি। খাঁটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাইয়ে আর মায়ের মন্দিরের পূজারীতে কোনো তফাৎ থাকলে তো চলবে না। পবিত্রতা, সততা, ঋজুতা এবং একনিষ্ঠ পূজারীর পুজোতেই দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

জারুল বলল।

গামহার বলল, আমার কিন্তু তা মনে হয় না। সব উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গাইয়ে কি সবরকম গান গাইতে পারেন? অজয়বাবু পারেন। আমার তো এটাকে দোষ মনে হয় না, গুণই মনে হয়।

তারপর একটু থেমে গামহার বলল, তা সকালের কোন রাগ তোমার সবচেয়ে ভাল লাগে তা তো বললে না জারুল।

ললিত, যোগিয়া, কুকুভ-বিলাওল, বিভাস, দেশকার ভাল লাগে সবই।

তারপরই জারুল চিকুকে বলল, গাড়িটা একটু দেখেশুনে থামাবে।

কেন?

থামাও না।

আরে কেন তা বলবে তো? গাড়ির বনেটে বসে গান গাইবে?

আরে না।

শুশু করবে?

আঃ ভারী অসভ্য তুমি।

ইসস, কী এ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স। কোথায় হচ্ছিল ললিত আর যোগিয়ার কথা তার মধ্যে শুশু।

তারপর বলল, দাঁড়াও। সামনে দাঁড় করাচ্ছি। চড়াইটা উঠে। এখানে জঙ্গল বেশ গভীর। তোমাকে ডাকাতে ধরে নিয়ে গেলে? বিয়ে-করা বউ তো নও। ঝামেলার একশেষ হবে।

তা ঠিক।

গামহার বলল।

বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, ডাকাতে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা।

আর পুলিশে ছুঁলে বাহাত্তর ঘা।

চিকু বলল।

ওড়িশার পুলিশও কি আমাদের পশ্চিমবাংলার পুলিশের মতো ভাল?

পশ্চিমবাংলো নয়, বলো 'বাংলা'।

ওই হলো!

পুলিশ হচ্ছে ঘোড়ার পুরিষ। ক্ষততে লেগেছে কী ধনুষ্টংকার।

পিনাকেতে লাগে টংকার। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলাতে শুনেছ?

গামহার বলল।

চিকু বলল, অশোকদা ভারী ভাল মানুষ ছিলেন। কিন্তু গলাটা টাল-খাওয়া চাকার মতো দুলতো অনেক সময়ে তাই না?

ওরা সকলেই হেসে উঠল চিকুর কথাতে।

গামহার বলল, পুলিশের কোনো রকম-ফের নেই। পুলিশ হচ্ছে অর্শ'র যন্ত্রণা। সব দেশেই, সব প্রদেশেই একই রকম।

আমাদের ভয় কি? তুমি তো ওড়িয়া বলতে পারো।

টিক্কে টিক্কে কহু পারুচি। এব্বে প্র্যাকটিস ছাড়ি গল্বা।

চিকু হেসে বলল, কেন যে সেই সুন্দরী ওড়িয়া মহিলার সঙ্গে প্রেমটা চালিয়ে গেলে না বল তো? তাহলে তো প্র্যাকটিস ছাড়ত না!

আমার ওই প্রেম নিয়ে ঠাট্টা কোরো না। বড় পবিত্র ছিল সে প্রেম। পুরো ওড়িশা আর ওড়িশাবাসীই আমার চোখে এক বিশেষ স্থানে বসে আছে শুধু ওরই জন্যে।

নাও। নামো এবারে। পাহারাদার লাগবে?

গাড়ি থামিয়ে, চিকু বলল, জারুলকে।

না।

বিরক্ত হয়ে বলল জারুল।

তবু একজনের নামা উচিত।

গামহার বলল।

চলো, দু'জনেই নামি। মুক্ত বায়ুতে সিগারেট খাই একটা। তুমি খাবে নাকি?

দাও। বিনা পয়সাতে দাদের মলম পেলেও খেতে বলেছিল আমার গুরু।

হেসে উঠল, চিকু।

জারুল, পথের ডানদিকের ঢালুতে বড় বড় গাছ আর ঝোপ যেখানে সেখানে নেমে গেল। পুবের আকাশ সাদা হতে আরম্ভ করেছে। সাদা ঠিক নয়, সাদার আভাস লেগেছে সবে আর পশ্চিমাকাশে অস্তগামী চাঁদের হালকা রুপো রুপোর জল লাগিয়েছে। এখানে জঙ্গল নেই তেমন।

সিগারেট শেষ হতে হতে জারুল ফিরে এল।

বলল, ম্যাগো! ভয়ে প্রায় মরেই গেছিলাম।

কেন?

একটা কুমীর!

ডাঙায় কুমীর?

হ্যাঁ। তবে ছোট।

গামহার ডাঙায় কুমীর শুনে বিভ্রান্ত হয়ে গেছিল।

গো-সাপ হবে। কোথায় ছিল?

চিকু বলল।

কোথায় আবার? ঠিক আমার সামনেই।

ব্যাটা জাতে নিশ্চয়ই পুরুষ।

চিকু বলল।

সবাই একটুক্ষণ চুপ।

গামহার বলল, সেই মিঞা-বিবির কী হলো বলতো? তুমি তো এমন কিছু জোরেও

চালাচ্ছিলে না, রাস্তায় মাঝেমধ্যে দু-একটা ট্রাক ছাড়া কোন ট্রাফিকও নেই অথচ তাদের এখনও পাত্তা নেই কেন?

এসে যাবে।

নিরুদ্বেগ গলাতে বলল চিকু।

জারুল বলল, দাঁড়ালামই যখন, তখন আরও মিনিট দশেক দেখে নিয়েই এগোনো ভাল। কী বল? গাড়ি খারাপ হলো না তো?

মারুতি-এস্টিম। মাস দুয়েক হলো নিয়েছে। খারাপ হবে কি? তবু ভোর তো হয়েই গেল। চলো একটু মর্নিং-ওয়াক করে নিই।

তার চেয়ে একটা গান শোনাও তুমি গামহারদা।

গামহার ধরে দিল ভীষ্মদেব-এর গাওয়া বিখ্যাত গানটি, রামকেলিতে, 'জাগো, আলোক লগনে...'

গান শেষ হলে জারুল বলল, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল গো! সত্যি বলছি গামহারদা। তোমার গলাতে সুর-লয় তো আছেই, এমন ভাব আছে না! তুমি গায়ক হলেই ভাল করতে।

কোনো গুণকেই পেশা করে ফেললেই সরস্বতী চটে যান। সরস্বতী ভাঙিয়ে লক্ষ্মীর আরাধনা কি সহ্য হয়?

সে কথা হয়ত ঠিক। লেখাই বল, গানই বল, ছবি আঁকাই বল, পেশা করে ফেললেই তাতে আনন্দ অনেকই কমে যায় হয়ত। যাঁরা সে লেখা পড়েন, গান শোনেন বা ছবি দেখেন তাঁদেরও আনন্দ সম্ভবত ক্রমশই কমে আসতে থাকে। অথচ আনন্দই সব সৃষ্টির উৎস এবং গন্তব্য। পেশাদার হয়ে যাওয়ার পরও সৃষ্টিকে একঘেয়েমি থেকে বাঁচিয়ে রাখা ভারী কঠিন। বড় কম মানুষেই তা পারেন।

ছবিকে তো বেসাতি করেইছি। গানটা না হয় আমার নিজস্ব গোপন ধন হয়েই থাকল।

কথাটা ভাববার বটে।

চিকু বলল, কুড়ি মিনিটেরও বেশি হয়ে গেছে। এবার চিন্তাতে পড়া গেল। মিঞা-বিবি পথের পাশে গাড়ি লাগিয়ে ঘুম লাগালো না তো? চলো গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে দেখতে যেতে হবে।

পুবের আকাশে সাদা ছোপ লাগলেও পাহাড় থাকাতে এবং ঘন জঙ্গল থাকাতে হেডলাইট জ্বেলেই চলতে লাগল চিকু। ছায়াচ্ছন্ন পথের উপরে অন্ধকারই আছে এখনও। গাড়ি চলেছে তো চলেছেই।

এবারে চিন্তা হতে লাগল ওদের সকলেরই।

বাংরিপোসিতে ওরা রাতে থেকে গেল না তো কোনো হোটেল-টোটেলে?

বাঃ তা কী করে হবে।

বিসোই-এর ঘাটে পুজো দিল না? সে জায়গা তো বাংরিপোসি পেরিয়ে এসে।

বাঃ ওরা কোথায় ছিল? আমরা তো আগেই পুজো দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

তাহলে হতেও পারে।

জারুল বলল।

ছাড়ো তো। পরস্ত্রী হলেও না হয় বোঝা যেতো। নয়ত প্রেমিকা। বিয়ের পাঁচ বছর পরেও অত রস থাকে না কারো যে হঠাৎ করে পথ-পাশের হোটেলে রাত কাটাতে যাবে।

তোমার মতো আনরোম্যান্টিক তো সকলে নাও হতে পারে।

হারিত ঘোষ আমার চেয়ে অনেক বেশি আনরোম্যান্টিক। বালান্সশীট মিলিয়ে মিলিয়ে রস-কষ বলতে ওর আর নেই কিছুমাত্রই।

ওরা প্রায় পাঁচ-সাত কিমি মতো চলে এসেছে এমন সময় চিকু বলল, সর্বনাশ।

কি?

জারুল আর গামহার সমস্বরে বলে উঠল।

ভিড়িয়েছে।

চিকু বলল।

চিকরাসির গাড়ির হেডলাইটে পথের ডানদিকে তালগোল পাকানো কাঁচের গুড়োতে মাখামাখি একটা সাদা পিণ্ড দেখা গেল খুব মোটা একটা গাছের সামনে।

গাছের সঙ্গে ভিড়িয়েছে।

আবার স্বগতোক্তি করল চিকু।

চিকু গাড়িটা ডানদিকে করে এগিয়ে নিতে নিতে আবারও স্বগতোক্তি করল, দু'জনেই শেষ!

কী বলছ?

বলেই, ডুকরে কেঁদে উঠল জারুল।

বাঁদিকের বুকে খুব কষ্ট হতে লাগল গামহারের। ভাবল, ছবিটা আঁকবে ভেবেছিল মনোমতো করে, আঁকা হলো না আর। ওর কপালটাই এরকম।

চিকু গাড়ি দাঁড় করিয়ে নামল, ওরা দুজনেও নামল। পরক্ষণেই ভূত দেখার মতো দেখল, সেই পিণ্ড থেকে হারিত আর ঝাঁঝি বেরিয়ে আসছে। বেরিয়ে, আশ্চর্য! নিজেদের পায়ে ভর দিয়েই দাঁড়াল। তবে দু'জনেরই সর্বাঙ্গে কাঁচের গুঁড়ো আর রক্তর ফোঁটা।

গামহার দেখল ঝাঁঝির ঝাঁঝি-রঙা শিফনের শাড়িটার মধ্যে আর তার ছোট হাতার গাঢ় সবুজ ব্লাউজে লাল রক্তর হাজারো বিন্দু ফুটে উঠে একটা দারুণ ডিজাইন-এর সৃষ্টি করেছে।

ওরা দু'জনে বেঁচে আছে দেখে ওরা তিনজনই একইসঙ্গে বিভিন্নরকম অভিব্যক্তি করল, যা আলাদা করে বোঝা গেল না কিন্তু একই সঙ্গে শোনা গেল।

গাছের সঙ্গে মারলে, তো গাড়িটার মুখ রাইট অ্যাঙ্গেলে ঘুরে গেল কেমন করে?

চিকু জিজ্ঞেস করল হারিতকে।

গাছের সঙ্গে নয়।

যেন ঘোরের মধ্যে বলল হারিত।

তো?

ট্রাকের সঙ্গে।

ট্রাকের সঙ্গে? মুখোমুখি?

হুঁ। তবে সে ব্যাটা ট্রাক-ড্রাইভার আমাকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কী করব। দু'জনেই তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অথচ দু'মিনিট আগেই গল্প করছিলাম।

আনথিংকেবল। তোমরা বেঁচে আছ কি করে, তাই তো মাথাতে আসছে না।

গামহার বলল।

ঝাঁঝি শব্দ না করে, হেসে বলল, কপালে আরও অনেক দুঃখ আছে, হয়তো তাই।

আশ্চর্য মেয়ে বটে! অন্য যে কোনো মেয়ে হলে হাঁউমাঁউ করে কেঁদে উঠত সহানুভূতি আর কলের চাবি একইরকম মেয়েদের কাছে। চাবি খুললেই জল ঝরতে থাকবে। এমন শক্ত মেয়ে দেখেনি কখনও।

গামহার ভাবছিল।

ও তড়িঘড়ি করে বলল, কে বলতে পারে! কপালে সুখও থাকতে পারে অনেক!

চিকু বলল, এক ঘুঁট হুইস্কি খেয়ে নাও দু'জনেই। যা শক পেয়েছ। আর সারা শরীরে হুইস্কি ঘষে নাও। তারপর বলল, কতক্ষণ হয়েছে?

সকাল চারটে কুড়িতে।

এই গাড়ি দেখলে কেউই কি বিশ্বাস করবে যে, সামনের সিটে-বসা দুই যাত্রীই বেঁচে আছে?

তা করবে না। তবে মারুতি কোম্পানির গাড়ির বিশেষত্ব আছে বলতে হবে।

ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গে স্টিয়ারিংটা আমার বুকে না লেগে উপরে উঠে গেছিল।

জারুল বলল, প্লাসটিকের গাড়ি বলে ঠাট্টা করেন অনেকে কিন্তু এ যদি বিড়লার আম্বাসাডার বা মাহিন্দ্রার জীপ হতো মার্সিডিজ ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগার ইমপ্যাক্টে কী অবস্থা হতো বলো তো। স্পট-ডেড হতে দু'জনেই।

রাখে কেষ্ট মারে কে?

হারিত বলল।

মস্ত গাছটার বিরাট পরিধির কালচে-খয়েরি গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ঝাঁঝি। রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত, মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ায় ভীত এবং সারা শরীর ও মুখ কাঁচের গুঁড়ো লেগে রক্তাক্ত হওয়া বিভ্রান্ত ঝাঁঝির দিকে তাকাল গামহার। খুব ইচ্ছে হলো ওকে একটা চুমু খায়। অথবা ওর সমস্ত কটি ক্ষতস্থানে জিভ দিয়ে চেটে রক্তবিন্দুগুলি পরিষ্কার করে দেয়। ওকে বুকে নিয়ে একটু আশ্বস্ত করে। গামহার যদি মানুষ না হয়ে কোন চতুষ্পদ প্রাণী হতো তবে তো জিভ দিয়ে চেটে-চেটেই শুশ্রূষা করত। প্রথমত ও প্রাণী নয় মানুষ, দ্বিতীয়ত সমাজের মতে ঝাঁঝি তার কেউই নয়। তাই অনাত্মীয়া নারী শরীরে তার হাত ছোঁয়ানোও মানা। হারিত তার স্বামী। ঝাঁঝির শুশ্রূষা করতে পারত সেই কিন্তু তালগোল-পাকানো গাড়ির পেছন থেকে বাকার্ডি রাম-এর বোতল খুলে সে তখন সোজা গলায় ঢেলে বল সঞ্চার করছিল।

হঠাৎই গামহারের মনে পড়ে গেল পরশু কোনো কাগজে একটি বিজ্ঞাপন দেখেছিল যারা দুর্বল তারাই মদ্যপান করে। কথাটা হয়ত সত্যি। হারিতের মুখে মদ আর ঝাঁঝির মুখে হাসি। কী সুন্দর বিধুর হাসি। সে হাসি, যে হাসে তাকে যত না আনন্দ দেয়, তার চেয়ে অনেকই বেশি আনন্দ দেয় যে সেই হাসি দেখে, তাকে।

লেগেছে খুউব? ঝাঁঝির কাছে গিয়ে বলল, গামহার। কাল বিকেলের পর এই প্রথম সরাসরি কথা বলল গামহার ঝাঁঝির সঙ্গে।

না তো। লাগেনি।

চা খাবে?

কোথায় পাব?

নিয়ে আসছি যোশীপুর থেকে বোতলে করে।

বলবার সময় ভুলে গেল যে, সে পরনির্ভর এবং যোশীপুর ছ-সাত কিমি দূরে কম করে।

চিকু শুনে বলল, উল্টোটাই করছি। তুমি বরং এখানে থেকে গাড়িটা পাহারা দাও গামহারদা। গাড়িটা টেনে যোশীপুরে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। কিন্তু সামনেটার যা অবস্থা, সামনের দুটো টায়ারই গেছে। টেনেও তো নিয়ে যাওয়া যাবে না। কোনো ট্রাকে করে কলকাতাতে পাঠাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। নবেন্দুকে গিয়েই এস টি ডি করতে হবে ও যেন ওর ফিয়াট উনো নিয়ে এখুনি রওয়ানা হয়ে চলে আসে। তা নইলে আমার মারুতি-জেন-এ তো মালপত্র নিয়ে পাঁচজন মিলে যাওয়া যাবে না।

জারুল বলল, তুমি কি পাগল। এরপরও জঙ্গলে যাবে! এবারে বাদ দাও, বাধা যখন পড়েছে।

চিকু বলল, বাধা পড়েছে বলেই তো জেদ চেপে গেছে আমার। জঙ্গলে যেতেই হবে। গামহারদাকে জঙ্গল দেখাব বলেছি!

গামহার বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ যাব।

ঝাঁঝিও বলল, বাধা পড়েছে তো কি হয়েছে? আমাদের বেঁচে যাওয়াটা সেলিব্রেট করতে হবে না জঙ্গলে গিয়ে? মানুষের তো একটাই মাত্র জীবন।

গামহারের এতো বয়স হলেও ও যেন ভুলেই গেছিল যে, মানুষের একটা মাত্র জীবন! সেও বিড়বিড় করে বলে উঠল, একটা মাত্র জীবন। মাত্র একটা। ঝাঁঝির সঙ্গে কটা দিন জঙ্গলে কাটাবার জন্য কর্বুর মার্বল বা ঘুড়ি পাওয়ার জন্যে শিশুর যা আকুতি তেমনই আকুতি বোধ করল গতযৌবন গামহার। শিশু হয়ে গেল।

ইনস্যুরেন্স-এজেন্ট-এর ফোন নাম্বার জানা আছে কি হারিত?

চিকু আবারও জিজ্ঞেস করল।

কিসের জন্যে ফোন করবে এজেন্টকে?

জারুল বলল।

বাঃ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি তা নইলে থোড়াই ক্লেইম দেবে। থানাতেও ডাইরী করতে হবে একটা।

কী আছে আর গাড়ির? এ তো টোটাল লস।

হারিত হতাশ গলায় বলল।

সে জন্যেই তো আরও করা দরকার।

গামহার বলল, আরে গাড়ি গেছে আবার নতুন গাড়ি আসবে। প্রাণ গেলে কি প্রাণ আসত? তুমি তো বড় কৃপণ আছ হে হারিত।

চিকু মনে মনে একটু খুশিই হল। সন্দেহ নেই হারিত বেশ কৃপণ। অথচ কৃপণ হওয়া উচিত ছিল না।

গামহার-এর দিকে তাকিয়ে এবারে চিকু বলল, পুলিশে ছুঁলে বাহাত্তর ঘা। তুমিই বলেছো গামহারদা। আর আমাদের মধ্যে তুমিই একমাত্র ওড়িয়া জানো। সামলাও এবারে। ছোট জায়গার থানার বাবুরা তো তেমন ইংরেজী জানবেন না।

তাহলে? আমি কি যাব?

গামহার বলল।

দাঁড়াও না। পর্বতই মহম্মদের কাছে আসবে। আমি আহতদের আর জারুলকে নিয়ে যোশীপুরে গিয়ে ওইসব কাজ করছি। প্রাথমিক। ওদের তো ফার্স্ট-এইডও দিতে হবে। মেয়েদের একটু বাথরুম-টাথরুমেও যেতে হবে। ফেরবার সময়ে তোমার জন্যে বোতলে করে চা নিয়ে আসব। আর যদি বেশি ঘাবড়ে গিয়ে থাকো তো হুইস্কির বোতল রেখে যাচ্ছি। দু'চুমুক মেরে দাও। সর্বরোগহারী নির্জৌষধি।

গামহার বলল, না, না। খালি পেটে হুইস্কি?

তাতে কি? নাইনটি পার্সেন্ট কবিরাজী বা বায়োকেমিক ওষুধ তো খালি পেটেই খেতে হয়।

গররাজি গামহার বলল, না। তোমরা এগোও। সিগারেট আছে কি?

আছে। তোমাকে কখনও সিগারেট খেতে তো দেখিনি।

এমন বিপদেও তো কখনওই পড়িনি।

তাই? নাও একটা প্যাকেট রাখো। আমি এগোলাম।

বলে, ওর গাড়িতে এ গাড়ির যতখানি লাগেজ আঁটে, ততটুকু নিয়ে চিকু চলে গেল। তবু অনেক মালই রয়ে গেল।

হারিত কথা বলছিল না। স্তম্ভিত হয়ে গেছিল সে। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে তফাত যে বড় সামান্যই এই কথাটাই বোধহয় সে আস্তে আস্তে হৃদয়ঙ্গম করে একেবারে নীরব হয়ে গেছিল। এতক্ষণ ভয় পায়নি। কিন্তু এখন তার হাত পা থরথর করে কাঁপতে লাগল।

গামহার ভাবছিল, ভাগ্যিস ওদের ছেলে-মেয়ে নেই। বাবা-মা একসঙ্গে চলে গেলে সেই শিশুদের কি হতো?



ওরা চলে গেলে, গামহার গাড়িটার পেছনের অংশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে অনভ্যস্ত হাতে একটা সিগারেট ধরালো। এবং ধরিয়েই খুক খুক করে কাশতে লাগল। এমন সময়ে জঙ্গলের মধ্যে থেকে যেন জঙ্গল ফুঁড়েই একটা-দুটো করে মানুষ, অধিকাংশই ছোট ছেলেমেয়ে গাড়ির কাছে এগিয়ে আসতে লাগল আর অনর্গল প্রশ্নবাণে তাকে জর্জরিত করতে লাগল। গামহারও যথাসাধ্য তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতে লাগল।

সব্বে মরিলা কি বাবু?

নাই ম।

কেত্তেজন থিলা?

দ্বিজন।

আপনি থিলে কি?

নাহি। মু অন্য গাড়িরে থিলা।

আপনংকু চোট লাগিলা কি?

নাহি।

কেমিতি এমিতি হেলা?

নিন্দ লাগিকি আঁখি বন্ধ হই যাই থিলা।

এই বাক্যটা লাগসই হল না। ইসস্ কুমুদিনী! তুমি এ তো বছর পরে আমাকে এমন করে কষ্ট দেবে কে জানত। মনে মনে নিরুচ্চারে বলল, গামহার।

সেমানে কুয়াড়ে পলাইলে আপনংকু ছাড়িকি?

পুলিশ আসিথিলা কি?

নাহি।

উত্তর দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেল গামহার। ভাবল, একদিক দিয়ে ভালই হলো, তার চর্চা চলে-যাওয়া ওড়িয়াটা বাধ্য হয়েই চালু করতে হলো। পুলিশের সঙ্গে কথোপকথনে কাজে লাগবে।

ঈ গাছুটা কওন গাছুরে পিলা?

একটি ছোট্ট ছেলেকে জিগ্গেস করল গামহার।

সেটা গুট্রে গাছু বাবু।

বিরক্ত হয়ে গামহার বলল, সে তো সব্বমানে জানিচি। তাংকু নাম্বটা কন?

সে মু জানিনাস্তি। কহি পারিবুনি।

তার পাশে দাঁড়ানো মেয়েটি বলল, তু জানিনাস্তি? সে গাছুটা কন্দম গাছু বাবু। সে বহুত বুড়া গাছুটা।

কন্দম গাছু?

হাসি পেয়ে গেল গামহার-এর। কদমতলাতে রাধা-কৃষ্ণর তো একইসঙ্গে থাকার কথা। সে এখন পাণ্ডব-বর্জিত জঙ্গলের কদমতলাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাধার শাড়ি-জামা-আন্ডি-ব্র্যাসিয়ার ভর্তি শ্যুটকেসটি পাহারা দিচ্ছে। আর রাধা তার নোটারি-পাবলিক-এর অথেনটিকেটেড কৃষ্ণর সঙ্গে গরম গরম চা খাচ্ছে যোশীপুরে। যার কপালের যেমন লিখন। এরই জন্যে বেঁটে-কাকীমা চিরদিন বলে এলেন, কপালে গোপাল করে।

এখন চারদিকে রোদ ঝকঝক করছে। অনেকক্ষণ ধরে হবো-হবো করে সকাল সত্যিই হয়েছে। বসন্তর রোদ। এখনও বসন্তর রেশ আছে। কতরকমের গাছ চারদিকে। নাম জানে না ও। ঘাসে ছাওয়া মাঠ। ক্লোরোফিল-উজ্জ্বল ঝকঝকে সবুজ পাতা। সবুজ আর লাল টিয়া পাখির ঝাঁক ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ করতে করতে উড়ে গেল হাওয়াতে চাবুক মেরে। কোনো জবরদস্ত পুরুষ গায়কের দিল-ধড়কান অচানক হলক্ তানেরই মতো।

যেখানে ঘাস নেই, জমি উদোম, সেখানে জমির রং লাল। ছেলেবেলাতে হাজারিবাগে যেমন দেখেছিল বলে মনে আছে। বিহার ওড়িশার চেহারাতে বোধহয় বিশেষ তফাৎ নেই। ওড়িশাতেও দেখছে বিহারের মতোই পাহাড় আছে। তবে, ওড়িশা সম্ভবত বিহারের চেয়ে বেশি সবুজ। তাছাড়া, ওড়িশাতে সমুদ্র আছে অনেকই জায়গাতে। বিহারে সমুদ্র নেই।

হারিতের গাড়িটা রাস্তার এক কোণে এই কদম গাছতলাতে সমকোণে যেদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকেই পথের অদূরেই একটি পাহাড় উঠেছে। ছোট পাহাড়। পাহাড়ের পর পাহাড়। তারপরে আরও পাহাড়। সমুদ্রের ঢেউয়েরই মতো। সমুদ্রের ঢেউ নীল, আর সাদা পাহাড়ের ঢেউ সবুজ আর লাল আর হলুদ আর কালো। ভারী সুন্দর মিষ্টি একটা গন্ধ ভাসছে হাওয়াতে। পাহাড়ের উল্টোদিকের ফাঁকা লাল প্রান্তরের মধ্যে ছোট ছোট গাছ ছড়ানো। এগুলো কি শাল? কে জানে। জারুল আর চিকু থাকলে বলতে পারত। সেই প্রান্তরের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বড় প্রাচীন গাছ। এদেরই বোধহয় মহীরুহ বলে। তার নীচে ছোট-বড় মেয়েরা ভিড় করে কী যেন কুড়োচ্ছে। হাওয়াটা এদিক দিয়েই আসছে। কোনো ফুল কুড়োচ্ছে কি ওরা? না কি ফল?

সে বড্ড গাছুটার নাম কন?

সেট্টা মহুয়াটা না! আউ কন?

সে গাছতম্বে সে ঝিওমানে কন করিছন্তি?

মহুল ফুল নুচিকি নেউচি, আউ কন? সে গাছু মালিক আসি পড়িবে আটটা বেলে। নুচিকি নেইকি পলাইবে সেমানে।

মানে, মহুয়ার ফুল লুকিয়ে লুকিয়ে কুড়িয়ে নিচ্ছে। সেই গাছের যে মালিক সে আটটার সময় এসে যাবে তাই এতো তাড়া ওদের।

তাই?

তাই তো।

বেলা বাড়তেই ছেলে-মেয়ে ও বয়স্করা নিজের নিজের কাজে চলে গেল। একটা যাত্রী-

বোম্বাই বাস চলে গেল বাংরিপোসির দিকে। দু-একটা টেম্পো, ট্রেকার ও ট্রাকও দেখা যেতে লাগল। সবাই গাড়িটাকে দেখে হায়! হায়! করতে লাগল। হাওয়াতে উড়ে আসতে লাগল তাদের সখেদ মন্তব্য : জনে বাঁচিলানি। সব্বে মরিলা।

সহযাত্রী বলল, হউ! তম্মে ত সব্ব জানুচি!

প্রায় দেড় ঘণ্টা হতে চলল। কিছুই করার নেই। গামহার গাছতলাতে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। তারপর ছবিটা আবার আঁকতে শুরু করল মনে মনে। কল্পনাতে ওই রোদ-ঝলমল দিনের মধ্যেই সবজে-হলদে শিফন শাড়ি পরা ঝাঁঝিকে জামা কাপড় এক এক করে খুলিয়ে সম্পূর্ণ নগ্ন করল। তারপর মনে মনে আঁকতে লাগল। যতবার আঁকল, মুছল তার চেয়ে বেশি। চোখ, চিবুক, চুল সবই মিলল কিন্তু মেলাতে পারল না শুধু মনের ভাবটুকুকে। এই তো কিছুক্ষণ আগেই এই কদমতলাতেই ঝাঁঝি দাঁড়িয়েছিল। এরই মধ্যে ভাবটি চুরি গেয়ে গেছে। এই সুন্দর পৃথিবীতে অনেকই সুন্দর জিনিস আছে বিধাতার সৃষ্ট, যাতে মানুষের তৈরি কোনো তালা-চাবিই লাগে না। তা তার নিজ-খেয়ালে রইলে থাকে, না রইলে থাকে না।

গামহার-এর মনে মনে আঁকা ছবির ক্যানভাসটা ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিয়ে ভটভটানি শব্দ তুলে একটি বড় মোটর সাইকেলে একজন খাকি পোষাকের লোক এসে গাড়ির সামনে নামল। তার প্রায় পেছন পেছন একটা জীপে চার-পাঁচজন পুলিশের উর্দি পরা মানুষ এসে উপস্থিত হলো। যা জানতো, মানে চিকুরা থানাতে যা রিপোর্ট করেছে, তাই নতুন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গামহারের কাছ থেকে শুনলো। এমন সময়ে আর. টি.-তে খবর এলো সার্কল ইনসপেক্টর এসেছেন থানাতে রাইরাংপুর থেকে। অতএব জীপটি মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। মোটর সাইকেল-বাহিত ফর্সা, গোলগাল লম্বা চওড়া মানুষটি বললেন, নমস্কার। মু প্রশান্ত পণ্ডা। সান্নবাবু।

মানে, থানার ছোটবাবু।

নমস্কার আইজ্ঞাঁ।

সবিনয়ে বলল, গামহার।

থানার সান্নবাবু, অর্থাৎ ছোটবাবু খুব ভাল করে গাড়িটাকে ঘুরে ঘুরে নিরীক্ষণ করে বললেন, এ গাড়ি তো নিজে যেতে পারবে না, টো করেও নেওয়া যাবে না। কোনো ট্রাক ভাড়া করে সেই ট্রাকে ক্রেন-এ করে তুলে যেখানে নিয়ে যাওয়ার সেখানে নিয়ে যেতে হবে।

তাই?

আপনারা এসেছেন কোথা থেকে?

কলকাতা।

কিন্তু এ গাড়ি তো ছাড়া যাবে না।

মানে?

মানে অ্যাকসিডেন্টের কেস হবে। গাড়ি থানাতেই থাকবে এখন।

কারও তো তেমন চোট লাগেনি।

তাতে কি? গাড়ির তো লেগেছে।

গাড়ি তো গেছে আমাদেরই। অন্য কারো ক্ষতি তো হয়নি।

তা নাই বা হলো।

কিন্তু কেসটা হবে কার বিরুদ্ধে? ওরা তো ট্রাক-এর নাম্বারও নিতে পারেনি। শেষ রাতের অন্ধকারে নির্জন পথে ট্রাক মেরে দিয়ে অথবা বাঁচিয়ে দিয়ে চলে গেছে। ওই অবস্থাতে প্রাণ বেঁচেছে এই ঢের এখন। কে ট্রাকের নম্বর নিতে গেছে।

সে মানংকু রিলেশনটা জানিচু কি আপুনি?

হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ।

সত্য করিকি কহন্তু।

মু কি মিছা কহিলি?

সে বাবু মদ্দ খাইকি চালাইথান্তি কি?

মু কেমিতি জানিবি? মু তো অন্য গাড়ির থিলা।

হউ। যাই হউ। নিশ্চয় কেস করিবাংকু হেব্ব।

কার বিরুদ্ধে কেস করবেন? ট্রাকের নাম্বারই তো নেই।

আননোন-ট্রাককু এগেইনস্টে কেস্ব হেব্ব।

হাঁ হয়ে গেল গামহার। আননোন ট্রাকের এগেইনস্টে কেস!

ভাবছিল, যে-সব অপরাধীর খুনির, চোর, ডাকাতের নাম ঠিকানাও দেওয়া হয় সেখানেও পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ তাদের ধরে এনে সাজা দিতে পারে না আর এখানের পুলিশ তাদের কাজে এতই দড় যে আননোন ট্রাকের বিরুদ্ধেও পুলিশ কেস দিচ্ছে। এমন উদ্ভট কথা বাপের জন্মে শোনেনি গামহার। স্তম্ভিত হয়ে সে গৌরবর্ণ মুখটির দিকে চেয়েছিল। মুখটা দেখে কিন্তু মনে হয় মানুষটা ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না অথচ 'আননোন ট্রাক' এর বিরুদ্ধে কেস ঠুকে দেওয়ার ঐশী ক্ষমতা রাখে। গামহারের মনে হলো, তার স্বদেশ এই ভারতবর্ষ প্রকৃতই শিবঠাকুরের আপন দেশ। এখানের আইনকানুন 'পেরকিতোই' সব্বোনেশে।

এমন সময়ে দেখা গেল চিকুরের গাড়ি ফিরে আসছে। একাই এল। গাড়িটা লাগিয়ে বলল, চা খাও। বলেই, আধ-বোতল চা আর দুটো ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া কলাইডালের বড়া দিয়ে বলল, খেয়ে নাও।

গামহার বলল, ঠাণ্ডা।

যা পাচ্ছ চাঁদমুখ করে খেয়ে নাও গামহারদা। পরে কখন খেতে পাবে তা মারাংবুরুই জানে।

তারপর বলল, তুমি তোমার প্রেমিকার ভাষাতে কথা বলে আমাদের কিছু সুরাহা করতে পারলে?

গামহার হতাশ গলায় বলল, নাঃ। বলছেন, আননোন-ট্রাকের এগেইনস্টে কেস হবে।

সে মানংকু মেডিকেল এগজামিনেশনভি করিবা হেব্ব।

তাদের কিছুই তো হয়নি রে বাবা।

না হেলে, কন হেব্ব। মেডিক্যাল এগজামিনেশন নিশ্চয় করিবাংকু হেব্ব।

চিকু বলল, এতো মহা চিত্তির। রেপ-কেস না কি?

তারপরেই পবননন্দনবৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বর সঙ্গে বাহু ধরে আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়ে নিজের গাড়ির সামনের সিটে বসালো। ছোটবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট হাতে একটা কালো নোটবুক

নিয়ে মোটর সাইকেলের পেছনের সীটে বসে এসেছিল। সে নোটবইটা নিয়ে চিকুর গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতেই ছোটবাবু তাকে অঙ্গুলি-সংকেতে ফিরে যেতে বললেন। তার মিনিট পাঁচেক পরেই চিকু ছোটবাবুর হাতে হাত রেখে, যেন তারা প্রেমিক-প্রেমিকা, এমনই ভাবে এসে বলল, যাও গামহারদা তুমি এবারে গাড়িতে গিয়ে বসে চা'টা খাও। ইস্‌স্‌। এই কাঁকুরে মাটিতে বসেছিলে এতক্ষণ? পেছনে কালশিটে পড়ে যাবে যে।

কী হলো?

গামহার জিগ্গেস করল।

যা হওয়ার কথা ছিল, তাই হলো।

মানে?

মানে, উনি ফিরে গিয়ে একজন পুলিশ পাঠিয়ে দিচ্ছেন এখানে গাড়ি পাহারা দেবার জন্যে। যতটুকু মালপত্র আছে এ গাড়িতে আমরা সবই নিয়ে যাব।

তারপর?

তারপর কি? নবেন্দুর সঙ্গে কলকাতায় কথা হয়ে গেছে। ও, ওর একজন ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে ব্রেক-নেক স্পিডে কলকাতা থেকে রওয়ানা দিয়ে এসে পড়ছে। এলে, ওর ড্রাইভার ট্রাকের সঙ্গে বসে গাড়িটাকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কারখানায় দেবে।

ট্রাকও ঠিক করে ফেলেছ? কত ভাড়া নেবে?

ছ'হাজার।

আর আমি? আমিও কি ট্রাকে করে ফিরে যাব গাড়ির সঙ্গে?

সত্যিই! তোমরা এই আর্টিস্ট-টার্স্টিটরা রিয়্যাল কাছাখোলা। তোমার জন্যে এবারে জঙ্গলে আসা আর তোমাকেই ফেলে রেখে আমরা চলে যাব? ভাবলে কী করে এমন!

ঝাঁঝি, জারুল ওরা সব কোথায়?

জারুলদের ফরেস্ট অফিসের পথে একটা গেস্টহাউসে তুলে দিয়ে এসেছি। নবেন্দুরা এলে হারিত নবেন্দুর সঙ্গে আসবে চাহালাতে। আমরা, মানে, তুমি আর মেয়েরা, যতখানি মাল নেওয়া সম্ভব সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যাব।

চাহালা? সেটা কোথায়?

গেলেই দেখতে পাবে। রাতটা চাহালাতে থেকে কাল ভোরে জোরান্ডাতে যাব।

জোরান্ডা মানে কি জোড়া আন্ডা?

মানে-ফানে নেই। থাকলেও, আমি জানি না।

অধৈর্য গলাতে বলল চিকু।

গামহার আবার বলল, কেস হবে না? মেডিক্যাল এগজামিনেশন? কিসসু হবে না।

ছোটবাবু ততক্ষণে মোটর সাইকেল স্টার্ট করে ফেলে চিকুকে 'প্রণাম স্যর' বলে, মোটর সাইকেল ভটভটিয়ে এগিয়ে গেলেন।

ম্যাজিকটা কি করলে?

ম্যাজিকটা কি করব? আমি কি পি সি সরকার? ম্যাজিক করে, অশোকচক্র ছাপ মারা কাগজ। এক গচ্চা গেল, আর কী!

এক হাজার?

ইয়েস দাদা। তুমি ওড়িয়া জেনেও কিছু করতে পারলে না। টাকার চেয়ে বড় উকিল,

টাকার চেয়ে সর্বমান্য ভাষা এমন আর কিছুই নেই গামহারদা। ব্যাপারটা তোমার পছন্দ হোক কী নাই হোক।

বলো কি?

হতাশ গলাতে বলল, গামহার।

ভাবল, এই নব্য পৃথিবীতে ও একেবারেই অচল হয়ে গেছে।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ তো হাইলি এডুকেটেড। ওঁরা নিশ্চয়ই এইরকম আননোন ট্রাক-এর বিরুদ্ধে কেস করতেন না?

দ্যাখো দাদা, পুলিশের কোনো রাজ্যভেদ নেই। রক্ষকরা সর্বত্রই ভক্ষক। তাঁরাও একশোবার করতেন। আননোন কেন আনসীন ট্রাক-এর বিরুদ্ধেও করতেন। আর টাকাটা নেওয়ার পরেও সম্ভবত কাজটা ঠিকমতো করতেন না। পশ্চিমবঙ্গ, থুড়ি বাংলার হ্যাংলাদের সঙ্গে অন্য সব জায়গার ক্যাংলাদের এইটুকুই তফাৎ। এই হচ্ছে বাঙালিদের বিশেষ ঐতিহ্য।

বল কী তুমি। বুদ্ধদেববাবু তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট সৎ।

মন্ত্রী সৎ হলেই যে শান্ত্রীদেরও সৎ হতে হবে এ কথা কোন শাস্ত্রে লিখেছে? তোমার বয়স হয়েছে খোকাবাবু, বিদ্যে হয়নি কিসসু। দাও, সিগারেটের প্যাকেটটা দাও। দেখি, কটা খেলে?

একটা।

দু'ঘণ্টাতে একটা! তুমি একটি রিয়্যাল খোকাবাবু। সত্যি।

তারপর বলল, তোমার জন্যে ঝাঁঝি খুবই উদ্বিগ্ন। বারবার তোমার কথাই জিগ্গেস করছে। তুমি চা খেলে না, আমরা খেলাম স্বার্থপরের মতো, এই সব আর কী!

তাই?

হ্যাঁ। তবে অ্যাকসিলারেটরে আস্তে চাপ দিও।

মানে?

মানে, হারিতের কাছে পিস্তল আছে। আর ও আর্ট-কেলচার বিশেষ বোঝে না। আফটার অল, ঝাঁঝি ওর বিয়ে-করা বউ তো! ছেলের বিয়েতে দেড় হাজার লোক খাইয়েছিলেন ওর বাবা।

ওর বাবা কি করতেন? তিনিও চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট?

না। তিনি হাওড়ার নামকরা ঢালাইওয়ালা ছিলেন। বড় এক্সপোর্টার।

বিরাট প্যান্ডেল হয়েছিল সিংহী প্যালেস-এ।

কীসের জন্যে?

আরে হারিতের বিয়ের সময়ে, থুরি বৌভাতের সময়ে।

বলেই বলল, তবে আমার একটা নিজস্ব থিওরী আছে। সেটার জন্যেই আমি ও পথে হাঁটিনি।

সেটা কি?

যার বিয়ের প্যান্ডেলে যত বাঁশ লাগে সেই সব বাঁশের টোটাল বাঁশ-লেন্থ যে পুরুষের সব্বোবাঁশ হলো, তারই পেছনে সারা জীবন ধরে একটু একটু করে যায়।

তুমি একটা যাচ্ছেতাই।

গামহার বলল। রীতিমতো শীৎকার তুলে।

চিকু বলল, হায় কুমুদিনী। তুমি আমার হাজার টাকা গচ্চাটা বাঁচাতে পারলে না। যাই বল আর তাই বল গামহারদা, তোমার ওই প্রেমটা টোটালি আনপ্রডাকটিভ। না করতে পারলে প্রেগন্যান্ট, না বাঁচাতে পারলে আমাদের আননোন-ট্রাকের এগেইনস্টে কেস-এর হাত থেকে। দেখি, তোমার নতুন প্রেমে কতদূর এগোতে পার।

গামহার মনে মনে বলল, ক্ষমা করে দাও, ক্ষমা করে দাও এই সব ক্রুড, ম্যাটার-অফ-ফ্যাক্ট আজকালকার ছোঁড়াদের। এরা কী বুঝবে তোমার মতো একজন আর্টিস্টের মানসিকতা! ক্ষমা করে দাও গামহার।

চিকু, গামহার, জারুল এবং ঝাঁঝিরা রাস্তাতে একটা ধাবাতে খাওয়ার পাট চুকিয়ে যখন যোশীপুর থেকে বেরোল তার একটু পরই বড় রাস্তার উপরেই ঝড়ের গতিতে একটি বেগুনি মেটালিক রঙের ফিয়াট "উনো" উল্টোদিক থেকে এসে জোরে ব্রেক করে পথের ডানদিকে দাঁড়াল। একটি একগাদা - ফর্সা যুবক, লম্বা, চোখে র‍্যোবান-এর সানগ্লাস, ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে ডান হাতের ভঙ্গি দিয়ে কথা বলল, মুখে কিছু না বলে। ভঙ্গি বলল, ঠিকঠাক সব?

চিকু ড্রাইভিং সিট-এর কাঁচ নামিয়ে চেঁচিয়ে বলল, ভাল আছে। বেঁচে গেছে।

নবাগন্তুকের বডি-ল্যাঙ্গোয়েজ তবু উদ্বেগের সঙ্গে বলল, তাই কি?

চিকু আবারও চেঁচিয়ে বলল হারিত থানাতে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। ট্রাকওয়ালাও ট্রাক নিয়ে। তোমার ড্রাইভার আর তোমরা দু'জনে ধাবায় খেয়ে নিয়ে গাড়িটাকে ক্রেন দিয়ে ট্রাকে তুলে সেই ট্রাকে ড্রাইভারকে বসিয়ে, কলকাতায় পাঠিয়ে দিও ট্রাককে। তারপর তোমরা দু'জন চাহালা চলে এসো। বৃন্দাবন গেটে আমি বলে যাব।

আগন্তুকের ঊর্ধ্বাঙ্গে একটি 'মড' জামা। হয়ত 'উইকএন্ডার' থেকে কেনা। তবে জামার হাতাটা মেয়েদের মেগিয়া-স্লিপ ব্লাউজের মতো। বিশেষত্ব এই যে, হাতাটা এতই ঢোলা যে, হাত তুললে বগল দেখা যায়। মেয়েদের ওই দৃশ্য কেমন লাগে তা বলতে পারবে না, কিন্তু গামহারের অন্য কোনো পুরুষের লোমওয়ালা বগল দেখতে আদৌ ইচ্ছা করে না।

নবাগন্তুকের শরীরের ভাষা দেখে মনে হল যে, সে একবার এই গাড়ির কাছে আসতে খুবই ইচ্ছুক। খুবই উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল তাকে। সে যেন চিকুর মুখের কথাতে ভরসা করতে পারছিল না। ঝাঁঝি যে সত্যিই অক্ষত আছে এই সত্য সে নিজের চোখেই দেখতে চায়।

চিকু তার উৎসাহে জল ঢেলে দিয়ে আর কথা না বাড়িয়ে বলল, আমি এগোলাম। তোমরা এসো।

গাড়ির রঙিন কাঁচের ভিতর থেকে বাইরেটা দেখা যায় কিন্তু বাইরে থেকে ভিতরে কিছুই দেখা যায় না। ওরা পেছনের কাঁচ নামাতে পারত। নামালেই নবাগন্তুক ঝাঁঝিকে দেখে তার তৃষা নিবারণ করতে পারত। কিন্তু ডানদিকে বসা ঝাঁঝি কাঁচটা একটুও নামালো না। কেন? কে জানে! হয়ত গাড়ি গরম হয়ে যাবে বলে।

অথবা নবাগন্তুক গরম হয়ে যাবে বলে।

প্রথম দর্শনেই গামহার-এর মনে হলো যে, নবাগন্তুক ঝাঁঝিকে ভালবাসে। হয়ত ঝাঁঝিও তাকে ভালবাসে। মেয়েরা যাদের ভালবাসে তাদের সঙ্গে বেশি দুর্ব্যবহার করে। সেই দুর্ব্যবহারে পুরুষদের ভালবাসা আরও তীব্র হয়। এসবই বিধাতার চক্রান্ত।

গামহার মনে মনে নিজেকে বলল, ছবিটা নির্বিঘ্নে আঁকা যাবে না। ঝাঁঝির স্বপ্নে বিভোর হয়েছিল ও। মাঝে মাঝেই গাড়ির রিয়ার-ভিউ মিরারে এক এক ঝলক দেখছিল। একা হারিতই যথেষ্ট ছিল পথের কাঁটা হিসেবে, এ আবার কোন উটকো আপদ এসে জুটল! ওর কপালটাই এরকম। গামহারের পাশের বাড়ির ন্যাপাদা জ্যোতিষচর্চা করেন। তিনি বলেছিলেন, একটা গাঢ় নীল-রঙা রুমাল সবসময়ে পকেটে রাখতে যখনই বাইরে বেরোবে। তাড়াতাড়িতে গাঢ় নীল-রঙা রুমাল যোগাড় করতে পারেনি। আগে জানত থোড়াই যে ভাগ্যর সাহায্য এমন দরকার পড়বে। কিছুদিন হলো গামহার-এর একটা ইনটিউশন হচ্ছে। ও নিজের ভাগ্য গুণতে না পারলেও জ্যোতিষীরই মতো মুখ দেখে বা শরীবের ভাষা দেখেই অনেক কিছু বলে দিতে পারে, যাঁর নিরানব্বই ভাগই সত্যর সঙ্গে মিলে যায়।

কখনও কখনও আজকাল ও ভাবে ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে ফেস-রিডিংকেই পেশা করবে। ঝাঁঝিকে স্টাডি করে মনে হচ্ছিল কেসটা পাকলেও পাকতে পারে।

চিকু গাড়িটা এগোতেই গামহার চিকুকে বলল, এই তোমার নবেন্দু!

হ্যাঁ।

কী করে?

ওদের মস্ত কোম্পানি।

কিসের ব্যবসা?

স্টিভেডরিং অ্যান্ড শিপ-চ্যান্ডলারিং। শিপ-রিপেয়ারিং। এন সি বোস অ্যান্ড কোম্পানি। খুব নাম করা কোম্পানি। তিন পুরুষের ব্যবসা। কোটি কোটি টাকার মালিক ওরা।

চিকু বলল।

গামহার-এর মনে হলো যে, সেটা বোঝা গেছিল। কারণ পিতৃপুরুষের পয়সাতে যারা বড়লোক হয় তাদের মধ্যে একটা বোকা-বোকা ছাপ থাকে।

বাঙালির ব্যবসা তো তিন পুরুষেই উঠে যায়। এই শেষ পুরুষ।

জারুল বলল।

কাজ দেখলে তো ব্যবসা থাকবে। কর্মচারীরা লুটে-পুটে খাচ্ছে।

ঝাঁঝি বলল, পেছন থেকে।

তো, ও করে কি?

গামহার জিগ্গেস করল।

চিকুর কথার তোড় থামলে আবার ও বলল, নবেন্দু তাহলে করে কি? কাজ দেখে না তো!

তারপর বলল, আচ্ছা তোমাদের পরিমণ্ডলে কোটিপতি নয়, এমন কেউই কি নেই? তবে আমাকে বেঁধে আনলে কেন? তোমাদের পেছনে গাধা-বোট এর মতন। আমি কি মানাই এখানে?

ওরা হেসে উঠল জোরে।

চিকু বলল, তোমার কপাল এখন খুলতে শুরু করেছে। এখন তো আর্টিস্টদেরই দিন। তুমি যে মাটিজ, ভ্যান গঁ, বা গঁগা হয়ে যাবে না, তা কে বলতে পারে।

ভ্যান গঁ'র জীবদ্দশাতে তাঁর তো একটি মাত্র ছবি বিক্রি হয়েছিল।

তোমার অনেক হবে। তুমিও কোটিপতি হলে বলে।

ও বুদ্ধিজীবী।

কে?

কে আবার? নবেন্দু।

মানে?

ও কবি। বলে, বুদ্ধিজীবী, আসলে দুর্বুদ্ধিজীবী।

তাই? নিজের নামেই লেখে, না কোনও ছদ্মনাম আছে?

না, না নিজের নামেই লেখে।

নবেন্দু রায়ের কবিতা পড়েননি আপনি? নানা পত্রপত্রিকাতেও বেরোয়।

জারুল বলল।

ঝাঁঝি বলল, নিজের নামেই বেরোয় তবে নিজেই লেখে কি না তা বলতে পারব না।

মানে?

মানে, পয়সার তো অভাব নেই। কোনও উপোসী-কবিকে মাইনে করে রেখেছে হয়তো। সে লিখে দেয় আর ওর নামে ছাপা হয়।

এমনও হয় নাকি?

এমনই তো বেশি হচ্ছে আজকাল।

ঝাঁঝি বলল।

ওর তো চার-পাঁচটা বইও আছে।

চিকু বলল।

হ্যাঁ। নিজের পয়সাতে ছাপালে বই বের করতে আর কী লাগে?

কী কী নাম বইয়ের?

জারুল জিগ্গেস করল।

সব বইয়ের নাম বলতে পারব না। শেষেরটা জানি।

ঝাঁঝি ঝাঁঝের সঙ্গে বলল।

তারপর বলল, সেটা আমাকেই উৎসর্গ করাতো, তাই জানি।

গামহার না-বলেই নিজেকে বলল, ধরেছি ঠিকই!

তাই? বাঃ সত্যি ঝাঁঝি! তুমি কী ভাগ্যবতী। তার মানে, কবির প্রেরণা তুমি। হাউ ফরচুনেট। ভাবা যায় না। আমাকে যদি কোনও কবি-সাহিত্যিক একটি বই উৎসর্গ করতেন তাহলে কী না করতে পারতাম আমি তার জন্যে।

জারুল বলল। অগ্রিম কিছু করো না কেন, তাহলে এই কবিই পরের বই তোমাকেই উৎসর্গ করতেন।

তুমিও কী অগ্রিম কিছু করেছিলে কি?

বাজে কথা বোলো না তো।

বিরক্তির সঙ্গে বলল ঝাঁঝি।

তারপর বলল, কবির প্রেরণা না কপির প্রেরণা তা বলতে পারব না। তাছাড়া, প্রেরণা আদৌ নই, কিছু যদি আদৌ হই তো আমি তার যন্ত্রণা।

যন্ত্রণা। ওমা! কেন?

কেন-টেন জানি না, যন্ত্রণা ছাড়া অমন মাখন-বাবুকে আর কীই বা দেওয়ার আছে।

ছিঃ। ছিঃ। এমন করে কি কেউ ভালবাসার পুরস্কার দেয়।

চিকু বলল।

বইটির নাম কি?

গামহার জিগ্গেস করল।

'তুমি বড় দাগা দিলে'।

সকলে একসঙ্গে হেসে উঠল ওরা। একমাত্র গামহার ছাড়া।

ও দাগা পাওয়ার জন্যে মনে মনে তৈরি হচ্ছিল।

ঈসস্। বেচারী। কষ্ট হচ্ছে। কী নিষ্ঠুর গো তুমি ঝাঁঝি। এতো কষ্টও কি কেউ দেয় কাউকে?

জারুল বলল।

তাতেও যদি জ্ঞানচক্ষু না খোলে তো আমি কী করতে পারি!

একবার ভেবে দেখো। আমি যখন ফোন করি নবেন্দুকে ও তখন ঘুমিয়েছিল। তোমাদের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে শুনে পড়ি-কী-মরি করে নেক-ব্রেক স্পিডে নিজে গাড়ি চালিয়ে একটার মধ্যে যোশীপুর পৌঁছে গেল। সকালে এক কাপ চাও খেয়েছে কি না সন্দেহ। ভালবাসার টান না থাকলে কেউ এমন করে ছুটে আসতে পারে! একটু ভালবাসা তো ফিরিয়েও দিতে পারো! একটুখানি!

চিকু বলল।

তা পারি। কিন্তু বাড়িতে তার খাণ্ডার বউ। সেও কম বড়লোকের মেয়ে নয়। পাছাল না কী গাছাল পরিবারের। হাওড়ার বিরাট বড়লোক তারা। আর এদিকে আমার ঘরের চাড্ডাকান্টেন্ট—শিপ-রিপেয়ারারকে ভালবাসা ফেরত দিতে গেলে, তারা দুজনে যখন আমাকে ধরেই রিপেয়ার করে দেবে তখন আমাকে দেখতে আসবে কে!

আহা! ভালবাসলে একটু দুঃখ সইতেই হয়।

কী বিপদ রে বাবা! ভাল তো আমি বাসিনি। যে বেসেছে, সেই দুঃখটা সহ্য করুক।

ঝাঁঝি বলল।

এসব বড় কমপ্লিকেডেট ব্যাপার-স্যাপার। যার ফোঁড়া সেই বোঝে।

চিকু বলল।

ইয়েস স্যার। যার ফোঁড়া সেই বোঝে।

ঝাঁঝি বলল।

ঝাঁঝি যে এত কথা বলে, কাল তা বোঝেনি গামহার। কথা না বললেও ওর একরকম আকর্ষণ, কথা বললেও অন্যরকম আকর্ষণ।

এমন সময়ে ধ্বপ করে একটা পাথরে গাড়ির আন্ডারক্যারেজটা ধাক্কা খেল।

জারুল বলল, পরের ফোঁড়ার চিন্তা রেখে এখন ভাল করে গাড়িটা চালাও। গাড়ির ফোঁড়া হলে এখানে সেঁক দেওয়ার লোক পাবে না।

সেই যে গতকাল বিকেল তিনটেতে বেরিয়েছিল কলকাতা থেকে তারপরে একটুও বিশ্রাম পায়নি শরীর। চাহালাতে পৌঁছেই বাথরুমে গেছিল গামহার এবং চানও করেছিল। তারপর এসে, তার জন্যে যে আলাদা ছোট ঘরটি বরাদ্দ করেছিল চিকু, সেই ঘরে এসে শুয়ে পড়েছিল। সারা রাতই তো ঘুম নেই। ঝাঁঝিদের অ্যাকসিডেন্ট। তার উপরে

'আননোন-ট্রাক'-এর বিরুদ্ধে পুলিশ কেস হয় হয় তার ধকল! কখন যে গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছিল, জানেও না।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন রাত নেমে গেছে বেশ কিছুক্ষণ। চাঁদ উঠেছে। বেশ একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। বাইরের ইউক্যালিপটাস গাছগুলোর সুগোল মসৃণ সাদা কাণ্ডগুলিকে মেমসাহেবদের ওয়াক্সিং-করা উরুর মতো দেখাচ্ছে আর হাওয়ার দোলায় হাতছানি-দেওয়া শাখা-প্রশাখাগুলিকে তাদের বাহুরই মতো। অগণিত, আন্দোলিত, মসৃণ, রূপোলি বাহুর বাহুমূল থেকে গন্ধ ছুটছে হাওয়ায় ভেসে চাঁদের দিকে। মিশ্র বনগন্ধ মুখে-করে হাওয়াটা ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে, বনময় শুকনো পাতা উড়িয়ে-তাড়িয়ে রিট্রিভার কুকুরের মতন।

ওরা বাইরে চেয়ার পেতে বসে গল্প করছিল। নবেন্দুরা এসে গেছে। অনেকক্ষণই এসেছে মনে হয়। কারণ, ওদের কথা-বার্তাতে মনে হলো ওদের চানও হয়ে গেছে। দু'কাপ চাও খাওয়া হয়ে গেছে।

ঝাঁঝি বলল, গামহারদা উঠলে চা করে দিতে হবে।

জারুল বলল, বাসনপত্র তো সব এখানেই আছে। চৌকিদারকে শুধু বলতে হবে গরম জলটা নিয়ে আসতে। গামহারদা হাফ-অ্যান্ড-হাফ বিস্কুট খান তো? চিকু?

কে জানে রে বাবা! হাফ-অ্যান্ড-হাফ খায়? না, ফুল-অ্যান্ড-ফুল খায়। এই জঙ্গলে যা দেবে, তাই খাবে। গামহারদা কি অবুঝ? কিছু অবান্তর চিন্তা করাটা তোমাদের স্বভাব!

আমাদের মানে?

মানে, মেয়েদের।

বলতে পারতে 'তোমার'। জাত তুলে কথা বলবে না। জেনারালাইজ করবে না।

বগল-কাট্টি জামা পরা নবেন্দু বলল, সেটা ঠিকই?

গলার স্বরটা কিন্তু ভালই ছেলেটির। এই প্রথমবার শুনল গামহার। এতক্ষণে সেই বগল-কাট্টি জামাটা ছেড়েছে নিশ্চয়ই।

শুয়ে শুয়ে ভাবল, গামহার।

রাত্রি জাগরণের পরে বাথরুম এবং চান এবং তারপরে ঘুম এবং পরে বিছানাতে শায়ীন থেকেই এই সিমলিপালের জঙ্গলের চাঁদনি রাতের অভিঘাতে একটা ঘোরের মত লাগছে গামহার-এর। ওর ঘুম যে ভেঙেছে তা ও জানাতে চায় না ওদের কারোকেই এখুনি। শুয়ে শুয়ে এই বাসন্তী বনের রাতে ওদের কথা শুনতে ভাল লাগছে। যেন, চুরি করেই শুনছে কথা। ইভস-ড্রপার ও ভয়্যারদের মধ্যে তফাত নেই বিশেষ। দু'জনের চুরি-করা আনন্দই সমান। একজন শ্রবণে আনন্দিত অন্যজন নয়নে। এবং তারা হয়ত এই সমাজ-অস্বীকৃত অপরাধের জন্যে সমান ধিকৃতও। যা কিছুই চুরি করে করা যায়, চুরি করে কারো চান দেখা, চুরি করে কারো গান শোনা, চুরি করে কারোকে চুমু খাওয়া এসবেরই মধ্যে এক সমাজ-অস্বীকৃত আনন্দ থাকে। সেই অস্বীকারই, সেই চোখ-রাঙানিই, সেই আনন্দকে এক অন্য মাত্রা দেয়। অপরাধী মাত্রই সেই কথা জানে।

কে কী পারফ্যুম মেখেছে, জানে না গামহার। মেয়েরা সাবান দিয়ে গা ধুয়ে পাট-ভাঙা শাড়ি পরে, সামান্য প্রসাধন আর সুগন্ধি মেখে এলেই কীরকম এক গা-শিরশির ভাল লাগাতে ভরে যায় পরিবেশ, আর এইরকম জায়গাতে তো যায়ই! সেই সুগন্ধর সঙ্গে প্রকৃতির গায়ের সব সুগন্ধও বুঝি মাখামাখি হয়ে যায়। পায়ের কাছের জানালা দিয়ে যতটুকু

দেখা যায়, তাই অনেক। এখন জানালার নিচেই চেয়ার পেতে বসে-থাকা ওদের কথা শুনবে গামহার আর দু'নাক ভরে গন্ধ নেবে শুধু।

জারুল বলল, হরিমতি কেমন আছে নবেন্দুদা?

সে আছে।

গামহার ভাবল, হরিমতিটা কে? বাড়ির ঝি না কি? নবেন্দু কি তাহলে ঝৈন? স্ত্রীতে প্রবল আসক্ত যে সে স্ত্রৈণ হলে, ঝিতে প্রবল আসক্ত যে, সে ঝৈন কেন হবে না?

গামহার নিজের সঙ্গে নিঃশব্দে কথা বলল।

আছে মানে?

আছে, মানে আছে। তার অরুণ-বরুণ-কিরণমালা নিয়ে এবং চন্দনা পাখি এবং রান্নাঘরের তদারকি, তামা-পেতল পালিশ নিয়ে বেশ আছে।

একটু চুপ করে থেকে নবেন্দু বলল, তার কোলে আরেকটি আসছে।

এমন নিরাসক্ত 'কুড নট কেয়ারলেস' গলাতে কথাটা বলল নবেন্দু যে, শ্রোতাদের মনে হতেই পারে যে, হরিমতি অর্থাৎ তার বউকে অন্য কোনও পুরুষেই গর্ভবতী করেছে।

ঘাবড়ে গেল গামহার। এ তো সাংঘাতিক জিনিস। তার ছবিটা আর শেষ হবে না। ঝাঁঝির ছবিটা ওই উপদ্রুত পটভূমিতে সম্ভবত আর আঁকা হয়ে উঠবে না। 'আননোন ট্রাক' ড্রাইভারটার উপরে তার অত্যন্তই রাগ হচ্ছে এখন। ব্যাটা গুঁতোবার আর সময় পেলে না যেন।

তাই?

জারুল বলল, উচ্ছ্বসিত গলায় নবেন্দুকে।

চিকু আর হারিত বলল, কনগ্রাচুলেশানস।

কবে আসছে সে?

কে?

চমকে উঠে বলল, নবেন্দু।

আঃ। কী ন্যাকামিই যে করতে পারো। আরে, নবাগন্তুক।

আবারও ঘাবড়ে গেল গামহার। বগল-কাট্টি নবাগন্তুককে নিয়েই সে এতক্ষণ মনে মনে ব্যতিব্যস্ত ছিল তার মধ্যে আবার অন্য নবাগন্তুক। কী কেলো!

ও।

বলল, নবেন্দু। অনেক অঙ্ক কষতে হবে।

তারপর বলল, কিরণমালার বয়স এখন যদি দেড় মাস হয়। তাহলে দেড় মাস প্লাস এক মাস প্লাস দশ মাস দশ দিন। হিসেব করে নাও কবে আসতে পারে। পাঁচ দশ দিন আগেও আসতে পারে। সিজারিয়ান হবে তো!

যা বাব্বা! তুমি তো জাব্বারের ক্লাব-এ নাম লেখালে দেখছি।

হারিত বলল।

মানে?

কোন জাব্বার?

আরে আমাদের গ্রেট আঁতেল আবদুল জাব্বার।

জাব্বারের সঙ্গে আমার কি?

মানে?

বাঃ। ওঁর স্ত্রীর পেটও কখনই খালি থাকে না। শ্বশুরের অগাধ সম্পত্তি তো! ওর শালা ইমতিয়াজের সঙ্গে কমপিটিশনে নেমেছে জাব্বার, কে বেশি ছেলেমেয়ের বাবা হতে পারে। শ্বশুর প্রত্যেক পোতা-পুতিকে নাকি দশ লাখ করে দিয়ে যাবেন।

হায়! হায়! গুগনে গুরজে মেগ ঘন বুরষা, কূলে একা বইস্যা আছি, নাহি ভুরসা। তুমিও কি এই ক্লাবের মেম্বার হতে চাও নাকি?

চিকু বলল।

ঝাঁঝি বলল, পার সন্তানে দশ লাখ পেলে কারো সন্তানের জননী হতাম। মন্দ কী!

তুমি কি বাঙাল না কি?

নবেন্দু জিগ্গেস করল।

এখন তো বাঙাল-ঘটি সর্বত্রই হরে-দরে একই হয়ে গেছে। বাঙালি, বাংলাদেশী আর বঙ্গস। আমার আদিবাড়ি ফরিদপুরে। বাড়িতে জ্যাঠা আর বাবা এখনও ওই ভাষাতে কথা বলেন। আমার মামাবাড়িও ঢাকার বিক্রমপুরে। মা ও দিদিমাও ওই ভাষায় কথা বলেন। লোকে বলে না, মাদার-টাঙ। তাই বলতে পারি। তবে, না-বলাই উচিত।

কেন? না বলাই উচিত কেন?

বাংলাদেশীরাই তো আর তাদের লিখ্য ভাষাতে ওই ভাষা ব্যবহার করেন না। কথ্য ভাষাতেও পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষা, এমনকি কল্লুম-খেলুম পর্যন্ত ব্যবহার করেন। জানি না, ভাষার জন্যে যাঁরা এতো করলেন, তাঁদের এব্যাপারে এমন হীনমন্যতা কেন? তা তাঁরাই যদি ওই মিষ্টি ভাষাকে ফেলে দ্যান, আমাদের দরকার কি বিজাতীয় ভাষা ব্যবহার করে! আমার পিতৃকুল মাতৃকুল সকলেই তো উদ্বাস্তু। কোনও মধুর স্মৃতি নিয়ে তো তাঁরা ভিটে-মাটি, জমি-জিরেত, মাঠ-পুকুর, হরিসভা, লেখার টেবল, পিয়ানো, সরোদ, কুলদেবতা সব একবস্ত্রে ছেড়ে আসেননি! যারা পরম অসম্মানে একদিন আমাদের উৎখাত করেছিল তাদের প্রতি ভালবাসা রাজনীতিকদের নিজ স্বার্থর কারণে থাকতে পারে নানা কারণে আমাদের তো থাকার কথা নয়। তবু থেকে গেছে কিছু ভালবাসা, নস্টালজিয়া। যত তাড়াতাড়ি তা মুছে ফেলা যায়, ততই ভাল।

বাবাঃ! হচ্ছিল গুগনে গুরজে মেগ ঘন বরষা'র কথা আর তুমি তো ছোটখাট বক্তৃতাই দিয়ে দিলে।

চিকু বলল।

জারুল বলল, তুমি বুঝবে কি মিস্টার চিকু চ্যাটার্জি। উদ্বাস্তু হলে জানতে। হঠাৎই সব শিকড় কেটে দিয়ে, নাভিমূল-এর সঙ্গে নাড়ি থেকে বিযুক্ত হতে কেমন যে লাগে তা যারা নাড়ি ছিঁড়েছে অসহায় নিরুপায়তায় শুধুমাত্র তারাই জানে। আমরা অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে জানিনি। কিন্তু মা দিদিমা, জ্যাঠা-দাদুরা জানেন। শরীরের ক্ষত হয়ত শুকিয়েছে, এখনও শুকোয়নি তাঁদের হৃদয়ের ক্ষত। শুকোবেও না, যতদিন বাঁচেন। সে কথা আমরাই বা ভুলি কী করে বল?

সকলে চুপ করে রইল অনেকক্ষণ।

এব্যারে কিন্তু গামহারদাকে ওঠাও। রাতের রান্না-বান্নার কিছু একটা করতে হবে তো। গামহারদা কি খাবেন?

জারুল বলল।

গামহারদার খাওয়ার ব্যাপারে কোনও ঝামেলা নেই। মানে, নেড়ি-কুত্তার মতো আর কী! গামহারদাকে একবার চাকদাতে নিয়ে গেছিলাম। তাই জানি। যা দেবে তাই চেটেপুটে তৃপ্তিভরে খাবে। বাইরে তো এমন সঙ্গীই দরকার।

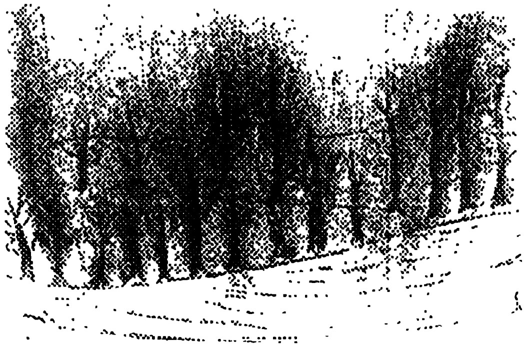
নেড়ি-কুত্তার সঙ্গে একজন নির্বিরোধী অন্তর্মুখী ভদ্রলোকের তুলনাটা কি ভাল হলো!

কেন? নেড়ি-কুত্তা খারাপ না কি? কোন দিক দিয়ে খারাপ। তোমাদের এইসব ইডিয়টিক ইডিওসিনক্র্যাসি যত তাড়াতাড়ি ত্যাগ করবে, ততই মঙ্গল।

তারপর বলল, এ যাত্রা জঙ্গল দেখার শখ মিটিয়ে দিতে হবে গামহারদার। বুঝেছ জারুল।

হুঁ।

জারুল বলল।



গত রাতে মুরগীর পাতলা ঝোল আর ভাত রেঁধেছিল জারুল আর ঝাঁঝি মিলে। খুব সুন্দর স্বাদ হয়েছিল। 'Knor'-এর টোমাটো স্যুপও ছিল। আর যোশীপুর থেকে আনা পোড়পিঠাও। বারোটা মুরগীও নিয়ে এসেছিল নবেন্দু যোশীপুর থেকেই। তারই থেকে দুটো গেছে কাল রাতে, দশটা রয়েছে। হারাধনের দশটা ছেলে। ডিম আছে পর্যাপ্ত, নানা তরি-তরকারি। চাল-ডাল-তেল-নুন-মশলা আর নির্জৌষধিও যথেষ্ট আছে, অ্যাকসিডেন্টে কিছু স্টক নষ্ট হওয়া সত্ত্বেও। রাম-এর ভাঙা বোতল থেকে গড়ানো রামের গন্ধ পেয়েই পুলিশ অফিসার চিকুকে জিজ্ঞেস করেছিল : 'সে বাবু মদ্দ খাইছন্তি কি?'

অনেকক্ষণ বাইরে বসে সকলেই রাম খেতে খেতে গল্প করেছে ওরা। গামহারও উঠে ওদের সঙ্গে বসেছিল মাথায় টুপি দিয়ে টাকে ঠাণ্ডা লাগে বলে।

চিকু বলেছিল, তুমি এই চাহালা বাংলোর ইউক্যালিপটাস বনের চাঁদনী রাতের একটা ছবি আঁকতে পারো গামহারদা?

পারি। তবে আমি রিপ্রেসেন্টেশানাল বা ফিগারেটিভ 'আর্টিস্ট' তো নই। ফোটোগ্রাফারও নই। আমি স্যুরিয়ালিস্ট আর্টিস্ট।

স্যুরিয়ালিস্ট শব্দটার মানে কি গামহারদা?

চিকু জিগ্গেস করেছিল।

এর মানে হলো, কী বলব, স্বপ্নময়। অবচেতনের দলিল এইসব ছবি। সালভাডর ডালি ছিলেন এই স্কুলের পথিকৃৎ। ফরাসী শব্দ 'স্যুর' (Sur) মানে হচ্ছে উপরে, দূরে। আর ইংরেজি রিয়্যালিজম্—এই দুইয়ের অভিঘাতে সৃষ্টি হয়েছে স্যুরিয়ালিজম-এর। যাঁরা এই স্কুলের আর্টিস্ট তাঁদেরই বলা হয় 'স্যুরিয়ালিস্ট'।

তাই? শব্দটা বহুদিন হলো পড়ছি, দেখছি। মানেটা জানতাম না।

আমি যা আঁকব, তা শেষ রাতের স্বপ্নে দেখা এই চাহালার চাঁদনী রাতের স্বপ্নরই মতো হবে। তা, বাস্তবের মতো হবে না অথচ বাস্তবের চেয়ে বেশি সুন্দরও হতে পারে। এই রাত আমার ছবিতে আভাসিতই থাকবে শুধু। স্বপ্নেরই মতো, বাস্তবের রূঢ়তা তাকে ছুঁতে পারবে না।

এই বাস্তব তো রূঢ় নয়।

তা ঠিক। রূঢ়তা শব্দটা এখানে আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করিনি আমি।

বাঃ। তাই এঁকো। চমৎকার। আমার স্টাডিতে টাঙিয়ে রাখব।

জারুল বলল, গামহারদা তোমাকে আমরা অরণ্যের সঙ্গে পরিচয় করাচ্ছি বলেই বলছি, বনে এসে কিন্তু আমরা এতো কথা বলি না। বনের কী বলার আছে তা শুনি।

গামহার লজ্জিত হয়ে বলল, সরি। আমি অনেক কথা বলে ফেললাম যে!

আরে, সেতো আজ আমরা সকলেই বলছি। আজ ঝাঁঝি আর হারিতের পুনর্জন্মটা সিলিব্রেট করছি বলেই তো এখানে আড্ডা বসিয়েছি। সত্যি! এখন বলতে দ্বিধা নেই যে, ওদের তালগোল পাকানো গাড়িটা দেখে ওরা কেউ আদৌ বেঁচে আছে একথা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। ওদের অক্ষত দেখে কী যে খুশি হয়েছিলাম কী বলব!

তোমরা অবশ্যই আনন্দিত হয়েছিলে তবে আমি বেঁচে যাওয়াতে দুঃখিতও কম মানুষ হয়নি। মরে গেলে, তারা হয়ত আনন্দের বন্যা বইয়ে দিত।

ঝাঁঝি বলল।

তারা কারা?

তারা তো অগণ্য। প্রথমেই ধরো না কেন আমার শ্বশুরবাড়ির সকলেই। আমার স্বামীও, যদি তিনি নিজে বেঁচে যেতেন।

কেন বাজে কথা বলে মেজাজ খারাপ করিয়ে দাও। এই বনবাদাড় আমার মোটে ভাল লাগে না। শুধু তোমারই জন্যে চিকুদের পিছু নিলাম। নইলে, গতকাল আমার তাস-এর আড্ডা ছিল রাতে, মহীনদের বাড়িতে। সঙ্গে স্কচ এবং বিরিয়ানি।

ঝাঁঝি চুপ করে রইল একটুক্ষণ। তারপরে বলল, তোমাকে তো জোর করি না। আমি জঙ্গল ভালবাসি তাই বারেবার আসতে চাই কিন্তু তুমি আসো কেন? আমি তো স্বচ্ছন্দে চিকুদের সঙ্গেই আসতে পারি। অথবা মনে করো, নবেন্দুর সঙ্গেও। তোমার কি আমাকে একা ছাড়তে পারার মতো সাহস আছে? তুমি তো আসো শুধু পাহারা দিতেই।

পাহারা! হাঃ। পাহারা দেয় মানুষ ধন-দৌলতকে। তোমাকে কী জন্যে পাহারা দিতে যাব? তুমি তো আমার লায়াবিলিটি। যাও না চলে তুমি, যার সঙ্গে খুশি।

তুমি কি সত্যিই খুশি হবে? যদি যাই?

খুউব। খুউবই খুশি হতাম। বেঁচে যেতাম।

তাই? এতজনের সামনে কথাটা বললে কিন্তু। মনে থাকে যেন।

তারপরে বলল, কারো সঙ্গে কেন? আমি একাই যেতে পারি।

যাবে তো! কিন্তু খাবেটা কি?

মাথা নিচু করে ঝাঁঝি বলেছিল, সে চিন্তা আমার।

গামহার-এর বুকটা ধড়াস-ধড়াস করছিল। ও নিঃশব্দে বলল, আমি খাওয়াব, আমি।

হারাবার ভয় যদি নাই-ই থাকে তবে পাহারা দাও কেন?

পাহারা দিয়ে বেড়াই শুধু পারিবারিক সম্মানের জন্যে। হারিত বাসুর বউ ভেগে গেছে বলবে পাড়ার লোকে, তাই!

তোমাদের পরিবারে তো ইসলামিক সংস্কৃতি। মেয়েরা তো সেখানে নিছকই বস্তু, পণ্য, ভোগ্যপণ্য! তাছাড়া, পাড়ার লোকই তোমার সব? তুমি তো আরেকজন চাড্ডাকান্টেন্ট মহীনের বাড়ি তাস খেলতে যেতে, আমি কী করতাম একা একা বাড়ি বসে? কী করি সন্ধের পর সন্ধে একা একা, কখনও কি ভেবেছ তুমি! আমার কি ছেলেমেয়েও আছে একজন? সঙ্গী হিসেবে?

হারিত রাগে ফেটে গিয়ে গলা চড়াল। চৌকিদারের কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে উঠলো।

হারিত বলল, তোমার মাথাটা পুরোপুরি বিগড়েছে সেই স্কাউন্ড্রেল লেখকের লেখা বইগুলো পড়ে। এবারে ফিরে গিয়ে আমি গুণ্ডা দিয়ে হারামীকে খুন করাব। 'হারামজাদ'-এর সীমা আছে একটা।

সে আবার কে? সে কোন লেখক?

নবেন্দুও উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করল।

কে আবার? বুদ্ধদেব গুহ।

হারামজাদা, চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট না ছাই! প্রফেশনে সাকসেসফুল হলে কি কেউ বনপ্রেমী হতে যায়? না নেকুপুষুমুনু প্রেমের গল্প লেখে। জ্বালিয়ে দিল হারামী! ঝাঁঝি তো সর্বক্ষণ তার বই মুখে করেই বসে থাকে।

চিকু পরিবেশ লঘু করার জন্যে বলেছিল, আহা। শোনো, শোনো ঝাঁঝি তোমার দুঃখ কি?

তারপর নবেন্দুর দিকে ফিরে বলল, এই নবেন্দু কিরণমালার পরে যে আসছে তাকে দিয়ে দাও তো ঝাঁঝিকে।

উরি বাবা। দশ লাখ কোথায় পাব আমি? খেটে-খাওয়া মুহুরী। ঝাঁঝির ভাষায়, চাড্ডাকান্টেন্ট।

সকলের সামনে দাম্পত্য-কলহ করে ফেলে লজ্জিত হারিত হেসে বলল।

ঝাঁঝি মুখ নিচু করে বসেছিল।

সত্যি হারিত! তুমি দিলে পুরো আনন্দটাই মাটি করে। এতো বাইরের লোকের সামনে কেউ স্ত্রীকে এমন বলে! জঙ্গলে আসতে তোমার ভাল লাগে না, না এলেই পারো। কিন্তু একী। জঙ্গলে তো আমি আর জারুল আসি নিয়মিত। স্বভাবটা জংলী হওয়ার কথা ছিল আমাদেরই! আর তুমি ভুপেন বোস অ্যাভিনিউতে থেকে এরকম জংলী হলে কী করে!

বলেই বলেছিল, গামহারদা! তুমি চুপ করে গেলে কেন?

আই অ্যাম সরী!

সে কি? তোমার কি দোষ?

না। আমি এলাম বলেই বোধহয় তোমাদের এই অশান্তি? আমি না এলেই বোধহয় ভাল করতাম।

ঝাঁঝি গামহারের মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল। বলল, আমার খুব লজ্জা করছে। ক্ষমা করবেন আমাকে গামহারদা।

কী যে বলো! কী যে বলো। আমি... ক্ষমা... কী যে বলো!

গামহার-এর বুকের মধ্যে খুব কষ্ট হচ্ছিল। এই ধরনের কষ্ট আগে ঠিক কখনও বোধ করেনি।



চাহালা থেকে জোরান্ডাতে রওনা হওয়ার জন্যে সকালে এক কাপ করে লিকার খেয়ে গাড়িতে ওঠবার সময়ে জারুলই বলেছিল, নবেন্দু, চলো তোমার গাড়িতে তোমার আর হারিতের সঙ্গে আমি যাই আর ঝাঁঝি যাক চিকু আর গামহারদার সঙ্গে। একঘেয়ে একটানা কারো সঙ্গই কি কারো ভাল লাগে! এই ভয়েই তো বিয়ে করব না কোনোদিনও আমি।

ঝাঁঝি একবার হারিতের দিকে তাকাল।

হারিত বলল, আর লোক দেখিও না, দয়া করে গিয়ে ওঠো ও গাড়িতে। এমনই ভাব করছ যেন আমার কথাতেই উঠছ আর বসছ। বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই আমার সারা শরীরে চিমটি কেটে কেটে কালশিরে ফেলে দিয়েছিলে তা মনে নেই। আর আমার বোকা মা বলতেন, বউ আমার ভারী লক্ষ্মী মেয়ে। মুখে রা'টি নেই। মা বলতেন, জানিস খোকা, আমি কিন্তু বাবা বিয়ের পরে পরে তোর বাবার সঙ্গে খুব ঝগড়া করতুম।

তারপর নবেন্দুর গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে বলল, মাকে আর কী বলব বলো? কেষ্টনগরে আমাদের চারমহলা বাড়িতে স্ত্রীকে তো আর শ্বশুর-শাশুড়ির পাশের ঘরে শুতে হতো না। মেয়ে মাত্রই গ্রেট অভিনেত্রী।

চিকু গাড়িটা স্টার্ট করার পরেই গামহার বলেছিল, কথাটা বোধহয় ঠিক নয়। মানে, হারিত বোধহয় ঠিক বলেনি। অধিকাংশ মেয়েরাই যুগের পর যুগ ধরে সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করে গেছে বলেই আমরা ধরেই নিয়েছি যে তারা অভিনেত্রী, তাদের মনের যথার্থভাব মুখে প্রকাশ করে না বা করতে পারে না বলেই যে তারা অভিনেত্রী এ কথা বলাটা বোধহয় ঠিক নয়।

চিকু বলল, ঠিকই বলেছ।

ঝাঁঝি চুপ করেই রইল। গামহার সাহস করে একবার সামনের সিটে বসে পেছন ফিরে ঝাঁঝির দিকে চাইল। দেখল, তার দুচোখ ভরা জল।

প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্যে চিকু বলল, কেমন লাগল বলো চাহালা, ঝাঁঝি?

তেমন করে দেখলাম আর কই? তবে ভালই লাগল। বাংলোর কম্পাউন্ডের চারপাশে অমন পরিখা কাটা কেন? গেট-এর সামনেও তো ব্রিজ। সেই ব্রিজের তক্তাগুলো আবার খুলে নিয়ে ভিতরে করে রাখল দেখলাম চৌকিদারেরা সন্ধের আগে আগেই, কেন?

হাতির জন্যে। সিমলিপাল হাতির জন্যে বিখ্যাত। এত হাতি না কি আফ্রিকার নানা গেম-পার্কেও দেখিনি। জারুল বলছিল। তাছাড়া, আমরা এসেছি ঠিক সময়েই। সিমলিপালে

শুনেছি এপ্রিল মাসেই হাতির সেনসাস হয়, মানে সংখ্যা গোনা হয়। বনবিভাগের আমলারা বলেন 'ম্যাঙ্গো সেনসাস'। এই সময়ে বুনো আম পাকে এখানে। হাতিরা গিরিখাত-এর দুর্ভেদ্য জঙ্গল ও উঁচু পাহাড়ের খাঁজ-খোঁজ, মালভূমি, উপত্যকা, সব ছেড়ে বেরিয়ে আসে আম খাওয়ার জন্যে। তখন গাছতলিতে তাদের গোনা সহজ হয়।

গামহার বলল, কদমতলিতে গোপী আর আমতলিতে হাতি।

চিকু হেসে উঠল জোরে। মনে হলো, ঝাঁঝিও হাসল। কিন্তু পেছন ফিরে মুখ ঘুরিয়ে ওকে দেখতে লজ্জা করল। ওর মনে পড়ে গেল যে, দিদিমার ঘরের দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো একটি বাক্য : 'লজ্জা, মান, ভয়, তিন থাকতে নয়"। কে বলেছিলেন বাক্যটি, কোন প্রসঙ্গে, তা জানে না গামহার। কেউ বলেও দেয়নি ওকে। কিন্তু বাক্যটি যে চিরকালীন সত্য এবং সাধু ও পকেটমার দু'জনের পক্ষেই সমান মান্য, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই ছিল না শিশু বয়সেও। কিন্তু এত দীর্ঘদিন পরে সেই বাক্যটি মনে পড়ে যাওয়াতে নিজের মনে মনে ও বল সঞ্চার করতে লাগল। ঝাঁঝিকে প্রথমবার দেখার পর থেকেই ওর প্রতি এক তীব্র শারীরিক আকর্ষণ বোধ করছে ও, যেমনটি এতো বয়স অবধি অন্য কোনও নারীর প্রতিই করেনি। মানুষের মন যে অসীম রহস্যময় তা ও জানে কিন্তু মানুষের শরীরের মধ্যেও যে এত খামখেয়ালিপনা, এত রহস্য আছে, তা ও আগে কখনও উপলব্ধি করেনি। মেয়েদের প্রতি পুরুষের আকর্ষণ থাকেই। তা স্বাভাবিক। কিন্তু কোনও বিশেষ নারীর শারীরিক সান্নিধ্যর জন্যে এমন উন্মাদনা যে জাগতে পারে এমন বেলাশেষে, তা অভাবনীয়ই ছিল।

পেছন থেকে ঝাঁঝি বলল, জোরান্ডা কত দূর?

বেশ অনেকখানি রাস্তা। প্রায় চল্লিশ কিমি মতো হবে চাহালা থেকে। জঙ্গুলে রাস্তা, কাঁচা, এবড়ো-খেবড়ো। তার ওপর চড়াই-উৎরাই তো আছেই। খুব উঁচু উঁচু পাহাড়ে উঠে আবার নামতে হবে আবারও অন্য অনেক পাহাড়ে উঠতে হবে। পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে যেতে হবে। তবে জঙ্গল যদি সুন্দর হয়, তবে রাস্তা ভাল কী মন্দ তাতে কিছুমাত্রই যায় আসে না। আর বছরের এই সময়টিতে আমাদের দেশের জঙ্গল যা সুন্দর তেমন তো অন্য কোনও সময়েই নয়!

কেন? এখন সবচেয়ে সুন্দর কেন?

এখন যে বসন্ত। মানুষ-মানুষী, পশু-পাখি, ফুল, প্রজাপতি সকলেরই ভালবাসার সময়। লাল, হলুদ, খয়েরী, কচি-কলাপাতা - সবুজ, হলুদ, কালো, পাটকিলে, মরচে-রঙা পেঁয়াজখসি, বেগুনি, ম্যাজেন্টা, মভ আরও কত রঙের দাঙ্গা এখন বনে বনে।

মহুয়া, আর করৌঞ্জ-এর গন্ধ। আরও কত ফুলের মিশ্র গন্ধ এখন হাওয়াতে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুকনো পাথর আর লালমাটির উপরে বিচিত্র বর্ণ শুকনো পাতাকে তাড়িয়ে, ঘূর্ণি উড়িয়ে হাওয়াটা দামাল রাখাল ছেলের মতো বনময় দাপাদাপি করে বেড়ায়। ভাল করে চেয়ে দেখো। এতদিন কালোকে শুধু কালো, লালকে শুধুই লাল, সবুজকে সবুজই, হলুদকে হলুদ বলেই জেনে এসেছ তো। আজ এই বসন্তবনে ভাল করে চেয়ে দেখো, দেখবে কুঁড়ির ভিতরে যেমন পরতের পর পরত ঘুমন্ত পাতা থাকে, স্তরে স্তরে, তেমনই সব রঙেরও অমন পরত হয়। একই রঙের কতরকম যে ছায়া (Shades)।

বলেই চিকু বলল, সরী গামহারদা। আমার পাশেই যে একজন আর্টিস্ট বসে আছেন আর আমি তারই সামনে রঙের ব্যাখ্যা করছি। আমার স্পর্ধা ক্ষমা করো।

আর্টিস্ট কি শুধু ছবি আঁকলেই হয় চিকু? তুমি যেভাবে বাসন্তী-বনের বর্ণনাটি অনভিজ্ঞ আমাদের দিলে, তেমন করে হয়ত অবন ঠাকুরই শুধু লিখতে পারতেন। যে কোনো সৃষ্টিশীলতার উৎসমুখে থাকে ভালবাসা। ক্রিয়েটিভিটির সবচেয়ে বড় উপাদান সেটি।

আর যন্ত্রণা?

ঝাঁঝি বলল।

ভালবাসার মধ্যে যন্ত্রণা তো থাকেই। অনেক সময় একের থেকে অন্যকে আলাদা করে চেনা পর্যন্ত যায় না।

আরও একটা ব্যাপার বোধহয় থাকে।

চিকু বলল।

কি?

আন্তরিকতা।

একশোবার ঠিক। ভণ্ড আর খল মানুষ, দুর্বুদ্ধিজীবী মানুষ কোনওদিনই প্রকৃত সৃষ্টিশীলতা যে কী, তা জানতেই পারে না।

বলেই বলল, ওই দেখো, বাঁদিকের উপত্যকাতে ওই গাছটা দেখো।

বাঃ। গামহার বলল।

কী অপূর্ব। দারুণ ফুলগুলো। মাছের রক্তর সঙ্গে জল মেশালে যেমন ফিকে লাল হয়, তেমন লাল, না? আর কী মসৃণ ফুলগুলো, কী ফিনফিনে!

ঝাঁঝি বলল।

চিকু হেসে বলল, ওগুলো ফুল নয়। নতুন পাতা এসেছে কুসুম গাছে।

ঝাঁঝি বলল, রবীন্দ্রনাথের গানে পেয়েছি 'কুসুমবনেতে' কথাটি। নিজে চোখে না দেখলে আজ সত্যিই কিছু হারাতাম। এতদিন ভাবতাম, কুসুমবন বুঝি ফুলের বন।

চিকু হাসছিল।

ওইদিকে দেখুন চিকুদা। কী আশ্চর্য নরম বেগুনী-রঙা ফুলগুলো। থোকা থোকা ফুটেছে।

ওগুলো জারুল। জোরান্ডাতে পৌঁছে জারুলকে বোলো যে, তুমি জারুল দেখেছো। সে অবশ্য চেনে ও গাছ।

বকুল-পারুল-শাল-পিয়ালের বন তো শুনেছি। কিন্তু জারুল তো শুনিনি!

এখন শোনো।

আচ্ছা! ডানদিকে ঐ বিরাট গাছটা দেখছ গামহারদা?

কোনটা? বাঁদিকে বসে তো ডানদিকে ভাল দেখা যায় না। ডানদিকে আবার পথ থেকেই ডাঙা উঁচু হয়ে উঠেছে।

হ্যাঁ, ওটা যে পাহাড়। এখান থেকে উঁচু হতে শুরু করেছে। দাঁড়াও। গাড়ি দাঁড় করাচ্ছি। ঐ গাছটা তোমার চেনা দরকার।

কেন? কেন? আমার চেনা দরকার কেন? আমার চিতা সাজাতে লাগবে না কি?

এমন সুন্দর সকালে বাজে কথা বলবেন না তো!

ঝাঁঝি ভর্ৎসনা করল পেছন থেকে।

তারপরে বলল, চিতা সাজানোর মধ্যে কোনও বাহাদুরি নেই। কাল শেষ-রাতে যা ঘটেছিল তাতে এতক্ষণে আমাদের আপনারা নিমতলাতে নিয়ে গিয়ে পৌঁছতেন।

গামহার বলল, অত সোজা নয়। এদেশে অ্যাকসিডেন্টে মরেও নিস্তার নেই।

চিকু অবাক হয়ে বলল, কেন এ কথা বলছ?

বলছিলাম, যে—পুলিশ 'আননোন ট্রাক'-এর এগেইনস্টে কেস করে, তারা দু-দুটো ডেডবডি পেলে তো আনন্দে নৃত্য করত।

এখানে পোস্ট-মর্টেম কোথায় হয়?

গামহার জিজ্ঞেস করল।

চিকু বলল, নো আইডিয়া। রাইরাংপুর ফুরে হবে।

সেইখানে লাশকাটা ঘরের সামনে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকতে হতো আমাদের। কতদিন, তা কে জানে! তোমরা তো মরে গিয়ে বেঁচে যেতে কিন্তু আমাদের মরার বাড়া করে রেখে যেতে।

সত্যি। থাক। থাক। ওসব বোলো না। পুলিশ কোথায় বিপদে সাহায্য করবে, বিপদগ্রস্তর সহায় হবে, তা নয়। শকুনের মতো লাশ-এর উপরে এসে পড়ে। সত্যি! স্বাধীনতার কী দশাই করলাম আমরা গত পঞ্চাশ বছরে!

বলতে বলতে নামল চিকু গাড়ি থেকে। গামহার আর ঝাঁঝিও নামল। দরজাটা ধাক্কা দিয়ে বন্ধ করতেই লাল মতো কী একটা জানোয়ার হিস্টিরিয়াগ্রস্ত অ্যালসেশিয়ান কুকুরের মতো ডাকতে ডাকতে নিস্তব্ধ বন-পাহাড়ের পিলে চমকে দিয়ে পাহাড়ে চড়ে গেল জোরে দৌড়তে দৌড়তে।

ঝাঁঝি ভয় পেয়ে, পাশে দাঁড়ানো গামহারের ডান বাহু চেপে ধরল।

ভাললাগায় মরে গেল গামহার। মুখে বলল, বাঘটাঘ না কি? লাল মতো দেখলাম।

গামহার-এর ইচ্ছে করছিল, ঝাঁঝি যেন তার হাতটি কখনওই আর না ছাড়ে।

না। বাঘ ডাকলে আমাকে চিনিয়ে দিতে হতো না তা বাঘের ডাক বলে। এটা একরকমের হরিণ!

এরকম করে ডাকে? বলো কি?

হ্যাঁ। কুকুরের মতো ডাকে বলেই এদের নাম বার্কিং-ডিয়ার। লালচে ঠিক নয়, মরচে-রঙা হয় দেখতে ওরা এখানে। লালই বটে তবে বিভিন্ন রাজ্যের জঙ্গলে এদের গায়ের লালের ছায়া আলাদা। ওরা বাঘ বা চিতা দেখলে, বা ভয় পেলে, এরকম করে ডাকতে ডাকতে দৌড়োয় যাতে বনের সব প্রাণী সাবধান হয়ে যেতে পারে।

বাঘ দেখলে আর কোনো প্রাণী ডাকে না?

ডাকে বইকি! ময়ূর ডাকে খুব জোরে জোরে আর বাঁদর অথবা হনুমান।

ওমা হনুমানও ডাকে নাকি?

সেকি? হনুমানের ডাক শোনোনি কখনও? বলো কি তুমি? তোমার মতো সুন্দরী যখন দু-বেণী ঝুলিয়ে বেথুন কলেজে পড়তে যেতে তখন রকে-বসা হনুমানেরা তোমাকে দেখে কখনও হুপ-হুপ-হাপ করেনি সেকথা বললেই আমি মানবো?

হেসে ফেলল ঝাঁঝি।

বলল, সত্যি! পারেনও আপনি।

চিকু বলল, এইবারে গামহারদা সামনের এই মহীরুহটির পা ছুঁয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করো।

সে কি? পা ছুঁয়ে কেন? পায়ের কাছে কোনো বনদেবী-টেবী আছেন না কি?

বনদেবী কী! উনি নিজেই তো দেব।

তাই?

নাম কি?

গামহার!

গামহার!

ইয়েস। এই গাছের নামেই তোমার নাম।

তারপরে বলল, তোমার নাম কে রেখেছিলেন?

দাদু। মানে, মায়ের বাবা।

তাঁর সঙ্গে কি বন-জঙ্গলের কোনো যোগ ছিল! বন্যপ্রাণী ভালবাসতেন?

দূর দূর। তিনি এ জি বেঙ্গলের অফিসার ছিলেন। সার্কাস দেখতে যেতেও ভয় পেতেন।

তবে এমন নাম রাখলেন কী করে তোমার?

মায়ের কাছে শুনেছিলাম, আমি তখন মায়ের পেটে, মাকে নিয়ে দাদু একদিন বটানিকাল গার্ডেনস-এ বেড়াতে গিয়ে একটি গাছের সামনে দাঁড়িয়ে, গাছটি খুব লম্বা ও ঋজু দেখে, মাকে বলেছিলেন, গাছটার নাম লিখে রাখ। ছেলে হলে, তার নাম দিবি এই গাছের নামে। মা, সেই নামটি সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন। আমার জন্মের দু'মাস আগেই দাদু গত হয়ে যাওয়াতে সেন্টিমেন্টাল কারণেই ওই নামই রেখেছিলেন মা। কিন্তু দাদু বেঁচে থাকলে হয়তো এ নিয়ে তক্‌রার এর সুযোগ ছিল। গাছের নামে নাম হলো কিন্তু গাছটি চেনার আর সুযোগ হয়নি। সত্যি! থ্যাংক উ। চিকু!

ফর হোয়াট? ইটস মাই প্লেজার।

ওরা গাড়িতে উঠতে যাবে এমন সময়ে ঝাঁঝি বলল, একটু দাঁড়ান গামহারদা। ইসস্, কী অপূর্ব দেখাচ্ছে নীচের ঘনবনাবৃত গভীর গিরিখাত। তার ওপাশে পাহাড় তারপরে আরও পাহাড়, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো। তুমি সত্যিই বলেছিলে রঙের দাঙ্গা লেগেছে যেন।

ক্যামেরা আনোনি?

নাঃ। কী হবে! চোখের মধ্যে সামনের এই ছবিকে জলছবির মতো সেঁটে নেব। ক্যামেরা কতটুকু ধরতে পারে? পারবে কি এই রূপ রস বর্ণ গন্ধর সমারোহকে কোনও ক্যামেরা বন্দী করতে!

চিকু বলল, গামহারদা, ভাল করে দেখে রাখো, গামহার গাছের পাতাগুলো। শাল গাছের চেয়ে বড় কিন্তু সেগুনের চেয়ে অনেক ছোট, হালকা হলদে-সবুজ। পাতা চিনে রাখলেই গাছ চিনতে পারবে আর গাছের গড়নকে। মানুষের বেলাতে যাকে বলে Torso।

গামহার অভিভূত হয়ে গেছিল। তাকিয়ে ছিল পাহাড়ের গা থেকে সোজা উঠে-যাওয়া মস্ত উঁচু ঝাঁকড়া গাছটার দিকে। ঝাঁঝি বলল, গীতায় আছে না? আত্মানং বিদ্ধি। নিজেকে জানো। আপনার সেই নিজেকে জানা হয়ে গেল একরকম। ভাবলেও অবাক লাগে যে, গামহার যাঁর নাম, তিনি গামহারকেই চিনতেন না।

গামহার আর চিকু হেসে উঠল ঝাঁঝির কথাতে।

বেশ বলেছ ঝাঁঝি।

বলল, গামহার।

বলেই ঝাঁঝির দিকে ভাল করে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। মেরুন জমির ওপর সাদা ফুটকি তোলা একটা মাহেশ্বরী পরেছে সে। সঙ্গে মেরুন ব্লাউজ। বাঙালি মেয়েদের তুলনাতে বেশ লম্বা ঝাঁঝি। সকালে তো এখনও চান করেনি। ভোরে উঠে, এলো খোঁপা করেছে একটা। কাল রাতে লণ্ঠনের আলোতে বুঝতে পারেনি, এই শাড়িটি পরেই শুয়েছিল হয়ত, অবশ্যই নাইটি পরে শোয়নি, কারণ, ওরা চারজনই একই ঘরে তিনটি আলাদা খাটে শুয়েছিল। পরপুরুষের সামনে নিশ্চয়ই নাইটি পরেনি। কিন্তু যা পরে আছে তাতেই তাকে অপরূপ সুন্দরী দেখাচ্ছে। তার পেছনে একটা শালগাছ। তাতে কচি-কলাপাতা রঙা নতুন পাতা এসেছে। গিরিখাদ-এর খাড়া গায়ে অনেকগুলি পলাশ। লালে লাল হয়ে গেছে। আরও নীচে একটি মস্ত কুসুম গাছ। সকালের রোদে তাদের ফিনফিনে, লালচে পাতারা ঝিলমিল করছে ফুল হয়ে।

গামহার নিঃশব্দে চেয়েছিল ঝাঁঝির দিকে। ঝাঁঝি অন্যের চোখে কতখানি সুন্দর তা কে জানে। কিন্তু গামহার-এর চোখে সে হুরী-পরী। "Beauty is in the eyes of the beholder."

চলো, ওঠো এবার গাড়িতে। নবেন্দুরা চিন্তিত হয়ে আবার দাঁড়িয়ে না পড়ে। কাল শেষ রাতে যা খেল দেখালে তোমরা।

গাড়িতে উঠতে উঠতে ঝাঁঝি বলল, খেল তো একটু হলেই খতম হয়ে যেত।

তা যেত। কিন্তু যায় তো নি!

আরও আধঘণ্টাটাক যাওয়ার পরে ঝাঁঝি চেঁচিয়ে উঠল উত্তেজিত হয়ে, চিকুদা। চিকুদা। বাঁদিকে দেখো। কী অপূর্ব প্রপাত।

জানি। আর একটু গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাব। অনেক ভাল দেখা যাবে। বলেই কিছুটা এগিয়েই গাড়িটা দাঁড় করালো।

বলল, নামো গামহারদা, নেমে দেখো।

ঝাঁঝি আর গামহার দু'জনেই নামল। গাড়ির কাঁচ নামিয়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো চিকু। ঠিক সেই সময়ে ওদের সামনে দিয়ে রাস্তা পেরোল একঝাঁক ময়ূর। দুটি ময়ূর চারটি ময়ূরী।

ময়ূর। ময়ূর। বলে চেঁচিয়ে উঠল ঝাঁঝি। কিন্তু তার গলার স্বর উবে গেল হাওয়ায় চাবুক মেরে ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ করতে করতে সোজা উড়ে-আসা একঝাঁক টিয়ার কর্কশ ডাকে।

চিকু খুশি হল ঝাঁঝির খুশি দেখে। গামহারদার লক্ষণ বিশেষ ভাল বুঝছে না চিকু। উত্তর-পঞ্চাশে পুরুষরা প্রেমে পড়লে সে প্রেম খুব সিরিয়াস ব্যাপার হয়ে ওঠে। মনে হচ্ছে গামহারদা একেবারে হেড-ওভার-হিলস পড়েছে। ঝাঁঝিও যে গামহারদাকে খুব একটা অপছন্দ করছে তা মোটেই নয়। আর "যব মিঞা বিবি রাজি, ক্যেয়া করে কাজী।"

চিকু বলল, মনে মনে, হউক। হউক। যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটুক। হারিতের একটু শিক্ষাও হওয়া দরকার। হি হ্যাজ টেকেন ট্যু-মাচ ফর গ্রান্টেড।

তারপরে ও-ও নামল গাড়ি থেকে। বলল, দেখেছ কত উঁচু থেকে পড়ছে জল। ওর নাম বড়াইপানি ফলস। ওখানে একটি বন-বাংলোও আছে। এর পরেরবার যখন আসব, থাকব ওখানে। তবে একটা কথা ...।

কী কথা?

ঐ বাংলোতে ভূত আছে।

সত্যি?

অনেকেই বলে।

কী বলে?

একেকজন একেকরকম বলে। তবে আমরা তো সবাই কিম্ভূত। ভূতে আমাদের কী করবে!

তারপর বলল, আমরা যেখানে যাচ্ছি জোরান্ডা, সেখানেও খুব সুন্দর একটি প্রপাত আছে। তবে সেটি বাংলো থেকে ভাল দেখা যায় না। একটু উপরে উঠে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে দেখতে হয়। জোরান্ডা বন-বাংলোটা আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। বাংলোর পাশের গিরিখাতটি শুধু ভয়াবহই নয়, অশেষ রহস্যময়ও।

কেন, রহস্যময় কেন?

আজ রাতেই দেখতে পাবে।

নামটা ওরকম কেন? মানে কি জোড়া-আন্ডা? গামহারদা না......

না, তা নয়। এখানে, মানে, সিমলিপালের জঙ্গলে, ময়ূরভঞ্জ জেলাতে বাথুরী সমাজ বলে একটি সমাজ আছে। তারা এই সময়েই তাদের দেবতা বড়াম দেওকে পুজো দিতে আসে বারিপদা থেকে পায়ে হেঁটে। গত বছরের আগের বছর তাদেরই একজনের কাছে শুনেছিলাম যে, নামটা আসলে জোরান্ডা নয়। এই গভীর কালো ল্যাটারাইট পাথরের গিরিখাতের গায়ে কোথাও নাকি জগন্নাথদেবের ঠাঁই আছে। বহু বহু বছর আগে এখানে নাকি 'জাউ' মানে, ভাত, যা জগন্নাথদেবের প্রসাদ, তা রান্না হতো। জাউ রান্না হতো বলে ওড়িয়াতে বলতো "জাউ-রন্ধা"। সাহেব ব্যাটাদের জিভ ভারী। অনেক শব্দের উচ্চারণে তারা অপারগ। তাই, যেমন খড়্গপুরকে তারা খাড়াগ্‌পুর করেছে, মেদিনীপুরকে মিদনাপুর, বর্ধমানকে বার্ডওয়ান, তেমনই জাউরান্ধাকে করেছে জোরান্ডা।

সত্যি?

উত্তেজিত হয়ে বলল ঝাঁঝি।

গামহার বলল, তুমি কত জানো তাই ভাবছি। তুমি যথার্থই পণ্ডিত।

দয়া করে ঐ শব্দটি ব্যবহার কোরো না গামহারদা। রবীন্দ্রনাথ কী বলেছিলেন জানো তো?

কি?

যাঁহারা সবকিছুই পণ্ড করেন তাঁহারাই পণ্ডিত।

তাই?

হেসে উঠল ওরা দু'জন।

আরও মিনিট কুড়ি পরে গাড়িটা উৎরাইয়ে নামতে নামতে একটা প্রকাণ্ড উপত্যকাতে নেমে এল। দু'পাশে জঙ্গল, মধ্যে দিয়ে সোজা পথ চলে গেছে। একজন সুন্দর শবর যুবক, হাতে তার তীর-ধনুক আর সঙ্গে তার অতি স্বল্প-বাস সুগঠিত সুন্দরী শবরী। বনে হেঁটে চলেছে। হাসতে হাসতে, কথা বলতে বলতে সখার গায়ে ঢলে পড়ছে। যেন "রাইকমলের" কাবেরী বসু। শুধু রঙটা কালো, এই যা।

গামহার ভাবছিল, যৌবনের মতো সুন্দর বিধাতার এই সৃষ্টিতে আর কিছু নেই। ওদের

দুজনের আনন্দ তো শিক্ষা, অর্থ, যশ, ক্ষমতা কিছু দিয়েই সমান করা যাবে না। যৌবন যার চলে গেছে, শুধু সেই জানে, যৌবনের সম্পদের কথা।

একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ল গামহার-এর।

কী হল তোমার?

চিকু বলল।

হয়নি কিছুই। ওদের দেখছিলাম। সুখের সংজ্ঞা যেন। না?

যা বলেছেন গামহারদা।

ঝাঁঝি বলল।

এই আদিবাসীদের সারল্য, তাদের সহজে সুখী হওয়ার ক্ষমতা, তথাকথিত দারিদ্রকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা, যদি আমাদের থাকত!

চিকু বলল, কিন্তু আমরা তো ওদের মূর্খ মনে করে, ওদের জিনস পরিয়ে, সোলার পাওয়ার টিভি বসিয়ে পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে, আমাদেরই মতো 'সভ্য' করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছি। হাউ ইডিয়টিক।

তারপর বলল, তোমাদের একটা বই পড়তে দেব। পড়ে দেখো।

কী বই?

'SAVAGING THE CIVILIZED'. পড়ে, খুব আনন্দ পাবে।

দিও।

ওই যে সামনে টিলার উপরে একটা ছোট্ট বাংলো দেখা যাচ্ছে ওটার নাম কি চিকুদা?

ওটার নাম ন'আনা। এই যে উপত্যকা পেরিয়ে এলাম এর নামও ন'আনা। পাহাড়ের নীচে একটি ছোট্ট বস্তী আছে। তার নামও ন'আনা।

এরকম নাম কেন?

পুরো সিমলিপালই তো ময়ূরভঞ্জের রাজার Shooting preserve ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ময়ূরভঞ্জ একটি করদ রাজ্য ছিল। ওড়িশাতে এরকম অগণ্য করদ রাজ্য ছিল।

যেমন?

যেমন, ময়ূরভঞ্জ, ঢেনকানল, বৌধ, শোনপুর, কালাহান্ডি, পারিকুত, কেওনঝরগড়, নুয়াগড়, দশপাল্লা, আরও কত, এখন নাম সব মনে আসছে না। তা এই ন'আনার নাম ন'আনা হয়েছে, কারণ ময়ূরভঞ্জের রাজাকে এদের বছরে ন-আনা খাজনা দিতে হত।

তাই?

তাই!

এখানে জলের খুব কষ্ট ছিল আগে। নীচে একটা কুঁয়ো ছিল। সেই কুঁয়ো থেকে চৌকিদারের সব প্রয়োজনের জন্যেই জল বয়ে নিয়ে যেতে হতো উপরে। তাই খুব কম ট্যুরিস্টই থাকতেন এখানে। এখন নীচে একটি ডিপ টিউবওয়েল করে দিয়েছেন সরকার। তার জলও ভারি মিষ্টি। চলো, খাওয়াব তোমাদের সে জল।

আর কতক্ষণ লাগবে জোরাণ্ডা পৌঁছতে আমাদের?

মিনিট পঁয়তাল্লিশ।

বাঃ। ঝাঁঝি খুশি হয়ে বলল।

খাবে নাকি জল?

ভাল?

বললাম না, অমৃত। চলো, জল খেয়ে নিই।

ওরা তিনজনেই নামল। সকলের শেষে ঝাঁঝি যখন টিউবওয়েল থেকে জল খেল তখন চিকু পাম্প করছিল আর গামহার পাশে দাঁড়িয়েছিল। পাছে শাড়ি ভিজে যায় তাই শাড়িটা একটু তুলে নিয়েছিল ঝাঁঝি। গামহার ওর পা দেখে ভাল লাগাতে মরে গেল। কী সুন্দর পায়ের গোড়ালি আর পাতার গড়ন। লাল টুকটুকে। বাঁ পায়েব মধ্যমাটি অন্য আঙুলের চেয়ে বেশি লম্বা। গামহার-এর এক জীবন-অভিজ্ঞ বন্ধু বলতো যে, যে-মেয়েদের পায়ের মধ্যম আঙুল বড় হয়, তারা খুব কামুক হয়। গামহার শুনে বলেছিল "একে মায় রাঁধে না, তপ্ত আর পান্তা"।

সামনে ঝুঁকে, নিচু হয়ে জল খাচ্ছিল ঝাঁঝি। তার স্তনদ্বয় মেরুন-রঙা ব্লাউজের মধ্যে পদ্মর মতো ফুটেছিল। সামনে ঝুঁকলে যে মেয়েদের স্তনের সৌন্দর্য বেড়ে যায় অনেক, তা পঞ্চাশ পেরিয়ে এসে হাবা-গবা গামহার এই প্রথম আবিষ্কার করল। সন্ত তুলসীদাস বলেছিলেন, "সকল পদারথ্ হায় জগমাহী, কর্মহীন নর পাওয়াত নাহি"। অর্থাৎ এই পৃথিবীতে সব জিনিসই আছে কিন্তু যে কর্মহীন মানুষ, তার কপালে কিছুই জোটে না। পরম আশ্লেষে, মুঠিভরে কোনো পূর্ণ যুবতীর প্রস্ফুটিত কোমল মসৃণ স্তনই যে ধরেনি, তার জীবনই বৃথা। গামহার একটা রিয়্যাল হতভাগা। যার নাম জঙ্গলের দামড়া গাছের নামে, যার জীবন গ্রীষ্মের ঊষর নাবাল ভূমির মতো ধূ ধূ, তার পক্ষে এই পূর্ণ-প্রস্ফুটিত যুগল-পদ্ম দর্শনই অনেক পাওয়া। মুহূর্ত কয়েক চোখ ভরে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝি বাঁ হাত দিয়ে তার আঁচল ফেলে দিল স্তনযুগলের উপরে। মেয়েদের ষষ্ঠেন্দ্রিয়তে তারা বুঝতে পারে কোন পুরুষের চোখ তাদের শরীরের কোথায় কখন ছোঁয়। লজ্জা অবশ্য ঝাঁঝি অথবা গামহার কেউই পেল না। গামহারকে ঝাঁঝি অপরাধীও সাব্যস্ত করল না। সংস্কারবশেই আঁচলটা ফেলে দিল ঝাঁঝি।

চলো, এবার।

আর বেশি দেরি তো নেই পৌঁছতে। আমাকে দু'মিনিট সময় দেবে? একটা সিগারেট খেয়ে নিতাম।

চিকু বলল।

গাড়ির কাঁচ নামিয়েই চলো না। এখন তো গরম নেই। এ সি চালানোর দরকার কি?

তা নেই। তবে লাল ধুলোয় ভরে যাবে গাড়ি।

যাক না চিকুদা। রঙে রঙে ভরে যাক গাড়ি, আমাদের মন, সব।

বাঃ। নেশা ধরে গেছে মনে হচ্ছে।

ঝাঁঝি বলল, সাতসকালে নেশা। কিসের?

তার চেয়ে বল জীবনের নেশা, যৌবনের নেশা। এমন নেশা কি আর আছে? প্রথমবারেই বুঝেছি এসে!

ঝাঁঝি বলল।

মাঝেমাঝেই মনে হচ্ছে কী যেন, রবীন্দ্রনাথ ছাদের টবে যুঁই-টগর-রজনীগন্ধা আর শান্তিনিকেতনের শাল, বকুল, পারুল, পিয়াল আর খোয়াই দেখেই বসন্তের যা প্রশস্তি করে

গেলেন তাঁর গানে গানে, জোব্বা-মুড়ে তাঁকে একবার এই সিমলিপালে বা অন্য কোনো গভীর বনে একবার নিয়ে এসে ফেলতে পারলে আমরা কী যে পেতে পারতাম ওঁর কাছ থেকে তা ভাবলেও রোমাঞ্চ জাগে। যে-কবি, যে-লেখক, যে-শিল্পী এই বনময় ভারতবর্ষকেই না দেখলেন, না অনুভব করলেন বুকের মধ্যে, তাঁর জীবনই বৃথা।

গামহার বলল।

চিকু বলল, অনেকের কাছে এই বন আবার শুধুই ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার আতঙ্ক। তাঁরা বলেন, খারাপ রাস্তা, কোনো বাংলোতে কমোড নেই, খাওয়াদাওয়ার সুখ নেই, চৌকিদারেরা ভাল বাবুর্চি নয়, তদুপরি ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া! এখানে কোনো ভদ্রলোকে আসে! না, আসা উচিত তাঁদের?

ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হয় বুঝি এখানের মশার কামড়ে?

ঝাঁঝি বলল।

হয় বই কী! প্রতি বছরই সিমলিপাল থেকে ফিরে গিয়ে কিছু বনপ্রেমী মারা যানই ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়াতে। এ সুন্দরী বড়ই বিপজ্জনক।

বলো কি চিকু? তাহলে আমাদের কি হবে? তবে সুন্দরী মাত্রই তো বিপজ্জনক!

গামহার চিন্তিত গলায় বলল।

আমাদের মধ্যেও কেউ কেউ টেঁশে যেতে পারি।

তবে?

তবে আবার কি! কন্ডোমহীন নিবিড় সঙ্গমের সুখটা সুখ নয়, শুধু এইডস এর কষ্টটাই কষ্ট? যত সব গোলমেলে কথাবার্তা। এমন সুন্দর বাসন্তী-বন-এর আনন্দর পরে যদি ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়াতে মরতেও হয় তাহলেও দুঃখের কী আছে! আমরা বেঁচে থেকেই বা পৃথিবীর কোন উপকারটা করছি?

জন্মালে তো মরতে হয়ই। কে কী করে মরল তার উপরেই সব নির্ভর করে। গুডি, গুডি বয়কেও মরতে হয়, নটি-নটি বয়কেও তাই। নটি-নটি বয় এই জীবনের অনেক দিক দেখে যায়। মৃত্যু তাকে মাকড়শার জালে পড়া পোকার মতো ধীরে ধীরে গ্রাস করে না সে নিজে এগিয়ে গিয়ে, "নাইস ট্যু মীট ড্যু" বলে, মৃত্যুর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে। আমরা গুডি-গুডি নই, নটি-নটি।

সিগারেটটা শেষ করে গাড়িতে বসে এঞ্জিন স্টার্ট করে নআনা ছেড়ে কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পরে জঙ্গলের মধ্যে একটা বাঁক নিতেই পেছন থেকে ঝাঁঝি চিৎকার করে উঠল, ওমা, ওমা, চিকুদা। দাঁড়ান। দাঁড়ান। দেখি!

চিকু গাড়ি থামাল।

একদল লাল প্রজাপতি পথের উপরে ন-দশ ফিট উঁচুতে দল বেঁধে উড়ছে। সকালের রোদ তাদের ফিনফিনে লাল ডানাতে পড়ায় রং প্রতিসরিত হচ্ছে দু'পাশের জঙ্গলে।

লাল তিতলি।

স্বগতোক্তি করল চিকু।

যতক্ষণ প্রজাপতিগুলো পথের উপরেই থাকল, গাড়ি দাঁড় করিয়েই রাখল চিকু। তারপরে আকাশ লাল মেঘে ঢেকে দিয়ে শূন্য থেকে ঝুলতে ঝুলতে দুলতে দুলতে তারা বাঁদিকের বহুরঙা বনের ভিতরে ঢুকে গেলো।

কী সুন্দর!

স্বগতোক্তি করল এবারে ঝাঁঝি।

চিকু বলল, লাল-তিতলি পেত্নীর দূত।

সে আবার কি কথা?

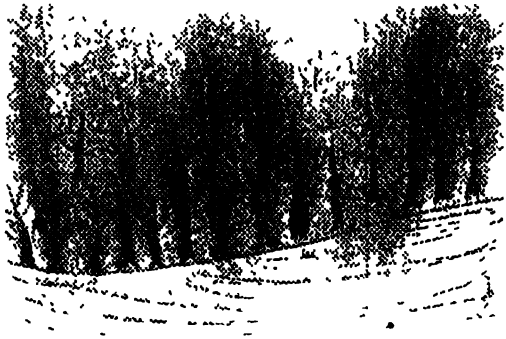
তুমি কোজাগর পড়োনি?

না তো!

তবে যে হারিত সেই লেখককে এতো গালাগালি করল তোমার মাথা বিগড়ানোর জন্যে?

ঝাঁঝি বলল, ওই বইটিতো পড়িনি। গিয়েই পড়ব।

'কোজাগর'-এ লাল তিতলিকে এক আধি-ভৌতিক ব্যাপার স্যাপারের প্রতীক হিসেবে এনেছেন লেখক। 'এ উপন্যাসে।



সকাল-সন্ধেতে এই এপ্রিলের গোড়াতে এখানে এখনও ঠাণ্ডা। তবে এখন বেলা বেড়েছে। ঝকঝক কবছে বোদ। শীতেব "শ"ও নেই।

জোবান্ডা বাংলোর হাতাতে সামনেব দিকে খাদেব পাশে একটি গোল ঘব করা আছে। চাবদিক খোলা। মাথাতে ছাতার মতো ছাদ। নীচটা বেদীব মতো করে বাঁধানো। তাব উপবে চেযার-টেবিল পাতা।

এখন বেলা প্রায সাড়ে এগাবোটা বাজে। ওবা ঐ ঘবটিতেই বসেছিল। চৌকিদারদেব খবব দেওযা হয়েছে। হারাধনের দশটি ছেলের আরও তিনটি আজ দুপুরে যাবে। মুরগীর ঝোল আর ভাত আজও হবে দুপুবে। বাতে খিচুড়ি। খিচুড়ি, বেগুন ভাজা আর আলু ভাজা।

হারিত বোতল-টোতলগুলোও বেব করে আনল। জলের বোতলও। তারপর যে স্কচ-এব বোতল থেকে চিকু গামহারকে পরশু রাতে দিয়েছিল এবং গত বাতেও, সেই বোতলটি এনে একটি পাতিয়ালা পেগ ঢালল নিজে।

চিকু বলল, আমি দিনেব বেলাতে খাই না কিছু।

হারিত বলল, গামহাবদা কি খাবেন?

না খেলেই হয। খালি পেট। তাছাড়া বলেইছি তো আমার তেমন অভ্যেস নেই।

কিছু তো করার নেই। তাই.

হাবিত বলল।

আগে জানতাম, 'নাই কাজ তো খই বাছ'। এখন দেখছি 'কাজ নাই তো মদ খাই'।

চিকু বলল, আমি রান্নাঘবে গিয়ে গামহারদা আর মেয়েদের জন্যে কিছু খাবার করে নিয়ে আসি। সকলেই ওমলেট খাবে তো?

ঝাঁঝি বলল, এতদিনে বুঝলাম চিকুদা, তোমাকে মেয়েরা এতো ভালবাসে কেন?

কেন?

আমি তো জানতাম রান্নাঘর মানেই মেয়েরা, তা তারা যত সফিস্টিকেটেড আর ওয়েল-অফ্‌ফই হোক না কেন! ঢেঁকিদের স্বর্গে গিয়েও ধান ভানতে হয়। তুমি সত্যিই ব্যতিক্রমী পুরুষ।

জারুল বলল, তোমরাই তো পুরুষদের মাথাটি খেয়েছ ঝাঁঝি। আমি কী পারি না, যা চিকু পারে? আমিও গাড়ি চালিয়ে আসতে পারতাম চিকুকে পাশে বসিয়ে। আমি রান্না করতে জানতে পারি তো চিকু বা হারিতরাই বা জানবে না কেন?

হারিতও খুব ভাল রান্না করতে পারে।

ঝাঁঝি বলল।

তাহলে হারিতদাও যাও। চিকুকে সাহায্য করো গিয়ে একটু।

তুই চুপ করতো।

চিকু বকে দিল জারুলকে।

তারপর ঝাঁঝি বলল, ও রাঁধে ভাল কিন্তু নিরুপায় হলেই রাঁধে কিংবা স্ট্যাগ-পার্টির পিকনিক-এ। ধারে-কাছে মহিলারা থাকলে রান্নাঘরে ঢুকতে ওর পৌরুষে বাধে।

হারিত কথা না বলে পাতিয়ালা পেগ-এ একটি চুমুক দিয়েই সেটাকে ক্লাব-পেগে নামিয়ে আনল।

আপনি রান্না করতে পারেন, গামহারদা?

ঝাঁঝি জিগ্গেস করল গামহারকে।

গামহার লজ্জিত হয়ে বলল। পারি, মানে, ওমলেট আর চা করতে পারি। তাও ইলেকট্রিক স্টোভে। গ্যাস জ্বালতে পারি না আমি।

চিকু বলল, ওগো আমার নেকুপুষুমুনু দাদারে।

ঝাঁঝির গামহার-এর এই অকপট স্বীকারোক্তি খুব ভাল লাগল। আহা। তোমাকে রান্নাঘরে যেতেই হবে না। তুমি রান্নাঘরে যাবেই বা কেন? কোন দুঃখে।

মনে মনে বলল ও।

সিমলিপালে আসবার আগেই গামহার সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছিল, চিকু, জারুল আর কিছু হারিতেরও কাছে। সবই ভাল ভাল কথা। মানুষটি ভাল কী না বলতে পারবে না কিন্তু ভারী ছেলেমানুষ যে, তা বুঝেছে ঝাঁঝি। নিষ্পাপ। এমন ইনোসেন্ট পঞ্চাশোর্ধ্ব পুরুষ ও জীবনে দেখেনি। আজকালকার পনেরো বছরের ছেলেরাও গামহার-এর চেয়ে বেশি জানে। এক তাল কাদা হাতে পেলে সব মেয়েরই ইচ্ছে করে একটি সুন্টুনি-মুন্টুনি পুরুষ পুতুল বানাতে।

চিকু উঠে চলে যাওয়ার আগে, মুখ ঘুরিয়ে হারিতকে বলল, স্কচটা এনেছিলাম দাদার জন্যে। পুরো শেষ করে দিও না। তুমি তো রাম-এর পার্টি ভাই। গাল দেখলেই কি টিপতে ইচ্ছে করে!

ও সরি! সরি!

লজ্জিত হয়ে বলল হারিত।

ঝাঁঝিও উঠে পড়ল। বলল, যাই! চিকুদাকে একটু সাহায্য করি গিয়ে।

জারুল কিছু না বলে উঠে-যাওয়া ঝাঁঝির দিকে চেয়ে থাকল পেছন থেকে। হঠাৎই ওর মনে হলো ঝাঁঝির ফিগারটা যে এতো ভাল তা আগে খেয়াল করেনি। অন্য সব ব্যাপারেই চিকুর মতো ছেলে হয় না। কিন্তু এই একটা ব্যাপারেই তাকে বিশ্বাস করা যায় না। হনুমানে যেমন খেয়াল হলেই গাছের এ ডাল ছেড়ে অন্য ডালে ঝাঁপায় চিকুও তেমনি এক নারী ছেড়ে অন্য নারীতে। ওর জীবনে জারুল সম্ভবত চোদ্দ কী পনেরো নম্বর হবে। চিকুর যা বয়স, তা বিবেচনা করে বলা চলে যে, ওর সমবয়সী কোনো জেনুইন হনুমানও এতবার ডাল-বদল করেনি।

রান্নাঘরটাকে এখান থেকে দেখা যায়। তবে ভিতরটা অন্ধকার। তাছাড়া, চিকু তো

জারুল-এর বিবাহিত স্বামী নয়! আইনের জোর, সমাজের জোর তো কিছু নেই। শুধুই ভালবাসার ভাললাগার জোর-এর বিনিসুতোর মালায় গাঁথা ওদের সম্পর্ক।

ভাবনাটা জারুলের মনে আসতেই, নিজেকে বকলো খুবই জারুল। জোর করে হয়ত কারোকে জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই ধরে রাখাও যায় না, যদি ভালবাসা বা শ্রদ্ধা না থাকে একে অন্যের প্রতি। সে সম্পর্ক দাম্পত্যরই হোক কী উকিল-মক্কেলের। ও-ও তো ফ্যালনা নয়। পরনির্ভর নয়। ওকেও তো কম পুরুষ আজ অবধি শরীর-মনে প্রার্থনা করেনি। তবে তারও এই হীনম্মন্যতা কেন? ও তো সাধারণও নয়!

তারপরই ভাবল যে, এটা হীনম্মন্যতা নয়। এটা অধিকার হারানোর আশঙ্কা। ক্লিওপেট্রাও হয়তো সিজার-এর সম্বন্ধে এমন ভাবনাই ভাবতেন বা লায়লাও মজনু সম্পর্কে। একজন চিরন্তন নারী তো রয়েইছে তার মধ্যে, সে যতই আধুনিকা হোক না কেন! 'লী' বা 'হফফ্‌ম্যান'-এর জিনস আর উইকএন্ডার বা প্যান্টালুন-এর পোশাক তার বহিরঙ্গর খোল-নলচে পাল্টে দিয়ে থাকতে পারে, তাঁর অন্তরঙ্গর নারীকে বদলাতে হয়ত আবও অনেক যুগের বাহারি ছেলেপনার প্রয়োজন হবে। অথবা, এমনও হতে পারে যে, ততদিনে নারীরা স্বমহিমাতে তাদের পুরনো মাতৃরূপে, জায়া-রূপে বা প্রেমিকা-রূপেই ফিরে আসবে তাদের শালীনতম পোশাক, শাড়ি পরে, যেমন ফিরে এসেছে অনন্ত আর বাজুবন্ধর মতো পুরনো গয়নার ফ্যাশান।

গামহার, সুন্দরী জারুল-এর দিকে চেয়ে ভাবছিল যে, টম-বয় কাট-এ চুল কাটা, জিনস আব উইকএন্ডারেব আটটি পকেটওয়ালা জামা পরা জারুলকে হয়তো একটিও পকেট না-থাকা শাড়িতে, কোমরে চাবির গোছা ঝুলিয়ে, কপালে বড় সিঁদুরের টিপ পরে, পায়ে আলতা দিয়ে, চোখে কাজল দিয়ে এর চেয়েও অনেক অনেকই বেশি সুন্দরী দেখাতো। হয়তো! হয়তো!

গামহার বলল, এই জোরান্ডা নামের ইতিবৃত্ত শুনলাম আসতে আসতে চিকুর কাছে। তোমরা কি জানো?

না তো! জোরান্ডা ইজ জোরান্ডা। বহুদিন থেকেই বহুজনার মুখেই শুনে আসছি। তার আবার ইতিবৃত্ত কি?

নবেন্দু বলল।

এই নবেন্দু ছেলেটাকে প্রথম দর্শনেই ভাল লাগেনি গামহার-এর। আজ সকালে চাহালাতে ওর প্রাণের বন্ধু হারিত ঝাঁঝির সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করল তা দেখেও ও হারিতকে কিছুই বলল না তা লক্ষ করে অবাক এবং দুঃখিত হয়েছিল গামহার। কে জানে! ও হয়ত ভুল। যেহেতু ওর মনে হয়েছে যে নবেন্দু ঝাঁঝিকে ভালবাসে এবং যেহেতু গামহার-এরও প্রথম দর্শন থেকেই ঝাঁঝিকে ভাল লাগতে শুরু করেছে সেই জন্যেই হয়ত ওর এত অপছন্দ হচ্ছে নবেন্দুকে। বেচারী নবেন্দু। কত কষ্ট করে প্রাণ বিপন্ন করে গাড়ি চালিয়ে ঝাঁঝিদের বিপদ শুনে দৌড়ে এসেছে এত দূরে নিজের কাজ নষ্ট করে।

একথা মনে হতেই মনে মনে খুব বকল গামহার নিজেকে। আসলে, গামহার কল্পনাতেও কারোকে কষ্ট দিতে চায় না। অন্যকে ভুল করে কষ্ট দিলে সে কষ্ট তার মনে দশগুণ হয়ে ফিরে আসে। তবে যেক্ষেত্রে ও কোনো মানুষকে খারাপ বলে জেনে নিশ্চিত হয়েছে সেই মানুষকে আঘাত দিতে ওর একটুও বাজে না। চাইনীজ দার্শনিক কনফ্যুসিয়াস বলেছিলেন,

"If you pay evil with good what do you pay good with?" অপর মানুষের খারাপত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে অবশ্য অনেকই সময় নেয় গামহার। পাছে ভুল করে, তাই।

গামহার বলল, জানেন নবেন্দুবাবু, পথে চিকু আমাকে আত্মদর্শন করালো।

আরে দাদা। সকলকেই যখন 'তুমি' বলছেন তখন আমাকে আবার আপনি কেন? কী এমন অপরাধ করলাম আমি!

গামহার হেসে বলল, ঠিক আছে। তুমিই বলব।

তা আত্মদর্শনটা কীরকম?

গামহার ওদের বলল, বিস্তারিত।

হারিত বলল, অ্যাকসিডেন্ট হলো বলেই সব গোলমাল হয়ে গেল।

সব ভাল যার শেষ ভাল।

গামহার বলল।

বুঝলেন গামহারদা, আসলে কাল রাত অবধিও ঠিক বুঝতে পারিনি পরশু শেষ রাতে কী ঘটতে যাচ্ছিল। একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। আজ ভোর থেকেই আমার হাত-পা ছেড়ে যাওয়ার যোগাড় হয়েছে। তখন থেকেই মেজাজটা বিগড়ে ছিল। ভয়টা আর শকটা এতো দেরি করে যে কখনও আসতে পারে, তা আমার জানাই ছিল না। কিছু মনে করবেন না গামহারদা, আপনার জন্যে আনা ভাল জিনিস আমি অভদ্রর মতো খেয়ে ফেললাম বলে।

তাতে কিছুই হয়নি। কিন্তু খালি পেটে কেন?

আর পেট! পেট তো এতক্ষণ লাশকাটা ঘরে ফর্দাফাঁই হয়ে যেত। পেটই থাকতো না, তার খালি আর ভর্তি। পুনর্জন্মটা সেলিব্রেট করব আজকে রাতে। দুপুরে মুরগীর ঝোল ভাত খেয়েই ঘুম লাগাব একটা। সেই জন্যেই জেনেশুনেই দিনমানেই মাতাল হচ্ছি।

তাই বল। আমি ভাবছিলাম, মাতাল হওয়ার জন্যে এত কষ্ট করে প্রাণ বিপন্ন করে এতদূরে আসা কেন? মাতাল তো কলকাতা শহরেই হওয়া যেত সহজেই, তোমার মহীন না কোন বন্ধুর বাড়িতে তাস খেলতে যেতে তুমি, সেখানেও।

হারিত বলল, এখনও তো ব্রেকফাস্টই হয়নি। তোড়জোড় সব শেষ হোক। দুপুরে খেতে খেতে তিনটে চারটে তো হবেই।

আমি ততক্ষণে বরং একটু ঘুরে ঘুরে দেখি জঙ্গল। জঙ্গলেই আমার নেশা একেবারে পুরো হয়ে গেছে। খাদ্য-পানীয় কিছুমাত্র না হলেও চলবে।

গামহার বলল।

একা যাবেন না দাদা। সেটা ঠিক হবে না। জঙ্গল সুন্দর যেমন, বিপজ্জনকও বটে। পিকু অথবা জারুল কারোকে সঙ্গে নিয়ে যান। হাতিতে তো যখন তখন ফুটবল খেলতেই পারে। তাছাড়া কখন ভাল্লুকে নাক খুবলে নেবে, কী শঙ্খচূড় সাপে দূর থেকে তেড়ে এসে মাথায় ছোবল মারবে বা বাঘ গালে থাপ্পড় কষাবে কে বলতে পারে! সেবা শুশ্রূষা করার জন্যে নিদেনপক্ষে একজন লোকও তো চাই!

নবেন্দু বলল।

বাঘই যদি গালে থাপ্পড় মারে, তো সেবা আর কারোকে করতে হবে না। ধড় থেকে মুণ্ডুই আলাদা হয়ে যাবে। শুনেছি, শঙ্খচূড়ে ছোবল মারলে পাহাড়ের মতন হাতিও মরে যায়, আর মানুষ! আর ভালুকে যা করে, তা আমি নিজচোখেই একবার দেখেছিলাম বন্ধুদের

সঙ্গে তিলাইয়া ড্যামে বেড়াতে গিয়ে সেখান থেকে রজৌলির ঘাটের জঙ্গলে চড়ুভাতি করতে গিয়ে। সে দৃশ্য মনে করলে আমার অন্নপ্রাশনের ভাতই উঠে আসে।

তাহলে বাংলোর হাতাটাই একটু ভাল করে দেখি।

তা দেখুন। হারিত আর আমি একটু নিজেদের ভোলাই। আপনি আত্মদর্শন করে এলেন, আমরা আত্ম-বিস্মরণ করি।

নবেন্দু বলল।

গামহার উঠে গেলে হারিত বলল, চিকুর যত কাণ্ড। সঙ্গে এক বুড়ো ঢ্যামনা সাপ নিয়ে এসেছে। এই সব সাহিত্যিক-শিল্পী-গাইয়ে দেখলেই আজকাল রক্ত মাথায় চড়ে যায়। দুর্বুদ্ধিজীবী অ্যান্ড কোম্পানি।

তুই চিকুর ফোন পেয়ে কী ভেবেছিলি?

কী আর ভাবব। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল। পরশু রাতে রাশিদ খাঁ'র গান শুনতে গেছিলাম জয়ন্তদার বাড়িতে।

ও।

মেঘমল্লার গাইল। তাড়াহুড়োতে গাইল বটে কারণ পণ্ডিত ভীমসেন যোশীজী অপেক্ষা করছিলেন তার পরে গাইবেন বলে। তবুও দুর্দান্ত গেয়েছিল। রাশিদের গলার কোনো তুলনা নেই। মেঘের মতো গলা। এমন গলাতেই মেঘমল্লার গাইতে হয়।

সামনে তো পুরো জীবন পড়েই আছে।

রাশিদ খাঁর গান শুনেই চলে এলি? যোশীজীকে শুনলি না?

আরে শুনলাম বইকি। তাই তো অত দেরি হলো। রাত দেড়টাতে বাড়ি ফিরেছি জয়ন্তদার বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া সেরে। বাড়ি ফিরে চান করলাম গরম জলে। নইলে ঘুম আসে না। তারপর শুতে শুতে প্রায় আড়াইটা। আর ঠিক ছটার সময়ে চিকুর ফোন। ভাল করে মুখ ধোওয়ারও সময় পাইনি।

একটু চুপ করে থেকে বলল, বেচারা হরভজন। কাল ছুটি চেয়ে রেখেছিল অনেকদিন আগে থেকেই। ওর চাচেরা ভাইয়ের বাড়ি যাবে কী অনুষ্ঠানে নৈহাটিতে। সে তো সেজন্যে সাতসকালে উঠে চানটান করে তার কোয়ার্টারে 'প্রীত ভইল মধু বনোঁয়া রামা, তোরা মোরা' গাইতে গাইতে জামাকাপড় পরে ট্রেন ধরতে বেরোচ্ছিল। আমি গিয়ে প্রায় অ্যারেস্ট করে গাড়িতে ওঠালাম। বেচারা দুঃখে মরে যায় আর কী! কী করে ওকে মানাই? আমি তোদের দু'জনকেই মেরে দিলাম।

মেরে দিলি মানে?

মানে, মেরে দিলাম। হরভজনের দুঃখ লঘু করার জন্যে বললাম তোরা দু'জনেই খতম হয়ে গেছিস মুখোমুখি ট্রাকের সঙ্গে ভিড়িয়ে।

হারিত বলল, সত্যি! কী করে বাঁচলাম বলতো? এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

আচ্ছা কাল এসব প্রসঙ্গ ওঠালি না কেন?

সত্যি কথা বলতে কি, সাহস পাইনি।

তাই?

সত্যি বলছি।

আর ঝাঝি। তোর গার্লফ্রেন্ড। কী মেয়ে মাইরি।

হারিত বলল।

কী মেয়ে? কেন? সী ইজ আ ভেরি ব্রেভ গার্ল। অন্য কেউ হলে তো এখনও হাপুস নয়নে কেঁদেই যেত কী হতে পারত তা ভেবে। শী নেভার লুকস ব্যাক ইন লাইফ।

পাথরে তৈরি না প্লাটিনামে, কিছুই বুঝতে পারলাম না আজও।

ওড়িশাতে ঢুকে ভাল রাস্তাতে পড়ামাত্রই ঝাঁঝি বলেছিল, অ্যাকসিডেন্ট কিন্তু ভাল রাস্তাতেই হয়। ঘুমিয়ে পড়ো না।

আমি বলেছিলাম, তুমি গল্প করো। অথবা ঘুমোও। তোমার যা খুশি। ড্রাইভিং এর ব্যাপারে কারো কাছ থেকে কোনো জ্ঞান শুনতে আমার ভাল লাগে না।

ঝাঁঝি বলল, পাঁচ বছর বিয়ে হয়ে গেছে। ঝগড়া ছাড়া কথা নেই। দুটো কথার পরই তো ঝগড়া লেগে যাবে। চুপ করে থাকাই ভাল। আর গল্পই যদি করতে বলো, তো তোমার মায়ের নিন্দা করতে পারি।

আমি বললাম, চুপ করো।

যাকগে। আমি তবে ঘুমোলাম। ঘুম পেলে বোলো কিন্তু। ঘুম ঘুম পেলেও গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিও পথের পাশে।

বললাম, জ্ঞান দিও না। তুমি কি ড্রাইভিং জানো?

শিখিয়েছ কি, যে জানব। তোমার বাবা তো অনেক ঝেড়ে-বেছে পড়তি ঘর থেকে মেয়ে এনেছিলেন যাতে শত অত্যাচারেও মুখ বুঁজে থাকি। আমার বাবার তো গাড়ি ছিল না যে, শিখে আসব। তুমিও যা কেপ্পন। কতদিন বললাম যে, আমাকে একটা লাল ছোট মারুতি কিনে দাও। তা নয়। সব চাড্ডাকানটেন্টই কি তোমারই মতো কেপ্পন?

তারপর অ্যাকসিডেন্টটা কী করে হল তাই বল। তোদের বস্তাপচা পুরনো ঝগড়ার কথা শুনতে চাই না।

কী করে হলো, কখন হলো কিছুই বুঝলাম না'রে ব্রাদার। একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। তারপরই দেখলাম। গাড়িটার মুখটা ডানদিকে রাইট অ্যাঙ্গেলে ঘুরে গেছে আর পেছনটা ঠেকে রয়েছে একটা ইয়া-মোটা গাছে। তখন তো অন্ধকার। রাস্তার একপাশে যে জঙ্গলময় পাহাড়, অন্য পাশে ঝাঁটি জঙ্গলে ভরা মাঠ তাও জানি না।

ঝাঁঝি নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে গেছিল ভয়ে!

নবেন্দু জিগ্গেস করল।

অজ্ঞান? তাহলে আর বলছি কি? সে ফার্স্ট সেন্টেন্স বলল, গেল আমার কাঁচের চুড়ি কটা।

আমি বললাম, আমার নতুন গাড়িটা! টোটাল লস। পাঁচ লাখ দিয়ে কেনা।

ও বলল, তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে গাড়িটা থেকে গিয়ে বউটা গেলেই ভাল হতো!



গামহার অবাক হয়ে জোবান্ডা বাংলোব বাঁদিকের গিরিখাদের পাশের বাঁশের বেড়ার সামনে দাঁড়িয়েছিল। কালোরও যে কত ছায়া হয় তা এই গিরিখাতের চাবদিকের পাথরের দিকে চেয়ে একজন আর্টিস্টের চোখ দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছিল। আড়াই তিন হাজার ফিট সোজা খাড়া নেমে গেছে খাদ, নীচে, সবদিকেই। তার চারদিকই এমন খাড়া যে, মানুষ তো দূরস্থান, পাখিরও পা বাখার জায়গা নেই। অশান্ত ঝরঝরানি শোনা যাচ্ছে জোরান্ডা ফলস-এর। বহু নীচে গিয়ে পড়ছে সে জল। তবে প্রপাতের উৎসটি বাংলোর দিক থেকে ভাল দেখা যায় না। নীচে দহ মতো সৃষ্টি হয়ে রুপোলি ফিতের মতো এঁকে-বেঁকে নদী হয়ে বয়ে গেছে গভীর অরণ্যের বুকে বুকে। একলা পাহাড়ী বাজ উড়ছে গিরিখাদের উপরে। তার ডানায় সাদা-কালো ডোরা। অন্যদিকে উড়ছে একদল শকুন। তারাও চক্রাকারে। অনেক উপরে। তাদের কাক বলে মনে হচ্ছে। নীচেব বনাবৃত গহ্বরের একই জায়গার উপরে তারা উড়ছে, গিরিখাদের গভীর তলের সামান্য উপরে।

এমন সময়ে একজন লোক এসে বলল, বাবু জলখিয়া খাইবাকু আসন্তু। সে বাবুমানে ডাকিছন্তি।

চলো।

বলল, গামহার।

লোকটি নিশ্চয়ই চৌকিদারদের মধ্যেই একজন হবে। সম্ভবত জুনিয়র চৌকিদার। তাকেই জিগ্গেস করল গামহার, শকুনগুলো ওরকম করে উড়ছে কেন ওখানে?

গুট্টে হাতি মরিলানি।

কী করে মরল?

চোরা শিকারীরা মারল দাঁতের জন্যে।

তারা ধরা পড়েছে?

তারা কি ধরা পড়ে! এসব কথা ছোট মুখে মানায় না বাবু। আমার প্রাণও চলে যেতে পারে। এই খাদেই যদি আমাকে আপনি ঠেলে ফেলে দেন তাহলেই তো হলো। বন্দুকের গুলিও খরচ করতে হবে না। পরদিন শকুন উড়ছে দেখে কেউ ভাববে, কোনো জানোয়ার মেরেছে বুঝি নীচে বাঘ কি চিতাতে। এই বনপাহাড় বড় সাংঘাতিক জায়গা বাবু।

সাংঘাতিক বলছ কেন? এমন সুন্দর জায়গাকে?

সুন্দর মাত্রই তো বিপজ্জনক বাবু। তাছাড়া এখানে দেবদেবীর বাস। ভূতপ্রেতও কম

থাকে না। রাত নামার আগে আগেই আমরা দুয়ার দিয়ে শুয়ে পড়ি। আপনারা দু'একদিনের জন্যে সখ করে বেড়াতে আসেন, আপনাদের ভাল লাগতেই পারে। কিন্তু যারা বারো মাস থাকে তারা সৌন্দর্যের কিছু দেখে না।

গামহার ভাবল, যাদের চোখ নেই, তারা দু'দিন থাকলেও দেখে না সারাজীবন থাকলেও না।

তা রান্নাবান্নার কি হবে আমাদের? তোমরা যদি অতো তাড়াতাড়ি চলে যাও!

পার্টি যতক্ষণ না খাবেন ততক্ষণ তো থাকতে হয়ই। দিনবেল্বে কিছি ভয় নাস্তি কিন্তু রাতিবেল্বে যেমিতি আপন্বমানে খাইবা-পীবা সারিবে, আম্মোমানে চঞ্চল পলাইবি।

তাই?

হঁ আইজ্ঞাঁ।

গামহার গিয়ে পৌঁছতেই চিকু বলল, কোথায় হারিয়ে গেছিলে? ছিনছিনারি দেখতে!

না না বাইরে যাইনি। হারিত আগেই সাবধান করে দিয়েছিল যে বাংলোর হাতার বাইরে পা ফেললেই নানা বিপদ। তোমার অথবা জারুলের সঙ্গে ছাড়া যেন না যাই এক পা-ও।

তাই? হারিতও তোমারই মতো প্রথমবার এলো সিমলিপালে। আর জঙ্গলের কথা ও জানেই বা কি? ড্যালহাউসি স্কোয়ার-থুরি পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার বি-বা-দী বাগের জঙ্গল ছাড়া!

আরে আজকাল কোনো ব্যাপারেই যে কেউ কিছু সত্যি জানে, সে নিজের সম্মানজ্ঞান আর অভিমান নিয়ে নিজের ঘরে বসে থাকে যারা কিছু জানে না তারাই দলে নাম লিখিয়ে নিজেদের ঢাক নিজেরা বাজায়। অজ্ঞরাই আজকাল সর্বজ্ঞ। আর সর্বজ্ঞরাই অজ্ঞ। এ হলো ঘোর কলি। বুঝলে কি না!

তা যা বলেছ।

নবেন্দু বলল।

চিকু বলল, একটু খেয়ে নাও। তারপর চলো, তোমাকে নিয়ে জঙ্গলে বেরোব জারুল আর আমি।

ঝাঁঝি বলল, আমাকে নেবে না জারুল?

উ্য আর ওয়েলকাম।

তোমরা কি কেউ যাবে?

নবেন্দু বলল, জঙ্গলের মধ্যে সেঁধিয়ে গেলেই কি আর জঙ্গল বেশি ভাল করে দেখা যাবে? এইখানে বসেই তো চমৎকার দেখা যাচ্ছে 'প্যানোরোমিক ভিউ'। "আই অ্যাম দ্যা মনার্ক অফ অল আই সার্ভে।"

ওরা সকলে হেসে উঠল নবেন্দুর কথায়।

চিকু বলল, সরি গামহারদা। কিম্ভূত ব্রেকফাস্ট। ক্রিম-ক্র্যাকার বিস্কিট আর ডিমের ভুজিয়া।

আর চমৎকার লপচু চা-এর কথা বললে না।

ওই হলো।

শাড়ি পরে কি যেতে পারব জঙ্গলে? ঝাঁঝি বলল।

পারা তো উচিত। ভারতের নিবিড়তম জঙ্গলের আদিবাসীরা কেউই তো জিনস পরে

বলে জানি না। এই সবই তোমাদের বাহানা। ধুতি-শাড়ি পরে নাকি অফিস করা যায় না। আগে রণপা চড়ে যে সব বাঙালি ডাকাতি করতো তারাও তো মালকোচা মারা ধুতিই পরতো, না কি? ভোম্বল সর্দার বা রঘু ডাকাতেরা গল্‌ফ-শু বা জিনস পরতো বলেও তো শুনিনি।

চলো, ডানদিকে যাই।

চলো।

কয়েকশ মিটার যাবার পরই লাল মাটির এবড়ো-খেবড়ো পথের উপরে একটি শুকনো খড় পড়ে আছে দেখা গেল। ঝাঁঝি আর গামহার আগে আগে যাচ্ছিল। পেছনে চিকু। চিকু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, দাঁড়াও।

ঝাঁঝি একটু আহত হলো। বন-জঙ্গল, চিকুর চেয়ে ও নিশ্চয়ই অনেকই কম জানে। কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়তে বলার পেছনে একটা আদেশের সুর ছিলো। তবু দাঁড়িয়ে পড়ে পেছনে তাকাল ওরা দু'জনেই।

চিকু বলল, দাঁড়াও। সাপটা চলে যাক।

কোথায় সাপ?

তোমাদের সামনেই। পথের উপরে।

সেকি! ওটা তো একটা খড়।

খড় আসবে কোথা থেকে? আশেপাশে কি খড়ের গাদা আছে? চারদিকে কাটা ক্ষেতে হেমন্তর ধান উঠে গেছে কি এই পাহাড়ে জঙ্গলে? পিছিয়ে এসো। ওটা দেখেই তোমাদের বোঝা উচিত ছিল যে ওটা খড়ের মতো দেখতে হলেও আসলে খড় নয়।

বলেই, চিকু পথপাশের একটা গাছ থেকে লাঠির মতো একটি শুকনো ডাল ভেঙে নিয়ে হাতে রাখল। তারপর একটা নুড়ি তুলে নিয়ে ঐ বস্তুটির কাছাকাছি ছুঁড়ে মারল। তাকে আহত করার জন্যে নয়, ভয় দেখাবারই জন্যে। মুহূর্তের মধ্যে খড়টি মোটা হয়ে গেল, প্রায় পুরুষের পায়ের বুড়ো আঙুলের সমান। এবং হাত দেড়েক দাঁড়িয়ে উঠল লেজ-এ ভর করে। তারপরই তার ফণা ছড়ালো। ফণাটি কম করে চিকুর হাতের পাতার সমান।

চিকু মরা গাছের ডালটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। সাপটা এঁকেবেঁকে পথ পেরিয়ে ডানদিকে গিয়ে দুটি পাথরের মাঝখান দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল।

জারুল বলল, কী সাপ এটা? লাউডগার চেয়েও তো সরু মনে হয়, ফণা না-তোলা অবস্থাতে।

হ্যাঁ। দেখে রাখো ভাল করে। এর নাম কান্বখুণ্টা।

কান্বখুণ্টা মানে কি?

গামহার বলল, ঠিক জানি না। তবে মনে হয় কানখুসকি হবে। কান খোঁচাবার জিনিস। এই সাপের মতো বিষধর সাপ ওড়িশার বনে-পাহাড়ে খুব কমই আছে। কামড়ালে, সঙ্গে সঙ্গেই পটল তুলতে হবে।

বলেই বলল, চলো, এগোই আমরা।

কী করে বোঝা যায় কোন সাপ বিষধর আর কোন সাপ নয়?

যে সাপেরা এঁকেবেঁকে চলে তারাই সচরাচর বিষাক্ত হয়। তবে এসব আমার চেয়ে জারুল ভাল জানে।

ওতো প্রাণীতত্ত্বরই ছাত্রী ছিল। ডক্টরেটও করেছে।

পথটি যেখানে ডানদিকে বাঁক নিয়েছে সেখানে একটি মস্তবড় গাছ দাঁড়িয়ে আছে। তার কাণ্ডে অনেকগুলো ভাগ। যে-কোনোটার আড়ালেই কোনো প্রেমিক-প্রেমিকা বসে স্বচ্ছন্দে প্রেম করতে পারে। করলে, সামনের দিক ছাড়া অন্য কোনো দিক দিয়েই দেখা যাবে না তাদের। গাছটার ডালগুলো আশ্চর্য সমান্তরাল। দু'পাশে দু'হাত সটান ছড়িয়ে দিয়েছে সে। হাত শুধু মাত্র দুটি নয়। কিছু দূর বাদে বাদে বিভিন্ন উচ্চতাতে দু'দিকে দুটি করে ডাল সমান্তরালে ছড়িয়ে দিয়েছে সে। সেই ডালগুলি থেকে উপডাল যে বেরোয়নি তা নয়, তবে তারা খুব একটা বড় নয়। এখন গাছটি প্রায় পত্রশূন্য। সিঁদুরে লাল ফুলে ভরে আছে পত্রশূন্য ডালগুলি আর পথের উপরে এত সিঁদুরে-লাল ফুল পড়ে আছে যে মনে হয় গালিচা বিছানো আছে।

চিকু বলল, দ্যাখো গামহারদা। এই গাছেরই নাম হচ্ছে শিমুল। এ গাছ কলকাতাতেও অনেক আছে, এবং বসন্তে তাদের ডালে ডালে ফুল এমন করেই ফোটে, নীচেও ঝরে পড়ে, কিন্তু কলকাতার মানুষদের ফুল দেখার মন কই?

কলকাতাতে আছে না কি এই গাছ? সত্যি?

অনেকই আছে। এবারে দেখো। জানোতো, এই শিমুলের ফুল কোটরা হরিণেরা, মানে বার্কিং-ডিয়ারেরা খেতে খুব ভালবাসে। বেলা পড়লে সন্ধের আগে আগে এসে তারা খুব রেলিশ করে এই ফুল খায়।

এই Relish করা শব্দটির মানে জানো চিকু?

গামহার বলল।

কে না জানে! ক্লাস ফোর-এর ছেলেরাও জানে।

তোমাদের সময়ের ক্লাস ফোরের ছেলেরা হয়ত জানতো। এখনকার বাংলা-মিডিয়াম স্কুলের ছেলেরা জানে না সম্ভবত। আমাদের বাংলা মিডিয়াম স্কুলের মাস্টারমশাইই মানেটা বলেছিলেন। বলেছিলেন, ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে মেয়েদের পেছনে শিস দিতে দিতে যেতে যেমন লাগে, তাকেই বলে রেলিশ করা।

চিকু আর ঝাঁঝি হেসে উঠল।

গামহার বলল, আচ্ছা চিকু, ব্রতীন বলছিল যে, তোমার নামও নাকি একটি গাছের নামে। চিকরাসি। সে গাছ তো এখনও দেখালে না।

চিকু হাসলো। বলল, সে গাছ দেখতে হলে আমার সঙ্গে একবার সময় করে পশ্চিমবঙ্গের বক্সার জঙ্গলে যেতে হবে।

তারপরে বলল, তোমরা কেউ জিম করবেট-এর লেখা পড়েছ?

আমি পড়েছি।

ঝাঁঝি বলল।

My India পড়েছ?

পড়েছি।

বেশ করেছ। তাঁর মতো বড় ভারত-প্রেমিক আজকের দেশ-নেতাদের মধ্যেও খুব কমই আছেন। তাঁর ওই বইয়ে উত্তরপ্রদেশের ভাব্বার অঞ্চলের কথা তুমি নিশ্চয়ই পড়েছ।

পড়েছি বইকী।

বক্সার জঙ্গলও হচ্ছে ভাব্বার। পূর্ব-হিমালয়ের পাদদেশের। এইসব ভাব্বার অঞ্চলের নানা বিশেষত্ব আছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই যে, সেই অঞ্চলের নদীগুলি ভুটান পাহাড় থেকে সমতলে নেমে কিছুদূর যাওয়ার পরেই অন্তঃসলিলা হয়ে গেছে। উপরে ধূধূ বালি। অনেকই নীচে জল। বেশ কিছুদূর যাবার পরে আবার তাদের জলরাশি দৃশ্যমান হয়। যেখানে নদীগুলি উষর, সেখানের গাছেদের তাদের শিকড়গুলিকে বহুদূর অবধি নীচে নামিয়ে দিতে হয়। তাদের শিকড়গুলিকে বলে, Tap Roots. সুন্দরবনে আবার অন্য ব্যাপার। মানে, উল্টো ব্যাপার। চব্বিশ ঘণ্টায় চারবার জোয়ার ভাঁটার খেলা চলে সেখানে। তাই গাছেদের শিকড়েরা গাছের চারপাশে ঝোপের মতো হয়ে থাকে মাটিরই উপরে। ভাঁটির সময় যাতে যথেষ্ট হাওয়া ও রোদ পায়। সেই শিকড়দের বলে, Aerial Roots.

গামহার বলল, জানতে চাইলাম চিকরাসি গাছের কথা আর তুমি তো সাতকাণ্ড রামায়ণ শোনালে। আমরা কি বটানির ছাত্র?

ছিলে না। কিন্তু হতে ক্ষতি কি গামহারদা? শেখার কি কোনো সময়-অসময় আছে? যদি শেখার ইচ্ছেটা থাকে, তবে চিতায় ওঠার আগের মুহূর্ত অবধিও শিখে যেতে পারো। আমি তো তাই মনে করি। আর সত্যি বলতে কী, এইসব বিষয়ে যতই জানছি, যতই গভীরে যাচ্ছি, ততই দেখছি যে, কিছুই জানি না।

তারপর বলল, চিকরাসি গাছ তো ও অঞ্চলে হয় না। যে অঞ্চলের কথা বললাম সেই অঞ্চলেই হয়। তাই তোমাকে দেখাতে পারব না এখানে।

তোমার নাম দিল কে? অমন গাছের নামে?

আমার বড়মামা। তিনি আলিপুরদুয়ারের মস্ত ঠিকাদার ছিলেন। কাঠের ঠিকাদার।

মানে, বলতে কি পারি জঙ্গল-ধ্বংসকারী?

গামহার বলল।

না গামহারদা।

দৃঢ়তার সঙ্গে বলল চিকু।

তারপর বলল, ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত দেশে আইন-কানুন তবু কিছু ছিল। তখনও আমরা এমন একশ ভাগ স্বাধীন হয়ে নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়ুল মারিনি। তখন জঙ্গলও যথেষ্ট ছিল এবং বনবিভাগও যথেষ্ট সজাগ ছিল। দেশে গিনিপিগের মতো মানুষ বাড়েনি। তখন গাছকর্তন আর বনসৃজনের মধ্যে এক সুষম সামঞ্জস্য ছিল। দেশের জনসংখ্যা যদি সীমিত রাখতে পারতাম আমরা, এত খিদে না থাকতো, এত অশিক্ষা, তবে আজ দেশের চেহারাই অন্যরকম হতে পারতো।

গুলি মারো দেশকে। জঙ্গলে বেড়াতে নিয়ে এসেছো, এখন জঙ্গল চেনাও। দেশের কথা নেতারা ভাবুন গে।

নেতারা তো আমাদেরই মধ্যে থেকে আসে গামহারদা। আমরা যদি সারমেয় হই তো আমাদের নেতা বড় বাঘ হবে কোত্থেকে? দেশকে গুলি মারলে আজ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরে এই সিমলিপালের মতো বনেও কোনো গাছ আর থাকবে না গামহারদা। বন না থাকলে, আমরাও আর থাকবো না। তোমার আমার ঝাঁঝির মতো প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষেরই এ কথা হৃদয়ঙ্গম করার সময় এসেছে এবং যারা অশিক্ষিত তাদেরও প্রত্যেককে

একথা ভাল করে বোঝাবারও সময় হয়েছে। দেশকে "গুলি মারার" চিন্তা কোনো প্রকৃত শিক্ষিত মানুষের মনে আসা কিন্তু উচিত নয়।

সরি চিকু। আমার অন্যায় হয়েছে। তোমার আর জারুলের মতো প্রকৃতি-পাগল মানুষের আরও অনেকই প্রয়োজন এই মুহূর্তে।

প্রয়োজনটা বনের কারণে নয়, আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখারই কারণে গামহারদা।

গামহার ঠিক করলো আর কথা বলবে না। শুধু দেখবে দু'চোখ ভরে। এই আশ্চর্য সুন্দর বাসন্তী প্রকৃতির সব রং, রূপ, গন্ধ সে তার শিল্পীর চোখ দিয়ে নিংড়ে নেবে। আরও কিছুদূর গিয়ে পথটা যেখানে চড়াই-এর শেষে বেশ উঁচুতে পৌঁছেছে, সেখানে একটা বড় পাথরে ঝাঁঝিকে সামনে বসিয়ে ভাল করে দেখবে। পটভূমিতে থাকবে সেই আশ্চর্য কালো, আদিম অনন্ত গহ্বর। তার বুকের মধ্যে দিয়ে উৎসারিত-হওয়া জোরান্ডা ফলস, দূরের পাহাড়শ্রেণীর পর পাহাড়শ্রেণীর ছবি। সবুজের কত বিভিন্ন ছায়াতে আঁকা। আর সেই পটভূমিতে লাল, হলুদ, বেগুনি ও আরও কত মিশ্ররঙের বাহার। 'একলা বসে হেরো তোমার ছবি, এঁকেছি আজ বাসন্তি রঙ দিয়া, খোঁপার ফুলে একটা মধুলোভী মৌমাছি ওই গুঞ্জরে বন্দিয়া।'

নাঃ ছবিটা আঁকা শুরুই করা গেলো না।

গামহার বলল, মনে মনে।... বাগড়ার পর বাগড়া।

দেখতে দেখতে সেই উঁচু জায়গাটাতে পৌঁছে গেল ওরা আধঘণ্টার মধ্যে।

চিকু বলল, বসা যাক এখানে। কী বল গামহারদা? ঝাঁঝিরা বড় ধকল দিল এবারে আমাদের। কী বলো ঝাঁঝি? কলকাতা ফিরে একদিন ভাল করে খাদ্য-পানীয় হবে তো তোমাদের পুনর্জন্ম সেলিব্রেট করবার জন্যে?

আমি তো রোজগার করি না চিকুদা। তোমার 'চাড্ডাকান্টেন্ট' খাওয়াবে কিনা বলতে পারছি না। সে মহাকেপ্পন আছে।

তাই?

চিকু অপ্রতিভ হলো। কিন্তু ঝাঁঝি কথাটা বলল, Statement of Fact-এর মতো। একটুও অপ্রতিভ না হয়েই।

গামহার বলল, তাতে কী হলো। আমার বাড়িতে হবে পার্টি। নবেন্দুকেও ডাকব। সস্ত্রীক।

শুনলেন না আপনি? নবেন্দুর স্ত্রীর পেট তো কখনওই খালি থাকে না। সে সবসময়েই ফীজিকালি আনফিট, মেনটালি কীইড-আপ। আপনাদের 'চাড্ডাকান্টেন্ট'-এর অধিকাংশ বন্ধুই ওরকম।

কিন্তু নবেন্দু তো মনে হলো....

গামহার বলল।

কী মনে হলো?

তোমার প্রতি যথেষ্টই দুর্বল।

তাই? মনে হলো বুঝি? আমার তো মনে হচ্ছে আপনিও আমার প্রতি বিশেষ দুর্বল। এত দৌর্বল্য সামলানো কি আমার একার পক্ষে সম্ভব হবে? কলকাতাতে ফিরে দুর্বলদের সেবা-শুশ্রূষার জন্যে একটি নার্সিংহোম খুলতে হবে দেখছি।

চিকু ফিচিক করে হেসে গামহার-এর দিকে চেয়ে বলল, কেমন বুঝছ গামহারদা? ঝাঁঝিকে? এমন স্যাম্পল কি আগে পেয়েছ কখনও?

গামহার বলল, গলাটা একটু খাঁকরে নিয়ে, দ্যাখো চিকু, একজন আর্টিস্টের জীবনে কিছুই ফেলা যায় না। না। কোনো অভিজ্ঞতাই নয়। চুমু কিংবা লাথি সবই লেখকের বা শিল্পীর কোনো-না-কোনো কাজে লেগে যায়ই। আমি ঝাঁঝির কথাতে মনে করিনি কিছুই।

ঝাঁঝি মুখে কিছু না বলে স্থির চোখে গামহার-এর মুখের দিকে চেয়ে থাকল।

চিকু কথা ঘুরিয়ে বলল, গামহারদা তোমার মুখে রোদ পড়ছে। একটু পিছিয়ে বসো।

বলেই, কাঁধ থেকে রাক-স্যাকটা নামাল পাথরের উপরে।

এটা কি গাছ চিকু? যেটার নীচে আমরা বসে আছি?

এটা তিন্তিরি বৃক্ষ।

মানে?

ঝাঁঝি বলল, তেঁতুল। তিন্তিরি সংস্কৃত শব্দ। তাও জানেন না?

কী সুন্দর ছায়া দেখছ না? চিকু বলল।

তারপর বলল, নাও, বিয়ার খাও।

বিয়ার বয়ে এনেছো নিজে কাঁধে করে?

তা কী করি। পরের কাঁধ এখানে পাই কোথায়? এতো বড় নামী আর্টিস্টকে সঙ্গে করে এনেছি, খাতির তো একটু করতে হয়ই! ফিরে গিয়ে, এই জোরাভার একটি ছবি আমাকে এঁকে দিও তো গামহারদা।

দেব। কিন্তু স্যুরিয়ালিস্ট ছবি।

তুমি যা আঁকবে তাই নেব।

ঝাঁঝি, তুমি খাবে তো?

শ্যান্ডি করে খেলে ভাল হতো। চিকুদা, তোমার মতো আর গামহারদার মতো কম্পানির জন্যেই খাব। আমি এমনিতেও খাইনা। কিন্তু....

কোনো কিন্তু-টিন্তু নয়। এই গরম, শরীরকে খুবই ডি-হাইড্রেট করে। সন্ধে নামলেই দেখবে আবার কেমন শীত লাগবে।

জীবনে কখনও বোতল থেকে বিয়ার খাইনি। খারাপ মেয়েরা কি এমন করেই খায়?

হেসে ফেলল চিকু।

জানো, তুমি যদি আমার আগে মরো, তাহলে তোমার কঙ্কালটি আমি যাদুঘরে তিমিমাছের কঙ্কালের পাশে ঝুলিয়ে রাখব। তুমি সত্যি বিধাতার এক আশ্চর্য সৃষ্টি। নাও। খুলে দিলাম তোমারটাও।

বলেই, বটল ওপেনার দিয়ে বিয়ারের বোতলটা খুলে দিল। গামহারকেও দিল। নিজেও নিল একটা। তারপর বলল, জঙ্গলে আর গ্লাস-টাস কোথায় পাওয়া যায়! হুইস্কির বোতল থেকেও খেয়ে অভ্যস্ত আমরা। এখানে কাট-গ্লাস এর গেলাস দেখবে কে বলো! ওসবের অধিকাংশই তো প্রয়োজনের জন্যে নয়, দেখাবারই জন্যে। আদিবাসীরা তো মহুয়া বা হাঁড়িয়া খায় শালপাতার দোনাতে করে। তাতে কি তাদের নেশা কিছু কম হয় গামহারদা? বাহ্য আড়ম্বর ছাড়ার শিক্ষা তাদের কাছ থেকে দেখে যতখানি পেয়েছি ততখানি আর কোনো কিছু থেকেই পাইনি। বিয়ারে চুমুক দাও। হাওয়া চলতে শুরু করেছে বনে বনে

এখন। সেই হাওয়ার সওয়ার হয়ে শুকনো পাতারই মতো পেরিয়ে যাও পাহাড়ের পর পাহাড়, সংস্কারের পর সংস্কার, দেখবে তোমার আবারও মায়ের গর্ভে ফিরে গিয়ে নতুন করে জন্মাতে ইচ্ছে করবে। তুমি যে এই দেশে জন্মেছো, এই দেশে বড় হয়েছ, সে জন্যে তোমার গর্ব হবে।

তারপর বলল, গর্ব যেমন হবে, দুঃখও হবে। এমন সুন্দর একটা দেশের অযোগ্য সন্তান আমরা, এ কথা বুঝতে পেরে।

ওরা সকলে চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। আর চুপ করতেই এই শেষ বসন্তের সকালের বন বাঙ্ময় হলো। কত ফিস-ফিস, কত কিস-কিস, কত ঝির-ঝির, ঝর-ঝর। তারই মধ্যে উপত্যকা থেকে পাগলের মতো পিউ-কাঁহা ডাকতে লাগল, ক্রো-ফেজেন্ট ডাকতে লাগল পাহাড়ের উপরের ঘন বনের ছায়াছন্ন গভীর থেকে ঢাব-ঢাব-ঢাব-ঢাব করে।

ওটা কি পাখি?

রসভঙ্গ করে কথা বলল গামহার।

চিকু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইসারাতে বলল, পরে বলব।

পাহাড়ের উপর থেকে ময়ূরও ডেকে উঠল কেঁয়া-কেঁয়া করে। এই ডাকটা চেনে গামহার। কারণ সিংহীদের বাড়িতে এক জোড়া ময়ূর ছিল।

একটা বড় নীল কাঁচপোকা বুঁ-বুঁ-বুঁই করে উড়ে উড়ে ওদের মাথার উপরে ঘুরতে লাগল। আহা! গামহার বলল না বলে, 'আমার বনে বনে ধরল মুকুল, বহে মনে মনে দক্ষিণ হাওয়া'। পথের লাল ধুলো-ওড়ানো দমক দমক হাওয়াতে মহুল ফুলের গন্ধ ভেসে আসতে লাগল আরও নানা ফুল-পাতার মিশ্র গন্ধের সঙ্গে। গামহার সামনের আদিগন্ত বিস্তৃত বাসন্তী প্রকৃতির ফ্রেমের দিকে চেয়ে সেই ফ্রেমের কেন্দ্রবিন্দুতে কালো পাথরের উপরে মেরুন জমির উপর ছোট ছোট সাদা বুটির শাড়িপরা ঝাঁঝিকে বসিয়ে আদিগন্ত রঙের দাঙ্গা-লাগা পাহাড় শ্রেণীর দিকে নিশ্চুপে চেয়ে রইল আর চিকুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল ওর মন। বিয়ারের মুখখোলা বোতলের মধ্যে হাওয়া ঢুকে সিঁসিঁ করে বাঁশি বাজতে লাগল নিচু-গ্রামে। কত কী বিস্ময়ই যে বাকি ছিল।

ভাবছিল, গামহার।

অথচ সব হাতের নাগালের মধ্যেই ছিল। সকলেই জানে যে, জীবন একটামাত্র। অথচ চিকুকে ছাড়া আর কারোকেই দেখল না যে, সমাজের মুখে থুথু দিয়ে সেই জীবনকে নিজের করতলগত করে তা নিয়ে রঙিন কর্বুর মার্বল-এর মতো খেলতে। শুধুমাত্র এই কারণেই তার চেয়ে বয়সে অনেকই ছোট চিকুকে ও শ্রদ্ধা করে।

অনেকক্ষণ পরে কথা বলল চিকু।

কেমন লাগছে, গামহারদা?

গামহার হেসে বলল, চিত্ত আমার হারালো। নিজের ভাষায়, কিছু বলি, সে সাধ্য কি আমার? বিপদে পড়লেই তাই দাড়িওয়ালা বুড়োকে ধরি।

তারপর বলল, এবারে বলো, কী পাখি ডাকছিল ওটা? এখনও তো ডাকছেই পাহাড়ের গা থেকে।

ওটারই ইংরেজী নাম ক্রো-ফেজেন্ট। বাদামী আর কালো মস্ত বড় লেজওয়ালা পাখি। তুমি বাংলার গ্রামে-গ্রামেও দেখতে পাবে এ পাখি, যেখানেই গাছ-গাছালি এখনও আছে।

ডাহুক আর এই পাখি, পান-পায়রা, জল-পিপি এদের তো প্রায় সব জায়গাতেই দেখা যায়। তবে এই পাখিটি জলের পাখি নয়, পান-পায়রা বা জল-পিপির মতো। ডাহুকও উভচর। এদের এখানকার নাম কুন্তাটুয়া।

কী বললে?

কুন্তাটুয়া। ওড়িয়াতে বলে।

কী সুন্দর নাম, না?

আর আমরা যে পাথরের মস্ত চাঁইটির উপরে বসে আছি, সেটি কী পাথর? জানো?

তুমি কি পাথরও চেনো?

আমি কিছুই চিনি-জানি না গামহারদা। তোমার মতো আর্টিস্ট তো নই যে হৃদয়ের কারবারী হব। তাই পাথর-টাথর চেনার চেষ্টা করি। তবে এই সবে জানতে আরম্ভ করেছি। কতরকম পাথর আছে। ল্যাটারাইট, গ্রানাইট, ব্যাসাল্ট, ভলকানিক, স্যান্ডস্টোন, মার্বল, সিস্ট, লাইমস্টোন, স্লেটস। এই পাথরটি ল্যাটারাইট। জানব কী করে বলো? পড়াশুনো কি আর করেছি তেমন? আর এখন তো সফ্টওয়্যারের আর কম্প্যুটারের চক্করে পড়ে, নিজেই হার্ডওয়্যার হয়ে গেছি। রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারার 'নমোঃ যন্ত্র নমোঃ যন্ত্র নমোঃ যন্ত্র নমোঃ' করছি। তবে একটা সময় আসছে গামহারদা, শিগগিরই আসছে, যখন মানুষের মনুষ্যত্বকেই এই যন্ত্রের দুনিয়া গ্রাস করে ফেলবে।

হয়ত বলেছ ঠিকই চিকু, মানুষ চাপা পড়ে মরবে তার কৃতিত্ব আর অহমিকার ভারে। নিশ্চিত মরবে। তখন আমি-তুমি হয়ত বেঁচে থাকব না।

তাই তো বলি, গামহারদা, ঝাঁঝি, তোমাদের সকলকেই বলি, বাঁচো বাঁচো দারুণভাবে বাঁচো। প্রতিটি মুহূর্ত বাঁচো। তুমি যেমন করে বাঁচতে চাও তোমার মতো করে। তেমন করে বাঁচো। ভয় কোরো না, দ্বিধা কোরো না।

সবকিছুই এখন যেমন সংখ্যাতে হচ্ছে মানুষের পরিচয়ও তেমন হয়ে যাবে একদিন হয়ত সংখ্যাতেই। রক্তকরবীর রাজার মতো কেউ সুপারকম্পুট্যারের ঘরে বসে চোখের আড়াল থেকে আমাদের চালাবে। গামহার ঘোষ হবে হয়ত ১৭৩৭০০৫৪০০৮২ নং, ঝাঁঝি হয়ত হবে ৯৯৪৪৯৯৬৬২২।

আর তুমি?

ঈশ্বরই জানেন! আমি হয়ত হব ০০০০০০০০১। কে বলতে পারে? এই যন্ত্রদানব সবই গ্রাস করে ফেলবে। জনগণায়ন সম্পূর্ণ হবে। ব্যক্তি থাকবে না। ব্যক্তি-স্বাধীনতা থাকবে না আর।

তা হয়ত গ্রাস করে ফেলবে কিন্তু তারও পরে একটা সময় আসবে যখন মুক্তধারার ধনঞ্জয় বৈরাগীরই জয় হবে। ধনঞ্জয় বৈরাগী এই গান গাইতে গাইতে দিগন্তে মিলিয়ে যাবেন, 'তোর শিকল আমায় বিকল করবে না। তোর মারে মরম মরবে না।। তাঁর আপন হাতের ছাড় চিঠি সেই যে / তোর মনের ভিতর রয়েছে এই যে, তোদের ধরা আমায় ধরবে না। তোর শিকল আমায় বিকল করবে না।"

এমন সময়ে একটা গাড়ির এঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেল।

চিকু বলল, ওই যে এসে গেল।

আমাদের সব আনন্দ মাটি হল। গামহার বলল।

ঝাঁঝিকে বলল চিকু, মুখে ঝগড়া করলে কী হয়। প্রেম তো দেখছি অতি গভীর। হারিত তো দেখছি তোমার বিরহ একেবারেই সহ্য করতে পারে না।

হুঁ। ভাবছ তাই! আসলে দেখতে এসেছে তুমি বে-আক্কেলের মতো আমাকে একা গামহারদার সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছ, না সঙ্গে সঙ্গে থেকে পাহারা দিচ্ছ।

গামহার বলল, জারুলও তো তাই ভাবতে পারে। আমি চিকুর হাতে তোমাকে ছেড়েই দিলাম না পাহারায় আছি।

ভাবুন ভাবুন গামহারদা। যা খুশি ভাবুন। আমি আর জারুল তো বাঁধনহীন। আমাদের ভয় তো কিছুই নেই। তারও নেই, আমারও নেই। ভয় ঝাঁঝির, ভয় হারিতের, ভয় বছর-বিয়ানি হরিমতির স্বামী শ্রীমান নবেন্দুবাবুর।

গাড়িটা এসে গেল পেছনে লাল ধুলো, ঝরা-ফুল ঝরা-পাতা উড়িয়ে। পেছনে পেছনে ওদের তাড়া করে এলো একঝাঁক টিয়া। তারপর জলপাই-সবুজ মিগ-প্লেনেরই মতো নীলাকাশকে বিদ্ধ করে সকলের মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল গিরিখাতের গহ্বর পেরিয়ে অন্য কোনো গাঢ়তর সবুজ পাহাড়ের বুকের কোরকে।

গাড়ি থেকে নেমেই নবেন্দু বলল, হাউ মীন অফ উ্য অল! তোমরা আমাদের ফেলে বিয়ার খাচ্ছ? আর আমরা তোমাদের বিয়ার খাবার জন্যেই ডাকতে এলাম! একা একা খাব না বলে!

হাউ গ্রেশাস অফ উ্য!

ঝাঁঝি বলল।

তারপর যোগ করল, দো, ফর আ চেঞ্জ।

এত হট্টগোল ভাল লাগছিল না গামহার-এর। বিয়ার খেতে খেতে ঝাঁঝির দিকে অপলকে চেয়ে থাকতে থাকতে ছবিটার কথা ভাবছিল। মনে মনে তার সদ্যরচিত কবিতাটা আবৃত্তি করল :

যতবার আঁকলাম, মুছলাম তার চেয়ে বেশি।
চোখ চিবুক চুল সবই মিলল হুবহু,
মিলল না শুধু সেই ভাবনাটুকু!
কবে যেন চুরি হয়ে গেছে।

চিকু গামহারকে চমকে দিয়ে বলল, সকলে তো গাড়িতে আঁটব না।

আঁটব না কেন? একটু চাপাচাপি করে গেলেই হবে। মাত্র তো ছ'জনই আমরা। এতটুকু পথ। এ-ওর কোলে বসে গেলেই হবে।

'যদি হয় সুজন তেঁতুলপাতায় নজন।'

নবেন্দু বলল।

নবেন্দুর কোলে ঝাঁঝি বসলে চাড্ডাকাস্টেট' হারিতের আপত্তি হবে না তো?

হারিত সিগারেটের টুকরোটা জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলে বলল, বিন্দুমাত্রও নয়। কেউ যদি চিরদিনের জন্যেও নিয়ে যেতে চায়, তো তাকে একটি গাড়ি প্রেজেন্ট করব।

ঝাঁঝি বলল, তার আগে নিজের গাড়িটি রিপ্লেস করো। গাড়ির শোকে তো দু'চোখের পাতা এক করতেই পারছ না।

চিকু বলল, তার আগে হারিত তুমি গিয়ে সিগারেটের টুকরোটাকে ভাল করে নিভিয়ে দিয়ে এসো। তোমরা শিক্ষিত মানুষ হয়ে যদি এমন করো! তুমি কি জানো তোমার এই অবহেলাতে ছুঁড়ে ফেলা সিগারেটটির জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকার জঙ্গল পুড়ে যেতে পারত।

টাকাটার কথাই মনে হলো তোমার শুধু চিকু! আর সৌন্দর্য। কত জঙ্গল যে ধ্বংস হয়ে যেতো। ধ্বংস হতো আমাদের ভবিষ্যতের এক টুকরো।

জারুল বলল।

সৌন্দর্যের কথা? তোমার মতো সকলে যে সৌন্দর্য বোঝে না জারুল। তাই যা সকলে সহজে বোঝে তাইতো বললাম। টাকার অঙ্ক দিয়ে ক্ষতির পরিমাণ বোঝাতে হয়। এমন করে বোঝালে সকলের পক্ষেই বোধগম্য হয়। কী দুর্ভাগ্য!

নবেন্দু বলল, ফিলিম ডিরেকটরের মতো, চলো চলো, লেটস প্যাক-আপ। রান্না হয়ে যাবে আর একঘণ্টার মধ্যে। চলো তার আগে একটু বু-উ-জ্ হোক, মুখে স্বাদ হবে। তারপর ঘুমোব ভাল করে। আজ চাঁদনি রাত এখানেই সেলিব্রেট করতে হবে। ঝাঁঝির পুনর্জন্ম। খুব ড্রিঙ্ক করব আজকে।

গামহার বলল, শুধু ঝাঁঝিরই কেন? হারিতের নয় কেন? মনে হচ্ছে, হারিত ফওত হয়ে গেলে তুমি খুশি হতে নবেন্দু।

একি গামহার দা! আপনিও আমার পেছনে...

চিকু বলল, আমরা এখান থেকে যাব একটু বসন্ত-বন্দনার পরে।

তার মানে?

তার মানে গামহারদা এখানে এই শিলাসনে এসে আমাদের একটি বসন্তর গান শোনাবে।

কী গান?

নবেন্দু বলল, 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে।'

চিকু বলল এক্সকিউজ মি, উইথ অল রেসপেক্টস টু রবীন্দ্রনাথ এই গানটি এত বেশি গাওয়া হয়ে গেছে যে 'ক্লিশে', হয়ে গেছে। তুমি বসন্ত-বন্দনার অন্য কোনো গান শোনাও আমাদের গামহারদা।

গামহার বলল, একটা গান মনে এল বটে কিন্তু গাইতে ভয় করছে।

কেন? কিসের ভয়?

এ গানটি দীপালিদির রেকর্ড আছে।

কোন দীপালি দি?

আরে দীপালি নাগ চৌধুরী।

ও। তিনি তো বহতই বড় গাইয়ে। সত্যি! আর কী সুরেলা গলা। আজকাল তো এত গাইয়ে উঠেছে কিন্তু পুরো সুর ক'জনের গলায় লাগে বলত? তবে আমাদের কারো সঙ্গেই তো আলাপ নেই দীপালিদির। উনি জানবেন কোত্থেকে, তুমি যদি ভুলও গাও। আর ভুল গাইলে আমাদের মধ্যেই বা কে এমন তালেবর আছে যে, সে ভুল ধরতে পারবে?

আচ্ছা! এই 'তালেবর' শব্দটির বুৎপত্তি কেউ জানো?

গামহার বলল।

হারিত বলল, আমি জানি।

কি?

তালের বড়া।

ওরা সকলেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

তারপর চিকু বলল, সেটা কথা নয়। অদৃশ্য পাহারাদার তো একজন থাকেই সবসময়ে, সব জায়গায়।

সে কে?

বিবেক।

গুলি মারো।

সেটাই তো মুশকিল। যাদের ঐ বস্তুটি আছে তাদের পক্ষে নিজে হাতে তাকে মারা বড়ই কঠিন।

নাঃ। বড় ভারী সব ডিসকাশন হচ্ছে। আমার মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। গানটা যদি গাইতে হয় তবে গেয়ে ফেলুন গামহারদা। মিছে বেলা বাড়ছে। চানও হয়নি কারোরই।

আমাদের হয়ে গেছে। তোমরা করে নেবে।

গামহার একটু কেশে গলাটা ছাড়িয়ে নিয়ে ধরে দিল, 'মধুবসন্ত আজি এল ফিরিয়া. অনুরাগ রঙে রঙিল হিয়া...।

চম্পক বনে আজি পীক কুহরে/চঞ্চল তনুমন পুলকে শিহরে/ভ্রমর ভ্রমরী সনে ফেরে গাহিয়া/মধুবসন্ত আজি এল ফিরিয়া।

অশোকের মঞ্জরী গুঞ্জরে বনে/পলাশের কুমকুম ঝরে ক্ষণে ক্ষণে/চন্দন তরুগণ গন্ধে উতলা/চন্দ্রিমা লয়ে বুকে নিশীথ উজলা/বনমৃগ ফেরে কারে খুঁজিয়া/এল ফিরিয়া/মধুবসন্ত আজি এল ফিরিয়া।'

আহা। আহা। করে উঠল সকলেই।

এটা কি বাহার?

নবেন্দু বলল।

না। এটা বসন্ত্।

চিকু বলল, এই গানটা চাঁদ উঠলে জোরান্ডা বাংলোর ওই বসার জায়গাটার নীচে বসেই গাইতে গামহারদা। দিনমানে গেয়ে গানটার প্রতি অন্যায় করলে তুমি।

জারুল বলল, অধিকন্তু ন দোষায়ঃ। তাতে কি? রাতের বেলা আবার হবেখন।

নবেন্দু বলল, আবারও বলল, গামহারদা আপনি কি ঠিক জানেন যে এটা বসন্ত্। বাহার নয়?

আমারও কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে।

হারিত বলল।

ঝাঁঝি সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করল হারিতকে। তুমি তো 'চাড্ডাকান্টেন্ট'। গানের তো গ'ও জানো না। তোমারও কি বন্ধুর দেখাদেখি মাতব্বরী না করলেই চলছে না! অন্ধ এলেন ল্যাংড়াকে পথ দেখাতে। বাহারে আর বসন্ত্-এ কি কি পর্দা লাগে বলো তো?

আঃ। তুমি বড় পার্সোনাল অ্যাটাক করো ঝাঁঝি।

নবেন্দু বলল।

বাঃ। চাড্ডাকান্টেন্ট কি গামহারদাকে ইমপার্সোনাল অ্যাটাক করল?

চিকু মধ্যে পড়ে বলল, এসব থামাও, আমি একটা জেনুইন ইমপার্সোনাল গল্প বলছি। গল্পটাও জেনুইন এবং জেনুইনলি ইমপার্সোনাল। এই রাগ-রাগিনী সম্বন্ধেই।

কি? তাড়াতাড়ি বলো।

হারিত বলল।

চিকু বলল, তুমি যখন ঝাঁঝিকে আদর করো তখনও কি এমন তাড়াতাড়ি করার ফরমান জারি করো নাকি?

ঝাঁঝি কথা না বলে অন্যদিকে চেয়ে রইল।

হারিত বলল, নষ্ট করার মতো অতো সময় থাকে না আমার হাতে কখনই।

চলো। ফিরে যেতে যেতে গাড়িতেই শুনব। তোমাদের তো চান হয়ে গেছে। আমাদের তো চান করতে হবে। আর দেরী করা ঠিক হবে না এখানে।

চলো।

নবেন্দু বলে, স্টিয়ারিং-এ গিয়ে বসলো।

বেশ করেছে কিন্তু "উনো" গাড়িগুলো। না?

চিকু বলল।

হ্যাঁ। বেশ জায়গা আছে।

চিকু বলল, গামহারদা তুমি সামনে বসো। আমরা চারজনে পেছনে চাপাচাপি করে বসে যাব।

নবেন্দু বলল, নো প্রবলেম। দুটি কাপল। যে যার বউকে চাপো।

নবেন্দু ওর ফিয়াট উনো গাড়িটাকে ঘুরিয়ে নিল। তারপর গিয়ারে ফেলে, গাড়িটাকে উৎরাইয়ে গড়িয়ে দিয়েই বলল, বলো চিকু। কী গল্প বলছিলে বলবে।

হ্যাঁ। লক্ষ্ণৌতে এক রহিস বাঙালির বাড়িতে কলকাতা থেকে একজন নামী বাঙালি সরোদিয়া গেছেন বাজাতে। বাড়ির সামনের মস্ত লন-এ শ্রোতাদের গায়ে আতর আর গোলাপ জল ছিটিয়ে তো মেহফিল আরম্ভ হয়েছে। লক্ষ্ণৌর তাবৎ বাঙালি-অবাঙালি সমঝদার আর রহিস আদমীরা সব শুনতে এসেছেন গান। পাহাড়ী সান্যাল, তখন ওখানে ছিলেন, কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায়...

তিনি কে?

আরে ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে।

কেন? তুমি তার 'কুদরত রঙ্গি-বিরঙ্গী' পড়োনি নাকি? অমিয়নাথ সান্যালের 'স্মৃতির অতলের' পরে এমন সেন্স অফ হিউমার বড় একটা দেখিনি সাহিত্যে এই বিষয়ে।

সমঝদারী আর রহিসীর মধ্যে কি বিরোধ আছে কোনো?

গামহার বলল।

চিকু বলল, বিলক্ষণ আছে গামহারদা। সমঝদার হয়েও কেউ রহিস নাও হতে পারেন আবার রহিস হয়েও অধিকাংশই সমঝদার হন না। কিন্তু রহিসীর অনেক দায়-দায়িত্বও থাকে। সৎসঙ্গে, ভাল মেহফিলে নিমন্ত্রিত হলে তাঁদের দু-পাঁচলাখি শাল গায়ে চড়িয়ে সেইসব অকুস্থলে যেতেই হয়, কিছু বুঝুন আর নাই বুঝুন। যেতে হয়, নইলে রহিসীর বে-ইজ্জৎ হয়।

বহত খুব।

বলল, গামহার।

এবার গল্পটা বলো।

তা উস্তাদ অথবা পণ্ডিত তো দু'ঘণ্টা বাজালেন। লাজোয়াব বাজনা।

কী রাগ বাজালেন? ঝাঁঝি জিগ্গেস করল।

বলছি। বলছি।

মুসাম্বির রস-এর সঙ্গে উদার হাতে জিন মিশিয়ে সকলকে দেওয়া হয়েছে বাজনার আগে এবং মধ্যেও। রুপোর তবকমোড়া পান, সঙ্গে ডমদা জর্দা। গৃহকর্তা যেহেতু বাঙালি, তাই কলকাতা থেকে তাঁর শ্বশুরালয়ের কিছু মানুষও এসেছিলেন। তাঁদেরই মধ্যে গৃহকর্তার দুজন চাড্ডাকানটেন্ট শ্যালকের পুত্র এবং তাদের এক সতীর্থও ছিল। গান-বাজনার ব্যাপারে তাদের তেমন জ্ঞান ছিল না। প্রথম সারিতে বসে যে বিপুল উৎসাহে রথী-মহারথীদের সঙ্গে মাথা নেড়ে কেয়াবাত কেয়াবাত বলতে বলতে, আঙুল উঁচিয়ে তারা সম যেভাবে দেখাচ্ছিল তা দেখেই ঐ ধারণা হয়েছিল আমার।

বাজনা শেষ হতেই তো সাব্বাস! কেয়া বাত্ কেয়া বাত্! মশহুর বাজাইয়া, আপ কি উমর লম্বী হো ; ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি সাধুবাদের ফুল উড়ছে চারদিকে। এমন সময়ে কলকাতার শালাবাবুর ছোঁড়ারা বাজিয়ের কাছে এসে বললো, কী যে বাজালেন দাদা। জুতো। জুতো। একেবারে জুতো।

বাজিয়ে তো লক্ষ্মৌ শহরে এসে এমন বদ্তমিজ ছেলে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না।

আবারো যখন তারিফের ফুলঝুরি ফুটতে শুরু করল, বিনয়ী শিল্পী তাতে আরও একটু সংকুচিত হয়ে গেলেন।

তখন কলকাতার সমঝদারদের মধ্যে একটি ছেলে বললে, পণ্ডিতজী এবারে একটু চন্দ্রকোষ শোনাবেন না আমাদের?

বাজিয়ে চমকে উঠলেন। তারপর কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থেকে বিনয়কে ফাটা-ফুটো শালের মতো ছুঁড়ে ফেলে বললেন, তাহলে এই পুরো দু'ঘণ্টা কি আমি আপনাদের অণ্ডকোষই বাজাচ্ছিলাম?



দুপুরে খেতে খেতে প্রায় চারটে বাজল। তারপর সকলেই শুয়ে পড়ল। রাতে চাঁদের আলোতে জঙ্গলের রূপ দেখবে। আজ সম্ভবত ত্রয়োদশী।

বাসন্তী পূর্ণিমাতে নাকি বনে পাহাড়ে ঠাণ্ডা থাকার জন্যে চাঁদের রূপ তত উপভোগ করা যায় না। কুয়াশাও থাকে নাকি। তাই চৈত্র বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠর পূর্ণিমাই নাকি সবচেয়ে সুন্দর লাগে জঙ্গল পাহাড়ে। সুন্দর লাগে বর্ষার পূর্ণিমাও যদি অবশ্য আকাশ পরিষ্কার থাকে। তখন আবার বনের অন্য রূপ। বর্ষণসিক্ত-বনের উপরে প্রতিসরিত জ্যোৎস্নাতে চোখ ধেঁধেঁ যায়। তবে সবচেয়ে মোহিনী রূপ কোজাগরী পূর্ণিমাতে। জারুল বলছিল।

নির্মেঘ চাঁদভাসি আকাশে অগণ্য তারাদের সঙ্গে কৃত্রিম উপগ্রহও দেখা যায় এই সব নির্মল পরিবেশের আকাশে। তারারই মতো। তারাদের চেয়ে অনেকই কাছে থাকাতে তাদের পরিক্রমাটা চোখে পড়ে। যদিও অতি ধীরগতিতে তারা পরিক্রমা করে যায় আমাদের এই ভালবাসার পৃথিবীকে।

খেতে খেতেই বাইরে মানুষের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। গামহার উৎকর্ণ হলো। চিকু বলল, ওরা বাথুরী সমাজের লোক। সমতল থেকে পায়ে হেঁটে এসেছে। পুজো দেবে কাল রাতে।

কীসের পুজো?

বড়াম দেব-এর। ওদের দেবতা। সারা বছর যেন ওরা বাঘ, ভাল্লুক, হাতি, সাপ, শম্বর, হরিণ, শুয়োর, খরগোস, টিয়া ও আরও অগণ্য পাখিদের হাত থেকে ওদের নিজেদের এবং ফসল রক্ষা করতে পারে, সেইজন্যে।

গামহার বলল, খেয়ে উঠে আমি ওদের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি? আমি তো একটু-একটু ওড়িয়া বলতে পারি...

চিকু হেসে বলল, হউ! মু জানিচি যে তমে টিক্কে টিক্কে ওড়িয়া কহ পারুচি।

গামহার বুঝলো যে নবেন্দু ভাল ওড়িয়া জানে। চিকু বলল, ওদের ব্যবসাতে অনেক ওড়িয়া প্লাম্বারদের সঙ্গেও কাজ করতে হয়। নবেন্দুর কান আছে, শিখে নিয়েছে ভাষাটা।

তা ঠিক। গান আর ভাষাতে কান খুব বড় ব্যাপার। কিন্তু তুমি যেটুকু ওড়িয়া কুমুদিনীর দৌলতে শিখেছিলে তাতে তো পুলিশ বশ হলো না। এরা কি বশ হবে? তোমাকে উদ্ধার করে আনতে আবারও অর্থদণ্ড লাগবে না তো? দেখো।

চিকু বলল।

গামহার লজ্জা পেল। তারপর বলল, পুলিশের কথা আলাদা। ওড়িয়াতে একটি দ্বিপদী আছে, "মাছু খাইবি ভাকুর, ঘইতা কইবি ডাইভর। মাছু খাইবি ইলিশী ঘইতা কইবি পুলিসী।"

ওরা সমস্বরে জিগ্গেস করল, মানে কি হলো?

মানে হলো, যদি বোয়াল মাছ খেতে চাও তো ট্রাক ড্রাইভারকে বিয়ে কর। আর যদি ইলিশ মাছ খেতে চাও তো বিয়ে কর পুলিশকে। মানে আর কী! বিস্তর ঘুষ না খেলেই ইলিশ মাছ খাবে কী করে। তারপর বলল কুমুদিনীর কাছে শুনেছিলাম।

বলতেই, ঝাঁঝি বলল, কুমুদিনী কে?

জারুল বলল, ভয় নেই ঝাঁঝি, তোমার বা আমার। কুমুদিনী গামহারদার প্রথম যৌবনের ওড়িয়া প্রেমিকা যার সঙ্গে বিয়ে হয়নি গামহারদার। আমরা, যারা গামহারদার অ্যাডমায়রার, তারা আপাতত নির্বিঘ্ন।

বিয়ে হয়নি বলেই তো প্রেম উজ্জ্বল আছে।

গবগব করে হারিত বললো।

ঝাঁঝি বলল, আরে! কী কহিল কানু?

জারুলও হাসতে হাসতে বলল আরও ঠাট্টা করে বলো 'চাড্ডাকান্টেন্ট।' রস কি কম আছে হারিতের ঝাঁঝি? এ তো দেখছি মৌচাক। তুমিই ঠিকমতো কৌশল করে ধুঁয়ো দিয়ে মধু নিংড়োতে পারোনি দেখা যাচ্ছে।

তুমিই নিংড়ে নাও না ভাই। একটা খল-নোড়া দোব কি? সঙ্গে মকরধ্বজও আছে। সেই রস নিংড়ে চাড্ডাকান্টেন্টকে মকরধ্বজ দিয়ে মেড়ে খেয়ে ফেলো। নিপাতনে সিদ্ধ হবে।

খুব হাসাহাসি হলো একচোট।

গামহার-এর মনে হলো, হারিত ছেলেটা ভাল। রসিকও খুব। কিন্তু বহিরঙ্গে একটু বেরসিক। জারুল ঠিকই বলেছে। বহিরঙ্গে ও মৌচাক নয়, হর্স-চেস্টনাট। হাতুড়ি ছাড়া ভাঙা মুশকিল।

ওরা যখন খাওয়া-দাওয়ার পরে লম্বা ঘুম লাগাবে বলে শুলো তখন গামহার গুটি-গুটি গেট পেরিয়ে বাংলোর হাতার বাইরে এসে দেখলো জঙ্গলের এখানে ওখানে প্লাসটিকের শিট, ত্রিপল, চাদর ইত্যাদি সুতলি দিয়ে গাছের ডালের সঙ্গে বেঁধে রাতে শোওয়ার বন্দোবস্ত করছে বাথুরী সমাজের লোকেরা। রান্না-বান্নার বন্দোবস্তও করছে পাথর-সাজিয়ে উনুন করে জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ-কুটো পাতা-পুতা কুড়িয়ে এনে।

ওদের একজনের সঙ্গে কথা বলতেই সে গামহারকে তাদের রাজার কাছে নিয়ে গেল। বাথুরী সমাজের রাজা। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, রোগা একজন সাধারণ মানুষ। পরনে একটি কোরা ধুতি। অর্ধেকটা নিম্নাঙ্গে পরা, অন্য অর্ধেকটা গায়ে জড়ানো। খালি পা। কোনো গুমোর নেই রাজা বলে।

তিনি একটা বড় পাথরের উপরে বসেছিলেন। তাঁর পাশে বসে গামহার তাঁর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। তার আগে, মাথা নিচু করে বিনয়ের সঙ্গে 'নমস্কার আইজ্ঞাঁ' বলে নমস্কারও করল।

পশ্চিমের আকাশে লালের ছোপ লেগেছে। পাহাড়ের পর পাহাড়ের প্রাচীর ঘেরা হাজার হাজার হাতির এবং অন্যসব জানোয়ারের বাসভূমি এই সিমলিপাল অভয়ারণ্যের

পর্ণমোচী বনের পাতা-খসার দিনে চিকু তাকে যে কী এক উপঢৌকন দিল তার মূল্যায়ন করা গামহার-এর পক্ষে সম্ভব নয়। কলকাতাতেই চিকু আর জারুলের মুখে শুনেছিল যে, এই সিমলিপাল অভয়ারণ্যের বিস্তৃতি নাকি পৌনে তিনহাজার বর্গ কিমি। তার কতটুকুই বা তারা দেখল বা অন্য ভ্রমণার্থীরাও দেখতে পারেন। এই সমস্ত বনপাহাড়ই একসময়ে ছিল ময়ূরভঞ্জের রাজার শিকারভূমি। অন্য কারো শিকার করার অনুমতি ছিল না এখানে। তবে রাজার নিজের অতিথিদের কথা আলাদা। সেইসব সৌভাগ্যবানেরাই হয়তো দেখে থাকবেন এই বিশাল পাহাড়বেষ্টিত বনরাজিনীলার আনাচ-কানাচ। বাইশশ থেকে প্রায় তিনহাজার ফিট উঁচু এখানের এই পাহাড়গুলি। মানে, সাতশ পঞ্চাশ মিটার থেকে প্রায় সাড়ে ন'শ মিটার পর্যন্ত। এখানকার বন-বাংলোগুলির নাম শুনলেই বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে মাদল বেজে ওঠে। আশ্চর্য! ভাবছিল, গামহার। দর্শনের আনন্দ, শ্রবণের আনন্দ, স্পর্শন, ঘর্ষণ সবকিছুরই আলাদা আলাদা আনন্দ আছে কিন্তু কোনো অদেখা জায়গার বা ব্যক্তির নাম কানে শুনলেই মন সেই জায়গা বা ব্যক্তি সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে নেয়। কেন যে নেয়, কে জানে! যেমন ঝাঁঝিকে দেখার আগে ঝাঁঝির নাম শুনেই ও প্রেমে পড়েছিল। যেমন পড়েছিল, জোরান্ডার। গুড়গুড়িয়া, জোরান্ডা, ধুধুরুচম্না, বড়াকামরা, আপার বড়াকামরা, জেনাবিল, গায়েরকাচা, বাছুরিচরা, ন-আনা, ভঞ্জবাসা, চাহালা আরও কত না বাংলো আছে। গুড়গুড়িয়া হয়েই ওদের ফিরে যাবার কথা। তার পাশেই খৈরী নদী, যে খৈরীর বালিতেই নাকি সিমলিপাল টাইগার প্রজেক্টের ফিল্ড ডিরেক্টর সরোজরাজ চৌধুরী কুড়িয়ে পেয়েছিলেন মাতৃহারা একটি ব্যাঘ্রশাবক এবং যার নাম রেখেছিলেন খৈরী। পৃথিবীর নানা পত্র-পত্রিকাতে খৈরীর ছবি দেখেছে ও খবর পড়েছে আগে গামহার। খৈরী মারাও গেছে আজ বহুদিন হলো। তার পালিকা মাতা ও পালক পিতা চৌধুরীরাও আর বেঁচে নেই।

গামহার, রাজার কাছে বাথুরী সমাজের কথা জিগ্গেস করছিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। রাজা তো নন, যেন আরণ্যকে পড়া রাজা দোবরু পান্না! গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল গামহার-এর, চাপা উত্তেজনাতে।

রাজা বললেন, আলো একেবারে নিভে যাওয়ার আগে আগে পাহাড়চুড়োয় উঠে আমাদের সন্ধিপুজো করে আগমনী গান গাইতে হবে। কাল ভোরে পুজো শুরু হবে। তাই আজ সময় তাঁর হাতে বেশি নেই।

গামহার বলল, যেটুকু আছে, তাই তার পক্ষে যথেষ্ট।

বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির পরে পথ থেকে, মাঠ থেকে, বন থেকে, যে একরকমের গন্ধ আর ঝাঁঝ ওঠে ঠিক তেমনই গন্ধ আর ঝাঁঝ উঠতে লাগল বনের বুকের কোরক থেকে। তবে অন্য গন্ধ, অন্য ঝাঁঝ।

একটা মস্ত ঝাঁকড়া গাছের নীচে গামহার রাজার সঙ্গে বসেছিল।

গামহার জিগ্গেস করল, এটা কী গাছ?

কোনটা?

উপরে আঙুল দিয়ে দেখাল গামহার।

রাজা হেসে বললেন, এই তো কদম।

গামহার ভাবল ভাগ্যের একী পরিহাস! বারেবারেই তাকে বিধাতা শুধু কদম গাছতলাতেই কেন ঠেলে দিচ্ছেন একা একা? কদমতলে একা কি কারওই ভাল লাগে!

এমন সময়ে দেখা গেল ঝাঁঝি আসছে। তার পায়ে একটু দ্বিধা, একটু দ্বন্দ্ব আর তা এক বিশেষ ছন্দ দিয়েছে তার চলার ঋতিকে। হলুদ, লাল কালো, সবুজ বনের মধ্যে বিদায়ী সূর্যর কাঁচা সোনা রঙে বিধুর হয়ে যাওয়া লাল-পথ বেয়ে নবীন কুসুম পাতা-লাল শাড়ি পরে দীর্ঘাঙ্গী ঝাঁঝি এক এক পা করে এগিয়ে আসছে গামহার-এর দিকে। গামহার যেন যুগযুগান্ত ধরে এই ক্ষণটির জন্যেই অপেক্ষা করেছিল। তার ভিতরে ভিতরে যেন নিরুচ্চারে কিন্তু তীব্র অনুরণনে গেয়ে উঠলো একটি বহুশ্রুত, বহুগীত গান, "আজি এই গন্ধবিধুর সমীরণে/কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে/আজি মুগ্ধ নীলাম্বর মাঝে একি চঞ্চল ক্রন্দন বাজে/সুদূর দিগন্তের সকরুণ সঙ্গীত লাগে মোর চিন্তায় কাজে—আমি খুঁজি কারে অন্তরে মনে/আজি এই গন্ধবিধুর সমীরণে।"

ঝাঁঝি কাছে এসে দাঁড়াতেই রাজা উঠে দাঁড়ালেন। গামহারও উঠে দাঁড়াল। গামহার পরিচয় করিয়ে দিতে যেতেই রাজা হেসে বললেন, জানি জানি, আপনার স্ত্রী।

গামহার মনে মনে বলল, আহা রাজা! তুমি শুধু বাথুরী সমাজেরই নয়, তুমি পৃথিবীর রাজা হও। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

গামহার প্রচণ্ড আপত্তি দেখাতে যাচ্ছিল কিন্তু ঝাঁঝি হাসতে হাসতে হাত তুলে বাধা দিল।

বলল, স্বপ্নেই যখন পোলাউ রান্না হচ্ছে তখন ঘি ঢালতে কঞ্জুষী করছেন কেন?

গামহার ক্রমশই এই সাধারণ মেয়েটির অসাধারণ দুঃসাহসে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল। কে জানে! আজ রাতে কী ঘটবে। এমন রাতে, এমন পরিবেশে যা-কিছুই ঘটা সম্ভব। যা, কলুষিত, চিৎকৃত, বুবুক্ষু, লোভী, রাজনৈতিক কলকাতাতে কখনওই ঘটা সম্ভব নয়। সম্ভব ছিল না। এখানে রাজা আছেন কিন্তু রাজনীতি নেই। ব্যক্তি আছে কিন্তু সমাজের শকুন-চোখা নজর নেই তার উপরে। এখানে ব্যক্তি স্বরাট সম্রাট। পার্টি-চালিত যূথবদ্ধ জানোয়ার নয়। সে পতাকাবাহী, স্লোগান-সর্বস্ব, কৃত্রিম-স্বরের চালিত ROBOT নয়। প্রকৃতির মধ্যে সে পুরোদস্তুর একজন মানুষ, কোনোরকম বৈকল্য ও বিকৃতি ছাড়াই। অল্পে সুখী, একজন সহজ সাধারণ মানুষ। যেমন মানুষের জন্যেই ঈশ্বর এই সুন্দর পৃথিবী নিজে হাতে গড়ে দিয়েছিলেন একদিন।

এসো, বসো।

বলল, গামহার।

এমন করে বলল, যেন মনে হলো ওর এবং হয়ত ঝাঁঝিরও, যে, এই বাক্যবন্ধটি ঝাঁঝিকে বলবে বলেই ও এতগুলো বছর যেন জীবনের পথে হেঁটে এসেছে। তার এই আহ্বানের মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। সৃষ্টির প্রথম থেকে পুরুষ, নারীকে যে আসঙ্গ-লিপ্সাতে আহ্বান করে এসেছে, রাধাকে কৃষ্ণ, জুলিয়েটকে রোমিও, লায়লাকে মজনু, থৈবীকে খাম্বা যেমন, তেমন করেই। এতে কোনোই ভুল ছিল না। ভান ছিল না।

গামহার-এর গা ঘেঁষে বসল ঝাঁঝি।

মেয়েরা তাদের পছন্দ-অপছন্দ ভারী তির্যকভাবে প্রকাশ করে। আর্টিস্ট বলেই তা জানে গামহার। তার শরীরের পারফ্যুমের গন্ধ, এতখানি হেঁটে আসাজনিত তার মিষ্টি বগলতলির ঘামের গন্ধ, বেলা শেষের প্রকৃতির গায়ের গন্ধর সঙ্গে মিশে যখন গেল, ঠিক সেই সময়েই এক ঝাঁক টিয়া সেই গন্ধপুঞ্জ সঙ্গে করে নিয়ে উড়ে গেল ঝুমঝুমির মতো বাজাতে বাজাতে

ডুবন্ত সূর্যের দিকে, একজন মানুষ আর এক মানুষীর নিবিড় নৈকট্যর খবর জানাতে। ওদের বিদ্যুৎগতি দেখে মনে হলো ওরা বুঝি অচিরে সেই লাল গোলকের মধ্যে ঢুকে গিয়ে একটু সবুজ ধার দেবে জ্বলন্ত মার্তণ্ডকে।

কহন্তু আইজ্ঞাঁ, রাজাবাবু। তাংকু নাম হেল্বা ঝাঁঝি। সে আপনংকু কথা শুনিবা পাঁই আসিলু এটি।

তারপরই খুশির আধিক্যে পাঞ্জাবীর পকেট থেকে পার্স বের করে পাঁচশ টাকা দিয়ে গামহার বলল, পূজা সারিলে পিলামানংকু নৃত্য-গীত করিবি মদ্দটদ্দ খাইবাকু পাঁই মু দেলি। খরাপ বাসিলু কি আপুনি রাজা?

না ম। খারাপ কাঁই বাসিবি? ভল্ব বাসিলু।

রাজা বললেন, যে খারাপ ভাবব কেন? ওরা সকলে খুবই খুশি হবে। তবে নাচগান সব আগামিকাল রাতে হবে। পুজোর পর। কিন্তু আমরা মদটদ খাই না। সে মহুয়া কী, হাঁড়িয়া কী, কী পানমৌরী বা সল্বপ রস। কিচ্ছি নাই।

আপনারা দেখে শিখুন।

ঝাঁঝি বলল।

হুঁ।

গামহার বলল।

তারপর বলল, আপনাদের এই বাথুরি সমাজ সম্বন্ধে কিছু বলুন রাজা।

হউ।

রাজা শুরু করলেন। রাজার নাম বৃন্দাবন মহাপাত্র।

মাঝে মাঝে কেউ কেউ এসে রাজার কাছে নানা ব্যাপারে নির্দেশ নিয়ে যাচ্ছিল।

রাজা বললেন, আমাদের দেবতার নাম বড়াম দেব। প্রতিবছরই পুজো হয় এই চৈত্র মাসেই। ঠিক কবে যে হবে তার ঠিক থাকে না আগে থেকে। তবে চৈত্রমাসের এগারো থেকে পনেরো তারিখের মধ্যেই হয় এই পুজো, ভাল তিথি-নক্ষত্র দেখে।

আপনাদের সমাজের মানুষেরা কি এই পাহাড়েই থাকেন?

না। পাহাড়ে থাকার তো অনেকই কষ্ট। তাছাড়া, সরকার আর বনবিভাগ এই অভয়ারণ্য আর বাঘ-প্রকল্পের মধ্যে মানুষ বাস করুক, তা চান না। আমরা না থাকলেও আদিবাসীদের মধ্যে অনেকেই আছে এখনও। বহুদিন আগে আমরাও এইসব পাহাড়েই থাকতাম। সিমলিপাল পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে বাকুয়া নামের একটি জায়গা ছিল সেখানেই ছিল আমাদের বাস। আমাদের পূর্ব পুরুষেরাই সিমলিপালের এই আদিগন্ত পাহাড়শ্রেণীর রাজা ছিলেন। যাশীপুরের দোর্দণ্ডপ্রতাপ খড়িয়া রাজা, দাশু খড়িয়াকে আমরা যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিলাম। এখনও এই সুউচ্চ পাহাড়শ্রেণীর মধ্যের বাটালি দুর্গের চূড়োতে রাজা দাশু খড়িয়ার মাথা অবিকৃতভাবে রাখা আছে। করোটি নয়, মাথা; তাছাড়াও, আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা বামনঘাটির যুদ্ধে গোন্দদেরও হারিয়েছিলেন। আমাদের এক পূর্বসূরী, তাঁর নাম বীরবর, খরী নদী বেয়ে দুটি শিলাখণ্ডকে ভেসে যেতে দেখে দুটিকেই জল থেকে দু'হাতে ওঠাতে যান। কিন্তু বাঁহাতের ধরা শিলাখণ্ডটি ভেসে যায় স্রোতে। ডানহাতের শিলাখণ্ডটিকে এনে রঘুনাথজী মঠ-এ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ অঞ্চলের সব মঠ-মন্দিরের মধ্যে এখনও রঘুনাথজীর মঠকেই সবচেয়ে বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়।

গামহার বলল, আমি নৃতত্ত্বর যা সামান্য জানি, তাতে জানি, আমাদের দেশের পূর্বাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলের অধিকাংশ আদিবাসীর আদি বাসই ছিল দক্ষিণ ভারতে। ওঁরাও, গোন্দ, খারোঁয়ার, বাইগা ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাজা বলেন, তেমন কথাও শুনতে পাই আমরা বহু লেখাপড়া করা পণ্ডিতদের মুখে।

যেমন?

যেমন, আমাদের পূর্বপুরুষেরা নাকি "দুধ" এর বাটুলিগড়ে থাকতেন তারপর দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী নদীর রেখা ধরে তাঁরা নাকি চলে যান। তা হতেও বা পারে। কিন্তু হাজার হাজার বছরের ইতিহাস দিয়ে আমরা করব কী। যে ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানের ক্ষীণতম যোগসূত্রও আছে বলে মনে করি আমরা, তাকেই ইতিহাস বলে মানি। তাছাড়া এসব অ-বাথুরি পণ্ডিতদেরই কথা। আমরা তো আমাদের বাবা-ঠাকুরদাদের মুখে ওসব কথা শুনিনি কখনও।

আপনাদের ভাষা কি?

আলাদা ভাষা কিছু নেই। আমরা ওড়িয়াই বলি।

আপনারা কি গোন্দ বাইগাদের মতো আলাদা বস্তী করে থাকেন অরণ্যাঞ্চলে?

না। তাও থাকি না। আমাদের সঙ্গে নানা জাতের আদিবাসীরাই থাকে, যেমন, সাঁওতাল, গোন্দ, মুণ্ডা, সৌঁতি, ভূমিজ, ভুনিয়া ইত্যাদিরা।

আপনারা তো বারিপদা থেকে এসেছেন শুনলাম। বারিপদাই তো মূয়রভঞ্জের রাজধানী। আপনারা কি তাহলে ময়ূরভঞ্জেই থাকেন সকলে?

রাজা বললেন, না, তাও ঠিক নয়। আমরা নানা জায়গাতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছি। যেমন কেওনঝড়গড়ের পাঁচপীর (করাঞ্জিয়া) আর কাপ্তিপদা উপজেলাতে, বালেশ্বর জেলার নীলগিরি উপজেলাতেও বাথুরিদের বসতি আছে।

আপনাদের কোনো দেবদেবী বা ধর্ম আছে কি আলাদা? নাকি আপনারা হিন্দুই?

আমরা তো হিন্দুই। বড়ামদেব একজন উপদেবতা, জগন্নাথ দেবই আমাদের প্রধান দেবতা। জাউ-রন্ধার এই গিরিখাতের গায়ে কোথাও জগন্নাথদেবেরও ঠাঁই আছে। তা না হলে, বহুবছর আগে এখানেই জগন্নাথ দেবের ভোগ রান্না হতো কেন?

জাউ মানে?

ওড়িয়াতে জাউ মানে তো ভাতই। জগন্নাথদেবের মন্দিরের প্রসাদ তো ভাতই, যাকে আমরা জাউ বলি। জাউ-রন্ধাই নাম এই জায়গাটার। ইংরেজদের জিভে তো অনেকই জড়তা ছিল। তাই ওরা জাউ-রন্ধাকে জোরান্ডা বলতো।

তারপরই রাজা বললেন, এবার আমাকে উঠতে হচ্ছে। কালকে যদি আসেন তাহলে অনেক গল্প হবে।

গামহারও উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, কাল যে নাচ হবে সেই নাচের কি কোনো নাম আছে?

আছে বইকী। সে নাচের নাম ছাঙ্গু নৃত্য।

সঙ্গে বাজনা থাকবে না?

রাজার তাড়া ছিল। বললেন, বাজনা ছাড়া কি নাচ হয়? থাকবে বইকি! ছাঙ্গু, খঞ্জনী, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, বাইকুন্ডল।

রাজা চলে গেলেন। ততক্ষণে শোভাযাত্রা করে পুরুষেরা এসে পড়েছে। রাজাকে সম্মুখভাবে নিয়ে তারা পাহাড় চড়তে লাগল।

যাবে ওদের পেছন পেছন? না কি বাংলোতে যাবে? হারিত যদি ঘুম ভেঙে তোমাকে দেখতে না পায়?

গামহার বলল।

ঝাঁঝি হাসল। বাঁকা হাসি। বলল, সে কি দুগ্ধপোষ্য শিশু, যে আমাকে না দেখতে পেয়ে কান্না জুড়ে দেবে?

দুগ্ধপোষ্য না হলেও পুরুষমানুষ মাত্রই আমৃত্যু স্তন্য-পায়ী তো বটেই।

ভারী অসভ্য তো আপনি।

এমন জঙ্গলে এসেও যদি জংলীপনা না করি একটু, তবে কি শহরে করব?

সেটা ঠিকই বলেছেন কিন্তু। এখানে সব আদিমতা, আদিরসও স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। এই অরণ্যর এক আশ্চর্য প্রভাব পড়ে সব মানুষেরই উপরে।

একে এককথায় কী বলা যেতে পারে?

গামহার একটু ভেবে বলল, আরণ্য।

বাঃ।

সত্যি! আগে যে কেন আসিনি। এবার থেকে চিকুদা অথবা জারুল যেখানেই যাবে, আমি সঙ্গে যাব। আমার তো কোনো পিছুটান নেই। আমি রুপোর দাঁড়ে-বসা, অন্ধকার উঠোনের কাকাতুয়া। দম বন্ধ হয়ে আসে।

পিছুটান তো আমারও নেই। সামনের টানও ছিল না কিছুই। সাম্প্রতিক অতীত থেকে মনে হচ্ছে, একটা সামনে-টান এর ইঙ্গিত মিলছে। শেষপর্যন্ত কী হয় তা অবশ্য এখনও বলা যাচ্ছে না।

মানে?

মানে সামনে যদি কেউ টানে, তবে তার সঙ্গেই ভেসে পড়ব আর কী। ভাবছি, জঙ্গলে এলে এরপর থেকে রঙ, তুলি, কাগজ সব নিয়ে আসব। তুমি কি আসবে আমার সঙ্গে?

আনবেন না গামহারদা।

কেন একথা বলছ?

আপনি তো সুরিয়্যালিস্ট আর্টিস্ট। এখানে রঙ-তুলিই যদি বয়ে আনবেন তাহলে আপনার সঙ্গে ওয়ার্ল্ড-লাইফ-ফোটোগ্রাফার জারুল-এর তফাৎ রইল কি? ক্যামেরা যা দেখতে পায় না, আপনার চোখ তো সেইটুকুই দেখবে।

ঠিকই বলেছো তুমি। চমৎকার বলেছ। এইসব ছবিকে মনের মধ্যে জলছবির মতো বসিয়ে নিয়ে ফিরে যেতে হবে। তারপর একটু ঘষে, একটু মেজে, একটু রহস্য যোগ করে বাস্তব আর অবাস্তবের মিশেল দিয়ে নতুন সব সৃষ্টি করব আমি। ভাবছি জুনিপার এবার ফিরে এসে আমার নতুন ছবি গুলি দেখে কী যে বলবে। বলবে, তুমি নিজেকে নবীকৃত করেছ।

জুনিপার আপনাকে খুব ভালবাসে, না?

মিথ্যে বলব না। বাসে। কিন্তু ওদের ভালবাসাটা অন্যরকম ভালবাসা। তা নিয়ে তোমার বা আমার চিন্তিত হবার কিছু নেই।

তাই?

তাই।

তারপরে ঝাঁঝি বলল, তাই তো করা উচিত। নতুন সৃষ্টি যিনি না করতে পারেন তাকেও কি সৃষ্টিশীল বলা চলে?

আমরা এখন কোনদিকে যাব?

চলো, ওদের পিছু পিছুই যাই। দূর থেকে দেখব।

কিছুক্ষণ পরে সেই বাথুরীরা একটা পায়েচলা পথ দিয়ে পাহাড়ে উঠে জোরান্ডার কালো খাড়া পাথরে ঘেরা গিরিখাতের পাশের একটা উঁচু পাহাড়চুড়োতে গিয়ে নীচের গিরিখাতের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে করজোড়ে গান ধরল। গান তো নয়, যেন স্তোত্র, যেন উপনিষদের শ্লোক। কিন্তু ওড়িয়াতে।

'পূর্ণরূপ পরমব্রহ্ম হে বড়াম ঠাকুর
অত্রাহি ভঞ্জন প্রভু জগত্তর ঈশ্বর।
নাহি রূপ নাহি বর্ণ অলংকার ঠাকুর.
তুম রূপ বর্ণিবাক নূহে মোর অন্তর'

ইত্যাদি...

গামহার বলল, এসো, এই পাথরটার উপরে বসি। আহা! কী অপূর্ব প্যানোরোমিক ভিউ। জাপান বা আমেরিকার কোনো নবতম ক্যামেরার প্যানোরোমিক বা ওয়াইডঅ্যাঙ্গল লেন্স দিয়েও এই ছবি তোলা যাবে না। এ শুধু মানুষের চোখই দেখতে পারে। আজ সন্ধেবেলার এই রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ ক্যামেরা কোথা থেকে পাবে? কোনোদিন যদি পায়ও তবেও তা চোখের সমতুল কখনওই হবে না।

ওরা গানটি গেয়েই চলেছিল, সমবেত কণ্ঠে। গভীর আবেগের সঙ্গে। স্তব্ধ হয়ে শুনছিল ওরা দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে।

গামহার বলল, আমি একটি ব্রহ্মসঙ্গীত জানি তার সঙ্গে এই গানটির আশ্চর্য মিল আছে।

কী গান? আপনি ওদের ওই গানের মানে বুঝতে পারছেন?

কিছুটা পারছি বইকি। থ্যাঙ্কস টু কুমুদিনী। যে গানটির কথা বললাম, সেটি নিমাইচরণ মিত্রর লেখা, 'কেন ভোলো মনে করো তারে, যে সৃজন পালন করেন এ সংসারে।' ব্রহ্মসঙ্গীত।

তারপর বলল, লেখা নিমাইচরণ মিত্রর বটে, কিন্তু এটি উপনিষদেরই একটি শ্লোকের হুবহু তর্জমা।

কোন উপনিষদ?

শ্বেতাশ্বতরপনিষৎ। উপনিষদ পড়েছ নাকি তুমি?

আমি তো দর্শনের ছাত্রী ছিলাম। সংস্কৃত ও বাংলাতেও এম এ করেছিলাম। এখন ধর্ষণের ছাত্রী।

বল কী? তিন তিনটে এম এ। নাঃ তোমাকে প্রণাম করতে হবে। একটু পরে করব।

যাই বলুন বাংলায় এম এ করলে কী হবে, আমার মাথা থেকে 'আরণ্য' শব্দটি বেরুতো না। আপনিই কি তৈরি করলেন শব্দটি?

গামহার হেসে বলল, ভালই বলেছ। আমি তো বি.কম. ফেল। তারপরে আর্ট স্কুল থেকে সাধারণভাবে পাশ করা ছেলে। শব্দ বানাব এমন যোগ্যতা কি আমার আছে? কলকাতাতে ফিরে অভিধান দেখো। 'আরণ্য' শব্দটি তো থাকা উচিত তাতে। এর আগে কোন বাঙালি কবি-সাহিত্যিক হয়তো ব্যবহার করেননি এই শব্দ। তাই হয়ত নতুন বলে মনে হচ্ছে তোমার।

ওরা গান শুরু করার আগে একটু যজ্ঞ মতো করেছিল। সম্ভবত বড়ামদেব-এর পুজোর আগের সন্ধিপুজো। তাতে শঙ্খ বেজেছিল বারেবারে। গান শেষ হলে ওরা সেই যজ্ঞের আগুন সযতনে পাথরে ঘিরে দিল যাতে আগুন ছড়িয়ে যেতে না পারে। তারপর শোভাযাত্রা করে নয়, দল ভেঙে একজন দু'জন করে নেমে যেতে লাগল পাহাড়চুড়ো থেকে।

রাজা গামহারদের দেখতে পেয়ে বললেন, পুরো অন্ধকার হয়ে গেলে এখানে না-থাকাই ভাল কিন্তু।

কেন বলুন তো? হাতি?

না, না, হাতি এই দু'দিন আসবে না। জোরান্ডার এই গিরিখাতে নানা রহস্য আছে। দেবতা যেমন আছেন অপদেবতাও আছেন অনেক।

তাই? কিন্তু আজ তো অন্ধকার থাকবে না। ঐ দেখুন পুবাকাশে চাঁদ এখুনি উঠে পড়েছে আর সূর্য পশ্চিমের পাহাড়ের পিঠে স্থির দাঁড়িয়ে ছুটি চাইছে। নেমে যাবে এখনই। তারপরই তো ফুটফুট করবে জ্যোৎস্না।

রাজা একমুহূর্ত দাঁড়ালেন। বললেন, যে-ভয়ের কথা বলছি, চাঁদনি রাতেই সে ভয় বেশি।

বলে, রাজাও নেমে গেলেন।

ঝাঁঝি বলল, কী শুনলেন? বুঝলেন কিছু?

শুনলাম। কিন্তু বুঝলাম না। গিরিখাদের রহস্যের চেয়েও বেশি রহস্যময় মনে হচ্ছে রাজার কথা।

আমারও তাই মনে হয়। চাঁদনি রাতেই অপদেবতার ভয় বেশি।

কিন্তু উনি তো অপদেবতার কথা বললেন না শেষ বারে। অন্য কোনো ভয়ের কথা বললেন।

সেইটাই তো রহস্য।

আপনার একটা কার্ড কিন্তু আজ অবধি আমাকে দেননি গামহারদা।

কার্ড দিয়ে কী করবে। আমি অপদেবতা হয়ে হারিতের কাছ থেকে তো বটেই নবেন্দুর কাছ থেকেও তোমাকে ছিনিয়ে নেব। আসবে আমার কাছে? থাকবে? আমি গান গাইতে গাইতে ছবি আঁকব আর তুমি সঙ্গে সঙ্গে গাইবে।

আর সুন্দরী ফরাসিনী জুনিপার? সে যখন আসবে?

এলে আসবে।

তারপরে বলল, কেন? তুমিও কি হারিতেরই মতো নাকি? আমাকে তার সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারবে না, যদি তেমন প্রয়োজন ঘটে? আমাদের ভালবাসার ক্ষমতা কি এতোই সীমিত যে, একজনকে দিয়েই তা ফুরিয়ে যাবে?

না যাবে না। তবে কথাটা আমার বেলাও খাটবে তো?

অবশ্যই। তুমিও নবেন্দুর সঙ্গে আমাকে...

নবেন্দুর কথা বলবেন না। হরিমতি যার স্ত্রীর নাম, যে দশ লাখ টাকা পাবে বলে বছর বছর স্ত্রীকে গর্ভবতী করে, তেমন পুরুষের নামও আমার কাছে উচ্চারণ করবেন না গামহারদা। আমার রুচি বলে একটা ব্যাপার আছে। আশ্চর্য! এখনও আছে!

আমিও নবেন্দুকে অপছন্দ করি। মানে করেছি, প্রথম দর্শনের ক্ষণ থেকেই।

কেন বলুন তো?

প্রথমত কোনো পুরুষ বগল-দেখানো জামা পরলে আমার সমস্ত শরীর চিড়বিড় করে ওঠে। আর দ্বিতীয়ত ও তোমাকে ভালবাসে বলে।

খুব জোরে হেসে উঠল ঝাঁঝি। তারপরে বলল, আর মেয়েরা যদি... .

যদি দেখবার মতো বগলতলি হয় তবে অবশ্যই দেখব। আমি আর্টিস্ট। কিন্তু কী দেখাবার আর কী দেখাবার নয়, এই সহজ বুদ্ধিটুকু যে তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের নেই, সেই পুরুষ এবং স্ত্রীকে কি বলি?

ঝাঁঝি চুপ করে ছিল।

হঠাৎই বলল, এখন আর কথা বলবেন না, প্লিজ।

সামনে চেয়ে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল ওরা দু'জনেই। বিদায়ী সূর্যের শেষ আভা আর নবাগতা চাঁদের চাল-ধোওয়া সাদা আলোর মিশ্রণে যে এক ঐশী ঔজ্জ্বল্যর সৃষ্টি হয়েছিল সমস্ত অঞ্চল জুড়ে, তার বর্ণনা দেয়, অমন ভাষার জোর ওদের দু'জনের কারোরই ছিল না। স্তব্ধ হয়ে সামনে চেয়েছিল ওরা। নির্বাক, নিস্পন্দ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যর অভিঘাত যে এমন মারাত্মক হতে পারে তা ওরা কাল রাত থেকেই বুঝছে কিন্তু এখনকার মতো সেই বোধ আগে তীব্র হয়নি।

গিরিখাতের অন্য প্রান্তে দাবানল লেগেছে পাহাড়ে। এই স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলোর মধ্যে অঙ্গার-লাল দাবানলের আলোর মালা জড়িয়ে-মড়িয়ে গেছে পাহাড়চুড়োয়। সেই ঘনকৃষ্ণ বৃক্ষহীন রুক্ষ গম্ভীর পাহাড়ই শুধু জানে, কার সঙ্গে মালা বদল করবে সে।

ঝাঁঝি স্বগতোক্তি করল, ওরা কি এখনও ঘুমোচ্ছে, না কি মদ খাচ্ছে? এই দুই কম করতে এতদূরে কেন যে আসা! মহীনের বাড়ি পর্যন্ত যেতে পারলেই তো যথেষ্ট।

সে কথা তো পরশু রাতে চিকুও বলছিল হারিতকে। তাই নয়?

হ্যাঁ।

হঠাৎই গামহার-এর গলাতে কাঠিন্য লাগল।

সে আদেশের সুরে বলল, শোনো ঝাঁঝি, তুমি এই সামনের পাথরটার আরেকটু উপরে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ অনাবৃত করো।

অ্যাঁ?

অবিশ্বাস এবং আতঙ্ক-মিশ্রিত গলাতে বলল, ঝাঁঝি। .

তারপর বলল, গামহারদা, আপনি কি পাগল?

পাগল নই। সেয়ানা-পাগলও নই। আমি আর্টিস্ট। এই ঐশী প্রকৃতির মাঝে আমি তোমাকে একবার পরিপূর্ণভাবে দেখতে চাই। তোমার নগ্নিকা মূর্তিকে।

আমার গায়ে আপনি আঙুল ছোঁওয়াবেন না?

না ঝাঁঝি। আমি আর্টিস্ট। শুধু চোখ ছোঁয়াব। রাজা বৃন্দাবন মহাপাত্রর ভাষায় বললে বলতে হয়, আমি যদি অপদেবতা হতাম ঝাঁঝি, তাহলে তোমাকে এই শিলাসনে গর্ভবতী

কবতে পারতাম। কিন্তু আমি যে আর্টিস্ট। আমি দেবতা। তোমাকে নিয়ে আবার আসব এখানে অন্য এক পূর্ণিমায়।

তুমি আমাকে একটি সন্তান দেবে গামহারদা? তুমি আমাকে ওই চাড্ডাকান্টেন্ট-এর হাত থেকে মুক্তি দেবে?

দেব।

তাহলে, তাড়াতাড়ি করো। আমার বয়স বেয়াল্লিশ।

ঝাঁঝি বলল।

পাগলি। আমার বয়স ছাপ্পান্ন। তাড়াতাড়িই করব।

ছেলে হলে কি নাম দেবে?

কদম।

আর মেয়ে হলে?

কুসুম।

বাঃ।

এখন দেরী কোরো না। প্লিজ তাড়াতাড়ি করো। এসব জঞ্জাল খুলে ফেলো। ভারমুক্ত হও। জন্মদিনের পোশাকে ফেরো।

দু-মিনিটের মধ্যে ঝাঁঝি বিবস্ত্রা হয়ে গামহারের দিকে পাশ ফিরে দাঁড়াল।

বলল, আন্ডিও খুলতে হবে?

সবই খুলবে। তোমার নগ্নতার পূর্ণতায আমি এই দেবদুর্লভ মুহূর্তে তোমাকে দেখতে চাই।

হাল্কা মেরুন রঙা অ্যান্ডিটিও খুলে ফেলল ঝাঁঝি। কালো পাথরে পড়ে রইল।

ওর মনে হল, ঝাঁঝির নগ্নিকা রূপ যেন স্নিগ্ধ ফানুসের মতো চাঁদকেও হলুদ হারিয়ে দিল সৌন্দর্যে। তার অনাবৃত পিঠের পরে মেঘরাশির মতো কেশভার মেলে দিল। সামান্য নত স্তনদ্বয়। একজোড়া পরিযায়ী হাঁসের মতো, উড়ুউড়ু। তার জঘন যেন আষাঢ়ের কালো মেঘাচ্ছাদিত উপবন।

গামহার-এর মনে হলো, যেন সিমলিপাল পাহাড়শ্রেণীর বাটুলি দুর্গর উপরেই তারা দু'জনে দাঁড়িয়ে আছে, আজ থেকে বহু শতাব্দী আগে। ও বাথুরিদের রাজা। আর ঝাঁঝি রানী।

চাঁদ ও সূর্যের সেই দো-আঁশলা আলো ধীরে ধীরে ঝাঁঝিকে উজ্জ্বলতর করে তুলতে লাগল। তারপর একসময়ে সূর্য অদৃশ্য হলো পাহাড়ের ওপারে। অদৃশ্য হলো তার সব চিহ্ন। তখন রাত রুপোঝুরি। ঝাঁঝির উরুমূলের মেঘের ছায়াতেও রুপোচুর লাগল। গামহার এগিয়ে গেল ঝাঁঝির দিকে। ঝাঁঝির চোখে রুপোলি আতঙ্ক দেখা দিল। কিন্তু গামহার দাঁড়িয়ে-থাকা ঝাঁঝির পায়ের কাছে জোড়াসনে বসে তার শরীর স্পর্শ না করে তাকে ভক্তিভরে প্রণাম করল। তারপর উবু হয়ে তার জড়ো-করা পায়ের পাতাতে সোহাগভরে চুমু খেল।

এ কী? একী! কী যে করেন আপনি।

এই তো!

এই তো মানে?

সৌন্দর্যকে পুজো করল শিল্পী, চিরন্তন নারীকে, চিরন্তন পুরুষ।

তারপর বলল, নাও, এবারে সব পরে নাও।

ঝাঁঝি বলল, গামহারদা আমার বাবাও চিত্রী ছিলেন, কিন্তু মনে হয় আপনার মতো এতো বড় ছিলেন না। আপনি জাত শিল্পী। জীবনে আপনাকে অনেকদূর যেতে হবে কিন্তু।

আমি বজ্জাত শিল্পী। কোথাওই যাব না আমি। তোমার সামনে তোমার পায়ের কাছে বসে শুধু তোমারই মুখের দিকে চেয়ে থাকব।

ঝাঁঝি তৈরি হয়ে বলল, চলুন।

গামহার বলল, তোমাদের পরম সৌন্দর্য তো তোমাদের নগ্নতাতেই। তবু অত যত্ন করে এত কিছু পরো যে কেন, তা তোমরাই জানো।

চলো, আমার হাত ধরো। আজ থেকে তোমাকে নিজেকে আর পথ দেখে চলতে হবে না।

আবার আমরা কবে আসব এখানে?

ঘোর-লাগা গলাতে বলল, ঝাঁঝি।

শ্রাবণী পূর্ণিমাতে। যখন কদম ফুলে ছেয়ে যাবে পথ, এখন যেমন ছেয়েছে শিমুলে পলাশে। এখানে নয়, সেবারে যাব বাটুলি দুর্গে।

খুঁজে বের করতে হবে তো সে দুর্গ।

সে, আমি আগে এসে খুঁজে বের করে যাব। তোমাকে নিয়ে আসব পরে। বাটুলি দুর্গের মাথাতে একদিকে কদম আর একদিকে কুসুম গাছের পাহারাতে শ্রাবণী পূর্ণিমার রাতে তোমার গর্ভাধান করব।

বলেই বলল, খুশি তো তুমি? ঝাঁঝি?

খু-উ-ব।

এতবছর কোথায় লুকিয়ে ছিলেন আপনি গামহারদা?

তুমিই বা কোথায় ছিলে? কতপথ হেঁটে এলাম একা একা।

সময়ে সব হয়। সময়কে সময় তো দিতেই হয় ঝাঁঝি। তুমি কি Walt Whitman পড়েছ? Leaves of Grass?

না।

তোমাকে আমি উপহার দেব।

"All truths wait in all things,
They neither hasten their own delivery nor resist it,
They do not need the obsteric forceps of the Surgeon."

বাঃ।

ঝাঁঝি বলল, গামহারের হাতে হাত রেখে নামতে নামতে।

ঝাঁঝি বলল, এখন যদি হারিত কাম্বখুণ্টা সাপ হয়ে পথে শুয়ে থাকে?

গামহার হাসল। বলল, হারিত ছেলে ভাল। তবে তোমার সঙ্গে মেলেনি এই যা। তুমি ওকে ছেড়ে এলে ওর হয়ত ভালই হবে। ও হরিমতিরই মতো কোনো বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করে শ্বশুরের পয়সার জন্যে স্ত্রীকে বছর-বিয়োনি করবে।

আর নবেন্দু?

গামহার বলল।

এমন সুন্দর সন্ধেবেলাতে ওর নাম কোরো না। রাগ হয়ে যায়। ঝাঁঝি বলল।

আমার একটাই ভয়।

গামহার বলল।

কি?

হারিত ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস-এ নালিশ করে দেবে না তো আমার নামে।

খিলখিল করে হেসে উঠল ঝাঁঝি।

চাঁদের আলো, গাছগাছালির ফাঁকফোঁকর দিয়ে এসে পথে পড়েছে। গামহারের মনে পড়ল, বিভূতিভূষণের আরণ্যকে পড়েছিল আলো-ছায়ার বুটিকাটা গালচের কথা। এতোবছর পরে তা প্রত্যক্ষ করে ভাললাগাতে ভরে উঠল। তারপর ও স্বগতোক্তি করল, কীওরোস্কীওরো।

কি বললেন?

কীওরোস্কীওরো।

মানে কি?

তুমি কখনও রেমব্রান্টের এর ছবি দেখেছ?

প্রিন্ট দেখেছি।

ওরিজিনাল কি আমিই দেখেছি নাকি?

কেন এই প্রশ্ন?

ছবিতে আলোছায়ার ব্যবহারশৈলিকে বলে কীওরোস্কীওরো। বানানটা হচ্ছে Chiar-oscuro. এতোদিন রেমব্রান্টকেই কীওরোস্কীওরোর মাস্টার বলে জানতাম। আজ জানলাম, তিনিও ছাত্রই। আসল মাস্টার প্রকৃতি। ঈশ্বর। চাহালা থেকে জোরাণ্ডা আসতে আসতে সকালেই এই কথাটি আমার মনে হচ্ছিল। এই রাতে, সেই মনে হওয়াটা প্রত্যয়ে এসে পৌঁছল।

ওরা সমতলে নেমেই দেখল জোরাণ্ডা বাংলো থেকে হেডলাইট জ্বেলে দুটি গাড়িই বেরোচ্ছে।

পাছে ওরা ঘুরে মরে ওদেরই খোঁজে তাই গামহার তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে পথের মাঝখানে দাঁড়াল।

দুটি গাড়িই থেমে গেল।

পরস্ত্রীর সঙ্গে গেছিলে কোথায় চাঁদনী রাতের আড়ালে-আবডালে?

চিকু বলল।

জারুল হাসছিল।

বলল, যেমন ভ্যাবলা-ভ্যাবলা ভান করে থাকেন আসলে তেমন তো নন আপনি গামহারদা! এদিকে হারিত তো খাদে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল।

গামহার বলল, রাজা বললেন এখানে না কি অনেকই অপদেবতা আছেন। পাছে পরস্ত্রীকে তারা গর্ভবতী করে দেয়, তাই পাহারা দিচ্ছিলাম।

নবেন্দু বিদ্রূপের গলাতে বলল, গামহারদার বয়স হলে কী হয়, খুব শিভালরি আছে। রস তো আছেই।

যার স্ত্রীকে নিয়ে সে হারিয়ে গেছিল, সেই হারিত গাড়ি থেকে নেমেই এগিয়ে এল।

গামহার ভাবল, এই পড়ল বুঝি ঘুঁষি তার নাকে।

কিন্তু না। হারিত বলল, সেই জাপানী সানটোরি না পানটোরী হুইস্কিটা কী হল গামহারদা? আমাদের পুনর্জন্ম সেলিব্রেট করতে হবে না! সে জন্যেই আমাদের তোমাকে খুঁজতে বেরোতে হলো। তোমার ব্যাগের চাবিটা তো দিয়ে যাবে অন্তত যাবার আগে।

সরি, হারিত। চলো, এখুনি বের করে দিচ্ছি।

গামহার উঠল নবেন্দুর গাড়িতে আর ঝাঁঝি, চিকুর গাড়িতে।

গামহার ভাবছিল, হারিত শব্দর মানে অপহারিত। টাকার হিসাব, কম্পিউটার, আর মদ আর তাস তাকে অপহরণ করে নিয়েছে অনেকইদিন হলো।

হারীত যার নাম সে তো হারবেই! এই আরণ্য কাকে হারায় আর কাকে জেতায় তা সেই শুধু জানে। আর হয়ত জানেন বাথুরীদের বড়াম ঠাকুর।

দীপিতা

এনা গুপ্ত

কল্যাণীয়াসু



কালীপুজো শেষ হয়ে গেছে। ভাইফোঁটাও চলে গেছে। দীপিতার কোনো ভাই নেই। বিয়ের আগে কলকাতাতে যখন বড়মামার কাছেই থাকত বরানগরে, তখন মামাতো দিদির সঙ্গে মেজমামার ছেলেকে ফোঁটা দিত। বিয়ের পরে সেই যে ডালটনগঞ্জে এসেছে তারপর থেকে মামা-মামীরাও দু'একটা চিঠিতে ছাড়া আর খোঁজ নেননি। দীপিতার শ্বশুরবাড়ি থেকেও সে কারণেই দীপিতার মামাতো ভাইকে কখনও ভাইফোঁটাতে আসতে বলা হয়নি।

দীপিতাদের মাতৃকুল বরিশালের। সেখানে জামাইষষ্ঠী ব্যাপারটা নেই নাকি। সেই কারণে প্রতিবছর জামাইষষ্ঠী এলেই দীপিতাকে তার শাশুড়ির কাছে নতুন করে কথা শুনতে হয়। তার স্বামী অমল অবশ্য নিজে কিছু বলে না। প্রথম প্রথম ঠাট্টা করত। কিন্তু মনে কোনো দুঃখ রাখেনি। সেদিক দিয়ে মানুষটা ভালই।

যে মেয়ে শিশুকাল থেকেই আশ্রিতার মতো মানুষ হয়েছে মামাবাড়িতে, তার এর চেয়ে বেশি কিছু প্রত্যাশারও ছিল না। অন্য কিছুর জন্যে শূন্যতাও বোধ করে না দীপিতা আর কিছুমাত্র। একমাত্র সাংস্কৃতিক-সাংগীতিক পরিবেশের অভাবটা ছাড়া।

কে জানে! সত্যিই কি করে না?

কলকাতাতে থাকাকালীন, স্কুল-কলেজের দিনগুলোতে একটা মুক্ত হাওয়ার মধ্যে কাটিয়েছিল। সাহিত্য, গান, নাটক-টাটক সম্বন্ধে একটা তীব্র উৎসাহ ছিল। পঁচিশে বৈশাখে জোড়াসাঁকোতে এবং রবীন্দ্রসদনে যেতই। দোলে অথবা পৌষোৎসবে দু'একবার শান্তিনিকেতনেও গেছে বন্ধুদের সঙ্গে ও বড়মামার মেয়েদের সঙ্গে। তবে শেষ গেছে, বছর দশেক আগে। বড়মামা বলতেন, কলকাতার যত অশিক্ষিত বড়লোক সব গিয়ে বাড়ি করেছে এখন শান্তিনিকেতনে। জায়গাটা একটা অশান্তি-নিকেতন হয়ে গেছে। এ ভিড়ে আর গিয়ে দরকার নেই।

দীপিতা, ডালটনগঞ্জের নয়াটোলিতে তার শ্বশুরবাড়ির একতলার বারান্দাতে দাঁড়িয়েছিল। বাড়ির সামনে বাগান মতো আছে। বড় বড় পাঁচটি ইউক্যালিপটাস গাছ। গেটের দু'পাশে দু'টি কৃষ্ণচূড়া। এখন ফুল নেই অবশ্য। মস্ত বড় গেট-এর ফাঁক দিয়ে লাল মোরামের পথটা দেখা যায় স্টেশনের দিক থেকে এসে কাছারির দিকে চলে গেছে। তা দিয়ে সাইকেল রিক্সা, সাইকেল, অটো ও কচিৎ গাড়িও যায়। বিচ্ছিরি শব্দ করে মোটর সাইকেল বা স্কুটারও। মারুতি গাড়িও যায়, কিন্তু মারুতির এঞ্জিনের কোনো শব্দই শোনা যায় না। হঠাৎ দেখা যায় যে, চলে গেল। গেট পেরিয়ে গেলেই দেখা যায় শুধু।

এই পথটা, বলতে গেলে প্রাইভেট। তবে শর্টকাট করার জন্যে অনেকেই এই পথে যাওয়া-আসা করে। এই ফাঁক দিয়ে দেখা নয়াটোলির এই পথটুকুই বলতে গেলে দীপিতার সঙ্গে বাইরের জগতের একমাত্র যোগাযোগ। মাঝে মাঝেই নিজেকে ওর বন্দিনী বলে মনে হয়।

এখন বেলা সোয়া চারটে বাজে। আজ রবিবার। নানারকম পদ রান্না হয় বাড়িতে। শাশুড়ির নির্দেশে একটি বা দুটি পদ দীপিকারও রান্না করতে হয়। বাড়িতে মানুষ খুব বেশী নেই। শ্বশুর, শাশুড়ি, তার স্বামী অমল। দেওরেরা কমল এবং বিমল। একমাত্র ননদ সিমলি। রান্নার জন্যে বিহারী ঠাকুর আছে, পাঁড়ে। বহুদিনকার লোক। শাশুড়ির জন্যে একমাত্র আয়া আছে। সুরাতিয়া। তার ছেলে ভিখু বাড়ির সকলের ফাই-ফরমায়েস খাটে। শ্বশুরমশায়ের খাস-চাকর-কাম-ড্রাইভার সুখরাম। সে বাড়িতেই থাকে। শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকে সে। শীতকালে রোদে বসিয়ে তেল মাখায়, গড়গড়ায় তামাক সাজে, শোয়ার আগে পা টিপে দেয়, ব্যাঙ্কে যায় চেক জমা দিতে বা টাকা তুলতে।

শ্বশুরমশায়ের গোয়েন্দাও বটে সুখরাম। সে থাকে গারাজের পাশের ঘরে। বাড়িতেই খায়। তার দেশ লোহারডাগাতে। বয়স দীপিতার স্বামী অমলেরই মতো। লোকটার চোখের চাউনি মোটে ভাল লাগে না দীপিতার প্রথম দিন থেকেই। যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও সুখরাম বিয়ে করেনি। বাড়িতে নাকি মা আছে শুধু। ছুটিছাটাও নেয় না। বছরে সাতদিন ছুটি নেয় ছট-পরবের সময়ে। বাসে করে চলে যায় লোহারডাগা। আবার ঠিক সময়মতো ফিরে আসে।

সুখরাম নাকি কথার খেলাপ করেনি কোনদিনও। সেই জন্যেই দীপিতার শ্বশুর ব্রজেন কর মশায় তাকে অত পছন্দ করেন।

আজ সকালে একচোট বৃষ্টি হয়ে গেছে। ডালটনগঞ্জে বিয়ে হয়ে আসার পর থেকেই দেখছে প্রতিবছরই দেওয়ালির পরে হয়। এর পরই শীত নামবে জব্বর। এই সময়ের রোদটাও মিষ্টি লাগে। এখানে গরমের সময়ে যেমন গরম, শীতের সময়েও তেমনি শীত।

ঘরে অমল ঘুমোচ্ছে। দীপিতাও ওর সঙ্গেই ছিল। আলতো করে নিজের কোমর থেকে অমলের বাঁ হাতটা নামিয়ে, শাড়ি-ব্লাউজ ঠিক করে নিয়ে বারান্দাতে এসে রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছে দীপিতা।

সপ্তাহে মাত্র এই একটা দিনই অমল দিনের বেলা বাড়ি থাকে। তিরিশে জুন থেকে একতিরিশে অক্টোবর পর্যন্ত জঙ্গলের কাজ বন্ধ থাকে। দেওয়ালির পরেই কাজ আরম্ভ হয়। পয়লা নভেম্বর থেকে সব জঙ্গল খুলে গেছে। এখন অমলকে ও আরও কম পাবে কাছে। কাঠের গুদাম, চেরাইকল, বাঁশের ডিপো, ছড়িয়ে আছে, ওর শ্বশুরমশায়ের। ব্যবসা প্রায় দুশো বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে। বছরভর কাজের সঙ্গে জঙ্গলের ঐসব কাজও দেখতে হবে অমলের উপরন্তু। দীপিতার দেওরেরা অনেকই ছোট অমলের চেয়ে। একজন ক্লাস নাইনে পড়ে, অন্যজন ক্লাস এইটে। সবে। শ্বশুরমশাইও আর কাজ তেমন দেখেন না। পুরনো কর্মচারী আছেন দু'তিনজন—। তাঁদেরই সাহায্যে অমলই পুরো ব্যবসা দেখে এখন।

সারা দিন মন খুলে কথা বলার মতো কারোকেই পায় না দীপিতা। একমাত্র ননদ সিমলি নামধারী কলেজে পড়ে। মেয়েটা ভাল। কিন্তু পড়াশুনা, মাস্টারমশাই এবং বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাছাড়া শাশুড়ি পছন্দ করেন না সিমলি বেশী সময় দীপিতার সঙ্গে কাটাক। মাঝে মাঝে পাশের বাড়ি, বিশ্বাসবাড়িতে যায়। সে বাড়ির ছেলে ভোঁদাই অমলের চেয়ে

একটু ছোট। ভাল গজল গায় সে। তার মা এবং এক বিধবা পিসিই আছেন শুধু বাড়িতে। একমাত্র দিদির বিয়ে হয়েছে বেনারসে। তার নাম বাণী। সে মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি এলে বেশ ভাল লাগে দীপিতার। দীপিতাকে খুবই ভালবাসেন ওঁরা। সাহিত্য, গান-বাজনা, সিনেমা, নাটকের আলোচনা হয় একটু। ওর গান শুনতেও ভালবাসেন ওঁরা। দীপিতা যে একসময়ে ভাল গান গাইত সে কথা আজ মনে পর্যন্ত পড়ে না। তবে গান যার মধ্যে আছে, তার মধ্যে তা কচুরিপানারই মতো থাকে। মরেও মরতে চায় না।

দীপিতার শ্বশুরবাড়ি, কর-বাড়িতে গান গাওয়া মানা। বিয়ের পরে পরে কখনও কখনও চানঘরে আনমনে গান গেয়ে উঠত দীপিতা। শাশুড়ি একদিন বলে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর আয়া সুরাতিয়াকে দিয়ে, এটা বাঈজি বাড়ি নয়। এখানে গান-টান না গাইলেই ভাল।

চানঘরের দরজাতে ধাক্কা দিয়ে সুরাতিয়া শাশুড়ির সেই আদেশ জারি করেছিল।

মরমে মরে গেছিল দীপিতা।

দীপিতা জানে না, কেন তার শ্বশুরমশায় কলকাতা থেকে তাকেই পছন্দ করে ছেলের বৌ করে আনলেন তার পটভূমি জানা সত্ত্বেও। আর বড়মামাই বা কী করে তাকে এমনভাবে এতদূরে নির্বাসন দিলেন! মেজমামা যদিও আলাদা থাকেন পাকপাড়াতে, তিনিও তো কোনো আপত্তি করলেন না। ওর শ্বশুরবাড়ির উপরে যত না রাগ হয় দীপিতার, তার চেয়ে অনেক বেশী অভিমান হয় মামাদের উপরে, বিশেষ করে বড়মামার উপরে। হাত-পা বেঁধে জলে ছুঁড়ে দেওয়ারই মতো করে তাঁরা বিসর্জন দিয়েছেন দীপিতাকে। বিয়ে, তাই দিতে পারলেন এমন ঘরে। আগে জানলে দীপিতা কোথাও পালিয়ে যেত। আত্মহত্যা করত। অমল মানুষটা যদিও খারাপ নয়, তাকে তার মতন করে ভালও বাসে, কিন্তু ভালবাসা জিনিসটা দু'জনের। এতে একজনের ভূমিকা ধর্তব্য নয়। তাই দীপিতার প্রতিমুহূর্তেই মনে হয় এক জেলখানার কয়েদী সে।

ভালমানুষ হওয়াটাই তো মানুষের একমাত্র গুণ নয়। অমলের মধ্যে কোন রস-কষ নেই। সাহিত্য পড়েনি কোনোদিন। গান ভালবাসে না। এক হাতে ক্যালকুলেটর আর অন্য হাতে নস্যির ডিবে নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়, তার বাবার সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যে। নস্যি দু'চোখে দেখতে পারে না দীপিতা ছেলেবেলা থেকে। অমল দীপিতাকে যখন আদর করে, তাও করে ব্যবসা করারই মতো করে, তড়িঘড়ি, তখন অমলের মুখ তার মুখের কাছে এলেই নস্যির গন্ধে দীপিতার বমি পেয়ে যায়।

বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে পথের দিকে চেয়ে তার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝেই এমন হয়।

ওকি পাগল হয়ে যাবে? ভাবে দীপিতা। গুজরাটি চম্পকলাল শাহ; বিড়িপাতা কারবারীর নতুন চারতলা বাড়ি থেকে খুব জোরে টিভি-তে হিন্দী সিনেমার আওয়াজ ভেসে আসছে। ওরা মাঝে মাঝে নানারকম আচার পাঠায় দীপিতাকে। ওদের বাড়িতেও দীপিতার সমবয়সী একটি বউ আছে। নাম নভনীত। সেও থাকত কলকাতাতেই। ভবানীপুরে। তাকেও মাঝে মাঝে তিনতলার বারান্দাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দীপিতা। ওর মনে হয়, ও-ও দীপিতার মতোই দুঃখী। নভনীত কি কোনোদিন তিনতলার বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে পড়বে নীচের রাস্তায়? ভাবলেও শিউরে ওঠে দীপিতা ভয়ে। বুঝতে পারে না, ভয়টা নভনীতের জন্যে, না নিজেরই জন্যে?

চম্পকলালদের একজন মুহুরী আছে, তার মান পোপটলাল। সে গদীঘরের পাশে একতলার একটি ঘরে থাকে। দীপিতাকে বারান্দাতে দেখলেই জানালার সামনে এসে দাঁড়ায় পোপটলাল। লোকটা খুবই অসভ্য আছে। একদিন ধুতির খুঁট তুলে দীপিতাকে দেখিয়েছিল। যদিও অত দূর থেকে দেখা কিছুই যায় না। আর দেখাবার আছেই বা কী ছাই পুরুষদের! কত রকমের বিকৃতিই যে থাকে মানুষের! রাগে গনগন করতে করতে দীপিতা ভিতরে চলে আসে, পোপটলাল জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেই। কিন্তু ভয়ে কারোকেই কিছু বলতে পারে না। যেমন তার শ্বশুরবাড়ি! শাশুড়ি অন্নদা ঠাকুরানী হয়তো বলতেন, তুমি দেখতে চাও, তাই লোকে দেখায়।

ছিঃ ছিঃ! ভাবলেও গা ঘিনঘিন করে দীপিতার। এই যুগে এমন শ্বশুরবাড়িও হয় কারো?

বরানগরে টবিন রোডের কাছে ছিল ওর বড়মামার বাড়ি। মামাবাড়ির পরিবেশ আর এই পরিবেশের মধ্যে কোনোই মিল নেই। একমাত্র মেয়ে পুঁটিকে ও কী করে যে মানুষ করে তুলবে এই পরিবেশে তা ভেবেই পায় না দীপিতা। ভাবতে ভাবতে মাথা ধরে যায়। তবে বড়মামার বাড়ির পরিবেশ-এর কথা ভেবেই বা লাভ কি? বড়মামা তো সব জেনেশুনেই এমন করেছেন।

মেয়ের ডাক নাম রেখেছিল 'কারো'। দীপিতার ভারী পছন্দসই নাম। বিহারের সারাণ্ডার জঙ্গলে তিনটি নদী আছে, কোয়েল, কারো, কয়না।

কিন্তু শ্বাশুড়ি নাতনীকে ডাকেন পুঁটি বলে। অতএব নাম পুঁটি হয়ে গেছে। ভাল নাম ও দেবে ঠিক করেছে চারুমতী। কিন্তু শ্বশুরমশাই বলেছেন স্কুলে নাম লেখাবেন সমলেশ্বরী। ওড়িশার সম্বলপুরে নাকি সমলেশ্বরীর মন্দির আছে। মা দুর্গারই আরেক নাম সমলেশ্বরী। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের চাকরি ছাড়ার পর সেই জঙ্গলেই প্রথমে কাঠের ঠিকাদারী নিয়ে তাঁর অবস্থা নাকি ফেরে। তাই প্রথম নাতনীর নাম রাখতে চান সমলেশ্বরী। আর তিনি চাইলে তাতে আপত্তি করেন এমন মানুষ, ঘাড়ে একাধিক মাথাওয়ালা, এ পরিবারে আর কে আছে!

দীপিতা বলেছিল অমলকে, তোমার বোনের নাম সমলেশ্বরী রাখলেই তো হতো।

অমল বলেছিল, সিমলি নামেরও ইতিহাস আছে। সিমলিপালির জঙ্গলের জন্যেই তার নাম রেখেছিলেন সিমলি।

সিমলিপাল বলো।

দীপিতা বলেছিল।

না, এ তোমাদের কলকাতার কাছের সিমলিপাল নয়, এ সিমলিপালি, ওড়িশারই সম্বলপুর ফরেস্ট ডিভিশানের জুজুমার-এর কাছে। সেই জঙ্গলে, ময়ুরভঞ্জের রাজার ঠিকা নিয়েছিলেন নাকি তিনি। সেই ঠিকা, অতি সামান্য হলেও, ব্রজেন কর-এর প্রথম স্বাধীন ব্যবসা। তার আগে নাকি ওড়িশার বনবিভাগে রেঞ্জারের চাকরি করতেন ব্রজেন কর।

তার শ্বশুরমশায় মানুষটি বড় অদ্ভুত ধরনের। মুখ দেখলে মনে হয় অনেক মানুষ খুন করেছেন। এক আশ্চর্য নিষ্ঠুরতা সারা মুখে আঁকা আছে। খুব কম কথা বলেন। প্রয়োজনে এবং তাঁর মতের বিরুদ্ধাচরণ করলে, তাকে তো বটেই এমনকি নিজের ছেলে অমলকেও তিনি সম্ভবত খুন করতে পারেন। কোনো ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা তো দূরস্থান, বিরুদ্ধাচরণ করার কথা মনে আনার কথা ভাবলেও দীপিতার রক্ত হিম হয়ে আসে।

ব্রজেনবাবুর কোনো বন্ধুবান্ধবও নেই। লোকমুখে শুনেছে যে, গাড়োয়াতে তাঁর এক

মুসলমান রক্ষিতা আছে। সে নাকি দীপিতারই বয়সী। এই কথা ভাবতেও ওর ঘেন্না করে। আগে সেই মেয়েটির মাও ছিল তাঁর রক্ষিতা। প্রতি শনিবার খাওয়া-দাওয়ার পরে ড্রাইভার সুখরামকে নিয়ে গাড়িতে করে তিনি বেরিয়ে যান। ফিরে আসেন রবিবার সকালে। দশটা-সাড়ে দশটাতে। পাঁঠার মাংস সঙ্গে নিয়ে আসেন। গাড়োয়ার পাঁঠার মাংস নাকি খুব ভাল।

তার শাশুড়ি অন্নদাদেবী, যিনি দীপিতার সঙ্গে অকারণেই প্রচণ্ড খারাপ ব্যবহার করেন, তিনিও হয়তো শ্বশুরমশাইকে দীপিতা নিজে যেমন ভয় পায়, তেমনই ভয় পান। নানা হীনমন্যতা থেকেই হয়তো শাশুড়ির স্বভাবে এমন বিকৃতি এসেছে। কে জানে!

ভাল-খাওয়া, ভাল-পরা বড়লোকের বাড়ির বৌ হওয়ার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য ও জাগতিক সুখ হয়তো আছে কিন্তু এমন ভয়ের জীবন, বন্দীদশার জীবন কার কাটাতে ভাল লাগে!

অন্ধকার প্রায় হয়ে এলো। ভিখু চা নিয়ে এলো দোতলা থেকে। বানানো চা খেতে বিচ্ছিরি লাগে দীপিতার। নিজের পছন্দমতো দুধ, চিনি, পছন্দমতো পাতলা লিকার না হলে চা খেয়ে কোনোদিনও আনন্দ পায়নি। বিয়ের পর পর আলাদা করে টি-পট-এ চা, মিল্ক পট-এ দুধ এবং সুগার পট-এ চিনি আনতে বলাতে শাশুড়ি বলেছিলেন, বৌমা! এ বাড়িতে যে নিয়ম চলে আসছে সেই নিয়মই চলবে। তোমার জন্যে নতুন কোনো নিয়ম চালু হবে না।

এমন মানসিক অত্যাচারের মধ্যে বাঁচা যায় না। এতো এবং এতোরকম অত্যাচারই যদি করবেন এঁরা দীপিতার উপরে, তবে অত ঢং করে বড়ছেলের বৌ হিসেবে কলকাতা থেকে এই সুদূর পালামৌতে ওকে নিয়ে এলেন কেন? বারে বারেই গা-রিরি করে ওঠে বড়মামা ও বড়মামীর উপরে। কোনো খোঁজখবর না নিয়েই ওঁরা...। দীপিতার মনে হয়, ওর প্রতি তাঁদের ভালবাসাটা ছিল মুসলমানের মুর্গী পোষারই মতো। অথচ ওঁরা ছাড়া দীপিতার আপনজন বলতে তো আর কেউই ছিলেন না। বড়ই অভিমান হয় ওঁদের উপরে। ওঁদের ভালবাসাটা কি ভড়ং ছিল, কিছুই বুঝতে পারে না দীপিতা। ভাবলে মাথার মধ্যে যন্ত্রণা হয়। দু'চোখ জলে ভরে আসে।

বারান্দা থেকেই ভিখুর হাত থেকে চায়ের কাপ দুটো নিয়ে ঘরে গেল দীপিতা। চা দিয়ে, অমলকে তুলে দিল।

বছরের এই সময় থেকে শীতের শেষ অবধি ডালটনগঞ্জ শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া কোয়েল নদীর পাশে অনেকে বেড়াতে যান। তারপর বেলোয়াটিকারএ প্রকাশের দোকানে ফুচকা খেতে যান। প্রকাশের দোকানের কাছাকাছি ভেলপুরি, বাটাটাপুরি, দোসা, ইডলি এসবও বিক্রি করে অনেকেই। সকলেই যার যার সাইকেল ভ্যান নিয়ে আসে। তার উপরেই দোকান। তাদেরই মধ্যে বাল-বিধবা বাঙালি-বৃদ্ধা কাত্যায়নী মাসিও বসে পাটি-সাপটা, ক্ষীরের পুলি, নারকোলের তক্তি এসব নিয়ে। কাত্যায়নী মাসি অবশ্য নয়াটোলির সব বাড়িতেই আসে।

কাত্যায়নীর সাইকেল ভ্যান নেই। এক কানা ভাইপো আছে। তার নাম বিটকেল। এই বিটকেল আবার ভোঁদাই-এর খিদমদগার। যখন পিসির কাজ থাকে না তখন সে ভোঁদাই-এর ফাই-ফরমাস খাটে। ওকে খুবই স্নেহ করে ভোঁদাই। প্রয়োজন না থাকলেও কাত্যায়নী মাসির কাছ থেকে জিনিস কিনে বিশ্বাস বাড়ির ভোঁদাই অন্যদের বিলিয়ে দেয়। ও বলে, ভিক্ষে তো চায় না। মাসির আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, অভাব যতই থাক না কেন!

বিটকেলই মাসির অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি-কুড়ি সব বয়ে নিয়ে যায়। পিঠে তো গরম করতে হয় না, তাই সুবিধে আছে। পাছে গরমে পিঠেগুলো খারাপ হয়ে যায়, তাই বরফ-কল থেকে এক চাঙড় বরফ কিনে সেই সব হাঁড়ি-কুড়ি কাত্যায়নী বরফের উপরে বসিয়ে রাখে। অবাঙালিরাই বেশি কেনে কাত্যায়নীর জিনিস। বাঙালিরা কখনও কখনও, মুখ বদলাবার জন্যে কিনে আগে মিষ্টি খেয়ে তারও পরে বুধিয়ার তেজপাতা-টেজপাতা দেওয়া সুগন্ধী গরম গোরখপুরী চা খায়। প্রবাসী বাঙালিরা এখনও বাড়িতে মিষ্টি-টিস্টি বানান নানারকম। তাঁরা কলকাতার বাঙালিদের মতো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান হয়ে যাননি। খুবই কষ্ট করে হলেও বাঙালিয়ানা এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন।

বাঙালিরও যে অনেক ভাল ভাল খাবার-দাবার, রান্না-বান্না ছিল, তা কলকাতার বাঙালিরাই বরং ভুলে গেছেন। বিহারের পালামৌ জেলার এই সদর শহর ডালটনগঞ্জের মুষ্টিমেয় বাঙালিরা যে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন আপ্রাণ চেষ্টাতে, একথা অস্বীকার করা যায় না।

দীপিতা বলল, তার স্বামী অমলকে, চা খাওয়া হলে, অ্যাই নিয়ে যাবে নদীর পারে আমাকে একটু ফুচকা খাওয়াতে? তারপরে প্রকাশের দোকানে? চলো না গো!

তারপর বলল, জীপটা তো একমাত্র রবিবারেই বাড়িতে থাকে। তা আমি যে মেয়েটাকে নিয়ে একটু কোথাও যাব, তা কি হবে? নিজেও বাড়ি থেকে বেরোবে না, আমাকেও বেরোতে দেবে না। অদ্ভুত পুরুষ মানুষ তুমি! তাও যদি একটা ড্রাইভার থাকত তোমার জীপের, তাহলেও না-হয় হতো!

ড্রাইভার কোথায় পাব? আমিই ড্রাইভার, আমিই হেল্পার, আমিই মেকানিক। থাকলে তো ভালই হতো, জঙ্গলের পথে-ঘাটে অনেক উপকারে লাগত। যদি একজন হেল্পারও থাকত তাহলেও বুঝতাম। আমার ইচ্ছেতে তো কিছু হবে না। তুমি তো সবই জানো।

জানি বলেই তো বলি যে, তুমি পুরুষ মানুষ নও।

তারপর বলল অমল, পাশের বাড়ির ভোঁদাইকে নিয়ে যাও না। ঐ তো টেবিলের উপরে জীপের চাবিটা পড়ে আছে। আমি আর একটু গড়িয়ে নিই।

ছেলেটির ভাল নামটি তো চমৎকার। অনিকেত। তোমরা সকলেই ওকে ভোঁদাই বলে ডাকো কেন বলো তো?

বিশ্বাস কাকার আদরের রকমই তো ওরকম ছিল। আমরা কী করব। একমাত্র ছেলেকে আদর করে ডাকতেন ভোঁদাই। সেই শিশুকাল থেকে। তাই অমন চালাক-চতুর চৌখোস ছেলেও মুখে মুখে ভোঁদাই হয়ে গেছে সকলের কাছেই।

এটা অন্যায়।

যাকে ঐ নামে ডাকা হয় তার আপত্তি না থাকলে তোমার এতো আপত্তির কি কারণ?

সকলের বরেরাই তাদের স্ত্রীদের নিয়ে যায় আর আমাকে পাশের বাড়ির ভোঁদাইয়ের সঙ্গে কেন যেতে হবে? লোকে কি বলবে! বাইরের লোকের কথা ছেড়েই দিলাম। তোমার মা-বাবা? তাঁরাও আড়ালে অনেক কিছুই বলেন। তাছাড়া তোমার সাঙাত ভোঁদাই তো আর সত্যি সত্যিই ভোঁদাই নয়। সে বেশ বুদ্ধিমানই।

কেন? একথা বলছ কেন? বুদ্ধিমান হওয়া কি খারাপ?

না, তা নয়। তবে এসব ব্যাপারে তোমার পক্ষে বোকাদের উপর নির্ভর করাই ভাল।

কেন? ও কি তোমাকে কিছু...

না, না, সে সব কিছু নয়। তবে কোনোদিন তো কিছু হলেও হতে পারে। এতখানি উদার হওয়া ভাল না। পুরুষেরই জাত তো! তোমরা পুরুষেরা সবাই হনুমানের চেয়েও খারাপ।

অমল বলল, অমন করে বাইরের কারো সামনে আবার বলে বোসো না।

কী বলব?

বি জে পি-র জন্যে এখন গরু আর হনুমান সম্বন্ধে সবসময়ে মুখ সামলে কথা বলবে। কখন কার বিশ্বাসে আঘাত লাগে, কে বলতে পারে। জানোই তো যে পবন-পুত্র হনুমানকে এখানে সকলেই দেবতাজ্ঞানে দেখে। এ তো তোমাদের কলকাতা নয়!

তা হয়তো হবে। কিন্তু জানো তো? আমি সেদিন দিয়েছি হনুমানের শ্রাদ্ধ করে।

হনুমানের শ্রাদ্ধ! কী করে? কেন করতে গেলে? কী সর্বনাশ!

আরে বল কেন? যখন তখন পেছনের উঠোনের পাঁচিল টপকে লাফিয়ে এসে উঠোনে পড়ে দুড়দাড় করবে, একে-তাকে চড়-থাপ্পড় মারবে। মেয়েদের শাড়ি ধরে টানবে। গত সপ্তাহে তো একদিন সিমলিকেও জড়িয়ে ধরেছিল। মেয়েটা ভয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেছিল। রায়দের বাড়ির মিনু বলছিল, জিরাডিয়ার এক অল্পবয়সী নতুন বৌকে নাকি একটা ধেড়ে হনুমান ধর্ষণ করেছে সেদিন।

আহা! কেষ্টর জীব। রামচন্দ্রর। করেছে না-হয় করেইছে। তার ধেড়ে বর তাকে ধর্ষণ করলে দোষ নেই, যত দোষ ঐ ধেড়ে হনুমানেরই!

অমল বলল।

তোমরা তো হনুমানদের দলেই ছিলে এবং আছো চিরদিনই।

দীপিতা বলল, কপট রাগের সঙ্গে।

কালেভদ্রে রবিবারের দুপুরে বড় আদর করে অমল দীপিতাকে। তবে ব্যাপারটা চিরদিনই একপক্ষেরই একচেটে। দীপিতার ভাল লাগা মন্দ লাগাটা অবান্তর। শব-এর মতো শবাসনে শুয়ে অমলকে সবকিছু করতে দেয়। হনুমানের সঙ্গে সত্যিই কোনো তফাৎ নেই অমলের। দীপিতা ভাবে, সব পুরুষই কি এরকমই? তবে ব্যাপারটার পরে শরীরটা ছেড়ে দেয়। আলসেমি লাগে। ঘুম পায়। তাই ঘুমোয় ও।

দিবানিদ্রার পরে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে অমল বলল, হনুমানের শ্রাদ্ধটা কি করলে শুনি।

আরে! বৈদ্যনাথ দাওয়াখানার কজ্জ-হার খান না বাবা!

দীপিতা বলল।

বাবা?

হ্যাঁ-এ-এ। তোমার বাবা।

আরে 'তোমার' বাবা বলার কী দরকার। হ্যাঁ। বাবা তো খানই রোজ রাতে শোবার সময়ে। তোমার নিজের বাবা তো তোমার শিশুকালেই গত হয়েছেন। শুধু বাবা বলতে বুঝি ইচ্ছে করে না?

দীপিতা উত্তর না দিয়ে ভাবছিল তার বাবার যে স্মৃতিটুকু তার মনে দৃঢ়বদ্ধ আছে তার সঙ্গে ব্রজেন কর মশাইকে যে একেবারেই মেলানো যায় না। মরে গেলেও শ্বশুরমশায়কে ও বাবা বলে ডাকতে পারবে না।

এখন বাবার ব্যাখ্যা না করে হনুমানের ব্যাপারটা বল।

স্বভাব-অধৈর্য অমল, বলল তার স্ত্রী দীপিতাকে।

ভিখুকে দিয়ে বড় বড় একছড়া মর্তমান কলা আনিয়ে খোসা আধখানা করে ছাড়িয়ে তার গায়ে ফুটো করে চামচ-চামচ কঞ্জ-হার তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে খোসাতে হালকা করে ফেভিকল লাগিয়ে এমন করে সেঁটে দিয়েছিলাম যে, হনুমান তো দূরস্থান, রামচন্দ্রেরও সাধ্য ছিল না যে কারসাজি ধরতে পারেন।

তারপর?

তারপর আর কি? হনুমান বাবাজী তো হুড়ুম-দাড়ুম করে পাঁচিলের উপর থেকে গোলকিপারের মতো বডি-থ্রো মেরে পুরো কাঁদি নিয়ে লোপাট।

তারপর?

তারপরের দিনে তার অবস্থা যদি দেখতে!

কী রকম?

সে বড় করুণ অবস্থা। উঠোনের ও-পাশের বড় সাদাফুলের গাছটার এডালে ওডালে একবার দাঁড়ায় তো আরেকবার বসে, গালে হাত দিয়ে শুয়ে থাকে, একেবারে চলচ্ছক্তিহীন, সারাদিন। ঐ গাছটাতেই ওর আস্তানা ছিল কি না!

তারপরে?

তারপর থেকেই এ-তল্লাট ছেড়েছে। আর একদিনও আসেনি। প্রায় পনেরো দিন হয়ে গেল।

বুঝবে। যেদিন তোমাকে ধর্ষণ করে এর প্রতিশোধ নেবে। হনুমান বলে কথা।

অমল বলল।

দীপিতা মুখে কিছুই বলল না। কারণ, সব কথা মুখে বলার নয়। যে-সব স্বামী তাদের স্ত্রীদের শুধু ধর্ষণই করে, আদর কী করে করতে হয়, সোহাগ কাকে বলে, শৃঙ্গার কি? সে সম্বন্ধে যাদের কোনো ধারণাই নেই, যারা স্ত্রীর শরীরকে জমিদারীর অঙ্গ বলে মনে করে সেই শরীরকে যন্ত্রের মতো কর্ষণ করে, সেই স্ত্রীকে হনুমানেই ধর্ষণ করল না অন্য কেউ করল তাতে স্বামীর কি?

মাঝে মাঝে অমল স্বগতোক্তি করে, বুড়ো কি আর বয়সে হয়েছি! জীবনই বুড়ো করে দিল। এত পরিশ্রম কোনো মানুষের সহ্য হয়? আমার শরীরটা তো বুড়ো হয়েইছে, মনটাও বুড়িয়ে গেছে একেবারেই। কিছুতেই আর আনন্দ পাই না। এতো বড় আর এতো ছড়ানো ব্যবসা। একা হাতে দেখা কি সম্ভব? বাবা তো ..কমল আর বিমল যে কবে এসে ব্যবসাতে বসবে! তখন আমি একটু রিলিফ পাব।

কেন? বাবা তো রোজই অফিসে যান। বাবা কিছু দেখেন না?

দীপিতা জিজ্ঞেস করেছিল।

বাবা তো যান একবার সন্ধ্যের আগে আগে। হিসেবটা দেখতে যান। কত বাকি পড়ল, কত আদায় হলো। মুহুরী জিতেনবাবুর সঙ্গে বসেন। কত এক নম্বরে দেখাবেন, কত দু'নম্বরে করবেন সে সব। চেক এর পেমেন্ট তো দেখাতেই হয়। যা লাভ হয় ব্যবসা থেকে তার দশ ভাগও তো দেখানো হয় না। টাকা-ফাকা গুনে, সঙ্গের থলেতে পুরে বাড়ি নিয়ে আসেন। বাবা এখন এছাড়া আর কি করেন? অবশ্য টাকার বদলে সরকার কি দেয়?

গরীবদের ভাল করলেও না হয় হতো। তবু তো যারা দেয়, তাদের টাকাতেই এত বড় দেশ চলে। এটা খারাপ। সরকার যার ভাত খায়, তাকেই কিল মারে। এমনটি হওয়া উচিত নয়।

তারপরেই বলল অমল, এসব কথা তুমি আবার বোলো না যেন কারোকে। মেয়েদের কিছু বলাই বিপদ।

তা অত যে টাকা রোজগার হয়, তুমি যে গাধার মতো উদয়াস্ত খাটো, তা তোমাকে বাবা সেই পাঁচশ টাকাই তো দেন হাতখরচা। তাও তো তোমার একার জন্যে নয়, তোমার আমার পুঁটির তিনজনের সব খরচই তার থেকে চালাতে হয়। তোমাকে দু নম্বর থেকে কিছু দেন না বাবা?

পাগল!

মিথ্যে কথা বলল অমল দীপিতাকে। তারপরই বলল, বাঃ! মাথার উপরে ছাদ দিয়েছেন, খেতে দিচ্ছেন, পুজোতে, পয়লা বোশেখে নতুন জামা-কাপড় দিচ্ছেন আমাকে-তোমাকে-পুঁটিকে। এই তো যথেষ্ট। জীপ গাড়ি দিয়েছেন।

হুঁঃ। সে তো কাজ করার জন্যে, তাঁরই ব্যবসা দেখার জন্যে। জীপ গাড়ি ছাড়া দিন-রাত বন-জঙ্গলে দাবড়ে বেড়াতে পারতে? অত জায়গার কাজ সামলাতে পারতে এক হাতে? তোমার নিজস্ব কাজে বা আমাদের নিয়ে তো কোথাওই যেতে পারো না। তোমার জীপ গাড়ি কোনো ব্যক্তিগত কাজে লাগে কি আমাদের? সকাল সাতটাতে বেরিয়ে যাও, আসো রাত ন'টায়। তার উপর আজ রাঁচী, কাল পাটনা, পরশু শোনপুর, তার পরদিন হাজারীবাগ, তারও পরদিন মহুয়াডাঁর। তুমি থাকো কদিন ডালটনগঞ্জে? একা হাতে পুঁটিকে দেখে, তোমার মা-বাবা দুই ভাই আর বোনের মন যুগিয়ে চলতে আমার দম বন্ধ হয়ে যায়। একটু যে গল্পের বই পড়ব একটা, তারও উপায় নেই। লাইব্রেরির মেম্বারশিপও ছেড়ে দিতে হলো। তোমাদের কোনো কালচার নেই। তোমরা খোট্টা হয়ে গেছ। অবশ্য দোষ সব আমারই। বাবা-মরা গরীবের মেয়ে না হলে কি আর কলকাতা থেকে এই ডালটনগঞ্জে নির্বাসিত হই? সবই আমার কপাল।

কেন? লাইব্রেরি ছেড়ে দিয়েছ কেন?

আমাকে বই কে এনে দেয়?

কেন? কমল-বিমলকে বলো না কেন? সিমলিও তো এনে দিতে পারে।

কমল বিমলের সময় কোথায়? ক্যারাম চ্যাম্পিয়নশিপ, ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ, অষ্টপ্রহর সাইকেল রেস, ভলিবল, ফুটবল, তারপরে থিয়েটারের মহড়া। তাছাড়া...

তো ওরা পড়ে কখন?

পড়ে না যে তা নয়, পড়ে। বেশি পড়েই বা কী করবে? তোমার বাবা তো কোনোক্রমে বি.কমটা পাশ করিয়েই ব্যবসাতে বসাবেন। তোমাকে কি চার্টাড অ্যাকাউন্ট্যান্সি পড়তে দিয়েছিলেন? তুমিই তো বলেছ যে রাঁচির মুখার্জি কোম্পানি তোমাকে আর্টিকেল্ড ক্লার্ক নেওয়ার ব্যাপারে রাজীও হয়ে গেছিলেন। টাকা রোজগার করাটাই তোমাদের পরিবারে সবচেয়ে বড় গুণ।

অমল হঠাৎ চটে উঠে বলল, পরিবার তুলে কথা বলবে না বলে দিচ্ছি।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলল, আমার কথা ছাড়ো। দশটা গাধা মরে একটা বড় ছেলে জন্মায়। আমার সঙ্গে ওদের কী তুলনা! ওরা তো রাজপুত্র। ওরা

বড়লোকের বেটা। বাবা কেমন বেটা! বেটা! বলে ওদের আদর করে ডাকেন, শোনো না? আমি তো বড়লোকের 'বেটা' ছিলাম না। আমি যখন জন্মেছিলাম তখন বাবা তো গরীব, সৎ, সামান্য মাইনের একজন বিট অফিসার। রেড়াখোলের জঙ্গলে তখন পোস্টিং ছিল শুনেছি বাবার।

তারপরে একটু চুপ করে থেকে দীপিতাকে বলল, তোমার দু'একটা কাজ তো ওরা করে দিতে পারে। আমি যখন পরিবারের ব্যবসাতেই সারাদিন বাইরে বাইরে থাকি।

কিন্তু আমার যে ওদের কোনো কাজ করতে বলতেই ইচ্ছে করে না। তাও কমলটার স্বভাবটা ভাল। মিষ্টি ছেলে। যতটুকু করার তা তো ঐ করে। বৌদি বলে মানেও। বিমলটাকে তো কিছু বলতেই ইচ্ছে করে না। তার উপরে যে-কটা টাকা তুমি আমাকে দাও তা থেকে বিমল প্রায় জোর করেই প্রতি সপ্তাহেই সিনেমা দেখার জন্যে আমার কাছ থেকে টাকা চায়। ওর ভয়ে তোমাকে বলতে পর্যন্ত পারি না। আর ওর যা বন্য স্বভাব, ভয়ে, ওকে নাও করতে পারি না।

প্রতি সপ্তাহেই সিনেমা দেখে বিমল? বলো কি তুমি? কী সিনেমা দেখে?

তা আমি কী করে জানব? আমাকে নিয়ে কি একদিনও সিনেমা দেখতে গেছ তুমি?

আজকাল নাকি সব ভিডিও-পার্লারে থ্রী-এক্স ছবি দেখায়?

চিন্তিত মুখে বলল অমল।

সেটা কি জিনিস? থ্রী-এক্স?

মানে পর্নোগ্রাফিক ছবি আর কী।

মানে?

আরে একেবারে উদোম ছবি। নায়ক-নায়িকার গায়ে একটু সুতোও থাকে না। তার ওপর নানারকমের পারভার্সন।

মনে মনে বলল, দেখতে তো ভালই লাগে। সে নিজেও দেখে মাঝে মধ্যে। তাই জানে।

তারপরে হেসে, গলা নামিয়ে বলল, চলো, একদিন আমরাও দেখে আসি।

আমার দরকার নেই। তুমি দেখো গিয়ে। যেমন ভাই, তেমনই তো হবে দাদা। তোমাদের পরিবারের রুচিটাই বিকৃত।

অ্যাই! আবার! পরিবার তুলে কথা বোলো না। সাবধান! তাছাড়া রুচি ব্যাপারটা চিরদিনই ব্যক্তিগত।

তাই? হবে।

সাবধান কথাটা এমন করে বলল অমল যে, ভয় পেয়ে গেল দীপিতা।

সেই মুহূর্তে দীপিতার মনে হলো যে, সে বিমলেরই দাদা।

ওর মনে পড়ে গেল বড়মামা একটা কথা বলতেন, 'Blood is thicker than water'। কথাটা বোধহয় ঠিকই।

রুচি-ফুচি নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোথায় পেলাম।

অমল বিরক্তির গলাতে বলল। স্কুল ফাইন্যাল পাশ করার পরই তো বাবা ব্যবসাতে ঢুকিয়ে দিলেন। ব্যবসা দেখতে দেখতেই তো কোনোক্রমে বি-কমটা পাশ করলাম। আমি তো চেয়েছিলাম চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পড়ি। বড় কোম্পানিতে চাকরি করি পাশ করে। কিন্তু কাঠ, বাঁশ, ওয়াগন, রেক, ঢোলাই, লাদাই, কাটাই, চেরাই, কুলি-কামিন, মেট-মুন্সী,

এই সব নিয়েই তো কেটে গেল বছরগুলো। বাইশ বছর বয়সে বিয়ে হলো। তখন তোমার উনিশ। তারপরে এই পাঁচ বছরেই বুড়ো। বিয়ের পরে পর একবারই তোমার বরানগরের বড়মামার বাড়িতে গিয়ে যা তিনদিন ছিলাম। তাছাড়া তো লম্বা ছুটিও পেলাম না একদিনও। সব শখই মরে গেছে এখন। জীবনে আনন্দ বলতে আর কিছুই নেই। প্রতি রবিবার একটু শুয়ে-ঘুমিয়ে গায়ের ব্যথা মারা ছাড়া আর কোনো আনন্দই আমার নেই।

আর আমার আনন্দ বলতে কি আছে?

কেন? আমি।

তা আছ। তবে তোমার আনন্দ আরও আছে।

কী রকম?

কেন? তোমার মা? হয়তো আরও আছে। যা, আমি জানি না।

অমল বলল, মা তো আছেনই। মা তো সকলেরই থাকে। কিন্তু তুমি আসার পরে মা যেন আমাকে অনেকই দূরে ঠেলে দিয়েছেন। আগের মতো আর ভালবাসেন না। এখন মায়ের কাছে কমল-বিমলই সব।

আমি তো মা-বাবা-দিদিদের পাঁচ বছর বয়সেই হারিয়েছি। তুমি ভাবো তাই। কোনো মা-ই কি তাঁর ছেলেকে পর ভাবতে পারেন?

পারেন। পারেন। ইমরাত খান বলে যে, পুরুষ যখন যার বুকে মুখ রাখে, সে তারই বশ হয়। মা জানেন যে...

অদ্ভুত কথা, ঝাঁঝের সঙ্গে বলল দীপিতা।

অমল বলল, জানি না, মাঝে মাঝে মনে হয়, বাবা আমাকে একটি যন্ত্রর মতো ব্যবহার করছেন এবং করে যাবেন তাঁর পরিবারের ভবিষ্যৎ-এর জন্যে, পরিবারের সুরক্ষার জন্যে। এছাড়া আমার আর কোনোই ভূমিকা নেই। সেই প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে হয়তো আমিও বেকার হয়ে যাব।

বাবা তোমার কথা তো শতমুখে বলেন। সবসময়েই।

দীপিতা বলল।

তাই না কি? কি রকম?

বলেন, অমলই তো সব। অমলই তো ব্যবসা দেখে। আমি তো এখন কিছুই আর করি না। অমলই মালিক।

অমলের মুখ এক কুটিল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

বলল, বাবা তাই বলেন?

তাই তো বলেন। আমার কাছেই বলেন। বলেন অবশ্য যখন আর কেউই সামনে থাকে না।

আহা! কী বলেন তা বলো না।

'অমলের ব্যবহার ভাল, কাজও সব শিখেই গিয়েছে। খুব খাটতেও পারে। আমার আর কী চিন্তা!'

তাই?

অমল বলল, উত্তেজিত হয়ে বিছানাতে উঠে বসে, মাথার বালিশটাকে কোলের কাছে নিয়ে। তারপরে হেসে বলল, মাই ফাদার ইজ এ গ্রেট ম্যান।

হাসিটা দুর্বোধ্য ঠেকলো, দীপিতার চোখে।

একটু চুপ করে থেকে বলল, চলো, লুঙ্গিটা ছেড়ে ধুতিটা পরে নিই।

কেন? হঠাৎ?

আজ তোমাকে ফুচকা খাইয়েই আনি প্রকাশের দোকান থেকে। তোমার এতোদিনের শখ!

অ্যাম্বাসাডার গাড়ির ড্রাইভার সুখরাম বাড়িতেই থাকে। তবে বাবার অথবা বাবার নির্দেশমতো ডিউটিই সে করে। এ-বাড়িতে কারও অধিকার নেই অ্যাম্বাসাডর নিয়ে কোথাওই যাবার। এমনকি মায়েরও নয়। তবে সিমলিকে বাবা কিছু বলেন না। অনেক সময়ে বাবাকে না বলেই সিমলি গাড়ি নিয়ে যায়। দীপিতার শ্বশুরমশাই ব্রজেন কর অন্য ধাতুর মানুষ। ডিকটেটর। বাঘ। এক জায়গাতে যে দুটি বাঘ থাকতে পারে না কখনও, একথা তিনি প্রায়ই বলে থাকেন।

তবে সুখরাম ড্রাইভার জীপের টায়ার-ফায়ার প্রয়োজনে বদলে দেয়। খারাপ ব্যবহার করে না অমলের সঙ্গে। গ্যারাজে অ্যাম্বাসাডর আর জীপটা পাশাপাশিই থাকে।

অমল লুঙ্গি ছেড়ে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে চাবিটা আর মানি ব্যাগটা টেবল থেকে তুলে নিয়ে জীপটা বের করল গ্যারাজ থেকে। দীপিতা তাড়াতাড়ি শাড়িটা ছেড়ে, মুখে একটু পাউডার বুলিয়ে আর চোখে একটু কাজল দিয়ে নিল। অমল দীপিতাকে তুলল, তুলে লেভেল ক্রশিংএ আসতেই ভোঁদাই-এর সঙ্গে দেখা। পাশের বাড়ির ভোঁদাই।

ভোঁদাই বলল, গন্ধ-টন্ধ মেখে বৌকে সাজিয়ে-গুজিয়ে কোথায় চললে গুরু?

অমল বলল, গুরু হয়ত ছিলাম এককালে। এখন যা দিনকাল পড়েছে, চেলার যা চেকনাই, তাতে বলতে হয় গুরু 'গুড়ই' রয়ে গেছে আর চেলা 'চিনি' হয়ে গেছে।

তারপরই বলল, যাবি নাকি? নদীর ধারে যাচ্ছি। ফুচকা খেতে। তারপর যাব প্রকাশের ওখানে।

চলো। তুমি বললে, গুরু জাহান্নমেও যাব।

বলেই, দীপিতার গা ঘেঁষে সামনের সিট-এ উঠে বসে পড়ল ভোঁদাই।

দীপিতা অমলের দিকে সরে এল। মুখে কিছু বলল না। দীপিতা জানে যে, ভোঁদাই তাকে খুবই পছন্দ করে। বেচারী। না হয় বসলোই একটু পাশে। দীপিতাও পছন্দ করে ভোঁদাইকে এবং তাদের বাড়ির সকলকে।

দীপিতা কলকাতার সুন্দরী মেয়ে। সুন্দর করে সাজে। সাবলীলভাবে কথা বলে। ভাল গান গায়, ডালটনগঞ্জের মতো শহরে ভোঁদাই-এর মতো অনেক পুরুষই তার কাছে আসতে চায়। এটা বুঝতে পেরে ও খুশি যেমন হয়, তেমন অস্বস্তিও বোধ করে। ভাল লাগার মতো পুরুষ এখানে দেখে কোথায়? তাকে হয়তো অনেকের ভাল লাগতে পারে কিন্তু তার কারোকেই ভাল লাগে না। একমাত্র ভোঁদাইকে ছাড়া। কিন্তু নামটা একেবারে যাচ্ছেতাই। ওর কি কোনো ভাল নাম নেই?

ফেরার পথে রেড়মাতে ভোঁদাই নেমে গেল ঝাভুরাম-এর পেট্রল পাম্পে। বলল, একটু আড্ডা মেরে যাই।

ভোঁদাই-এর কোনো অকুপেশান নেই। ওর বাবা, অনাদিবাবুর অবস্থা খুবই ভাল ছিল। লোকমুখেই শুনেছে দীপিতা। তিনি মোটর ভেহিকেলস-এর ইন্সপেক্টার ছিলেন। অন্যান্য

ব্যবসাও ছিল। দু'হাতে পয়সা রোজগার করেছেন। যেমন শুনেছে যে, করেছেন তার শ্বশুর ব্রজেন করও, ওড়িশার বন বিভাগে চাকরি করে। এও শুনেছে যে, ভোঁদাই-এর বাবা মানুষটি খুবই ভাল ছিলেন।

সততা মানুষের মস্ত বড় গুণ, কিন্তু সততাই মানুষের একমাত্র গুণ নয়। একজন সৎ মানুষও মানুষ হিসেবে অত্যন্ত খারাপ হতে পারেন আবার অসৎ মানুষও ভাল হতে পারেন। অনাদিবাবু অনেকের জন্যে অনেকই করেছেন নাকি! মায়া-দয়া ছিল। এবং প্রতিবেশী হলেও ব্রজেন কর-এর সঙ্গে তেমন মাখামাখি ছিল না। গত হয়েছেন বছর সাতেক হলো। তাছাড়া, মানুষটির গান-বাজনা, সাহিত্য এসব বিষয়েও যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। নিজে ভাল এসরাজ বাজাতেন।

সবই অবশ্য শোনা কথা। দীপিতার বিয়ের আগেই উনি গত হয়েছেন। ভোঁদাইদের জায়গা-জমি আছে লাতেহারের দিকে অনেক। কোম্পানির কাগজ-টাগজ ছাড়াও জমি থেকেও আয় খুবই ভাল। মঘাই পান, খুশবুদার জর্দা, ভাল গান শোনা, বাংলা সাহিত্য পড়া, ভাল হিন্দী সিনেমা দেখা আর মাঝে মধ্যে ইমরাত খানদের সঙ্গে রাতের চোরা শিকার, এইই শখ ভোঁদাই-এর। মাঝে মধ্যেই চুরি করে শিকার করা হরিণের বা শম্বরের বা শুয়োরের মাংস পাঠায় ভোঁদাই, অমলদের বাড়িতে। তিতির-বটেরও পাঠায়। ক্বচিৎ মুরগী। তবে দীপিতা বা বাড়ির অন্য কেউই শুয়োরের মাংস খায় না। শুধু অমল খেতে ভালবাসে। তাই ভোঁদাই, অমলের জন্যে আলাদা করে রান্না করে পাঠায়। কচ্ছপের পিঠ-এর মতোই শুয়োরের নদনদে চর্বি কচকচ করে খেতে খুব ভালবাসে অমল। তবে দীপিতা এই সব শিকার-করা মাংসের কোনো মাংসই খায় না। বলে, এই সব সুন্দর পাখি, হরিণ এসব কেউ মারে! তাছাড়া, মারা যখন বে-আইনীও, তখন মারাই বা কেন!

দীপিতা বড় বড় চোখে তাকিয়ে অমলের এইসব পশু-পাখি খাওয়া দেখে আর বলে, তুমি একটি রাক্ষস।

আমার কি? আমি তো আর মারিনি। অন্যে মেরে খাওয়ালে আমার দোষ কি? তবে কোনোদিন ওরা ধরা পড়লে কিন্তু জেলে যাবে। ইমরাত খান এক সাংঘাতিক চরিত্র। ওকে এড়িয়েই চলে অমল। ভোঁদাই যে কেন ওর সঙ্গে যায় রাতের শিকারে, জানে না অমল। জীবিকা হিসেবে ইমরাত কী করে তা ঠিক কারোই জানা নেই। ও নাকি আই. এস. আই-এর স্পাই। ওর কাছে নাকি নানারকম আগ্নেয়াস্ত্র আছে। ইমরাত খান সত্যিই বিপজ্জনক মানুষ মনে হয়। তবে ভোঁদাই-এর অন্য কোনো নেশা বা দোষই নেই। কখনও সখনও একটু মহুয়া বা রাম খায়। বেহেড হয় না কখনওই।

ভোঁদাই-এর চরিত্রটা টু-টিয়ার। ওকে বাইরে থেকে দেখে যা মনে হয় ভিতরে ও তা আদৌ নয়। মাঝে মাঝেই, শিশুকাল থেকেই ওকে হেঁয়ালি হেঁয়ালি লাগে।

গত একবছর হলো, অমলের কেবলই মনে হয় যে, ভোঁদাই দীপিতার প্রেমে পড়েছে। ভোঁদাই-এর মা ও পিসীমা দীপিতাকে খুবই ভালবাসেন। ওকে ডেকে নিয়ে ওর গান শোনেন। অতুলপ্রসাদ ও রজনীকান্তর গান খুবই ভাল গায় দীপিতা। রবীন্দ্রনাথের গানও গায়। গল্পের বইও ধার দেন ওঁরা। কলকাতা থেকে অনেক পত্র-পত্রিকা, 'দিশা-সাহিত্য', 'তথ্যকেন্দ্র' 'নবকল্লোল', 'উদ্বোধন' আসে ওদের বাড়িতে। নানা লেখকের সমগ্র রচনাবলীও আছে কম নয়। তাই ওদের বাড়ির সঙ্গে দীপিতার বেশ মাখামাখি। এই ডালটনগঞ্জের

বিহারি পরিবেশে, বিড়িপাতা, লাক্ষা আর বাঁশ-কাঠের কারবারীদের মধ্যে বাংলার সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং বাঙালিয়ানা শুধু ভোঁদাইদের বাড়িতেই বেঁচে আছে ভোঁদাই-এর মা-পিসীমারই জন্যে।

ভোঁদাই এখানকার পাঁকি রোড-এর ছেলেদের কলেজ, জি. এল. এ. কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেছে ইংরেজীতে, অমলের বি.কম. পাশ করার দু বছর পরে। এখন সে কলেজে এম. এ.-ও পড়া যায়। তখন সে সুযোগ থাকলে এম. এ. টাও করে নিত। খারাপ ছিল না ভোঁদাই আদৌ পড়াশুনোতে।

এখানে একটা কথা চালু আছে। যদি বহিরাগত কেউ এখানের কারোকে জিজ্ঞাসা করেন, লেখাপড়া কতদূর করা হয়েছে? তখন অন্য জনে বলবে, আমি L.L.P.P.

প্রথম জন স্বাভাবিক কারণেই ভাববেন L.L.P.P. বুঝি কোনো ভারী ডিগ্রীই হবে। কিন্তু আসলে L.L.P.P. 'লিখ লোড়া, পল্ পাত্থল'। অর্থাৎ, শিলনোড়া দিয়ে লেখে আর পড়ার মধ্যে পাথর পড়ার কথা জানে।

ভোঁদাইও অবশ্য অমলেরই মতো আধা-বিহারি। পালাম্যুর ঠেঁট উচ্চারণে বাংলা বলে ওরা। যারা কখনও শোনেনি, তাদের কানে আজব ঠেকে। ওরা তবু বলে 'আমরা বাঙালি হচ্ছি'। দুর্গাপুজো করছে, বিজয়া-সম্মিলনী, পুজোর পরে থিয়েটার, যাত্রা, কালীপুজো। এখনও কলকাতায় নববর্ষ যতখানি উদ্দীপনার সঙ্গে উদযাপিত না হয়, প্রবাসে তার চেয়ে ঢের বেশি উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হয়। এই প্রজাতি বড় নস্টালজিক। পুরনো শিকড়ের কথা এরা ভুলতে পারেনি। পারবেও না। প্রবাসী বাঙালিরা কলকাতার বাঙালিদের মতো আঁতেল, ঈশ্বর-অবিশ্বাসী, ধর্ম-বিমুখ এবং নিজস্বার্থপরায়ণ হয়ে ওঠেনি। এখনও অনেকই ভালত্ব রয়ে গেছে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে।

তবে আগেকার দিনের মতো গর্ব করার মতো বাঙালি আজকাল প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যেও কমই দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গেই দেখা যায় না, তার প্রবাসের দোষ কি?



ভোঁদাই জীপ থেকে নেমে যাবার পরে দীপিতা বলল, বছরে হয়ত একটা সন্ধে আমাকে নিয়ে বেরুলে, তবু সঙ্গে ভোঁদাইকে না জোটালে হতো না?

কী বলতে চাইল দীপিতা তা ঠিক না বুঝেই অমল বলল, আরে! ছেলেবেলায় ফুটবল খেলেছি কত একসঙ্গে। পাশের বাড়ির পড়শি। ওদের বাড়িতেই তো পড়ে থাকতাম। একটা সময়ে। অ কাকা, অনাদি কাকা খুবই ভালবাসতেন আমাকে। বাবাও যেমন ভোঁদাইকে বাসেন। আজকাল ওকেও তো একটুও সময় দিতে পারি না। বিমল-কমল তো আমার চেয়ে দশ এগারো বছরের ছোট। ওদের সঙ্গে তো বন্ধুত্ব হতো না। এখনও হয় না। হয়তো আরও বছর পাঁচেক পরে যখন ওরাও আরেকটু বড় হবে, তখন হবে। কে জানে! হয়তো তখনও হবে না। বন্ধুত্ব হয় মনের মিল, ধ্যান-ধারণার মিল, শখের মিল থাকলে। রক্তের আত্মীয় হলেই কি কেউ আপসে কারও বন্ধু হতে পারে?

তারপর বলল, তাছাড়া, ভেবে দ্যাখো, ভোঁদাই-এর মনে তো দুঃখ হতে পারত ওকে যেতে না বললে।

তোমার কাছে সকলেরই দাম আছে, সকলের দুঃখর কথাই তুমি ভাব, শুধু আমারই কোনো দাম নেই।

আরে তুমি যে আমার ওয়াইফ। তুমি তো আমারই একটা পোর্শন। তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ কোথায়? তোমার সঙ্গে আর কার তুলনা চলে? কোথায় তুমি আর কোথায় ভোঁদাই। তুমি বড় বোকার মতো কথা বলো আজকাল।

বোকা তো আমি নিশ্চয়ই।

জীপ থেকে নেমে যাবার আগে নদীর ধার থেকে ফেরার সময়ে ভোঁদাই বলেছিল, পরের শনিবার রাতে আমাদের বাড়িতে পিসীমার ছোট জা-এর ছেলে আসছে। সে রাঁচীতে হেভি এঞ্জিনীয়ারিং-এ চাকরি নিয়ে এসেছে। এঞ্জিনীয়ার ছেলে। কলকাতার। কিন্তু এঞ্জিনীয়ারিং পাস করেছে খড়্গপুরের আই. আই. টি থেকে। আগামী শনিবার রাতে তোমাদের দুজনের আমাদের ওখানে যেতে হবে। খেতেও হবে। মা ও পিসীমা বলে দিয়েছেন। সিমলিকেও বলব। কলকাতার ছেলে এসে আমাদের গোল দিয়ে যাবে তা হতে দেওয়া হবে না। আমাদেরও গোলকীপার আছে।

মানে?

অমল বলেছিল।

আমরাও টকরাব। সে যদি তকরারএ যায় তো তকরার করব। দীপিতা বৌদি আমাদের ডালটনগঞ্জকে রিপ্রেজেন্ট করবে। তাই কথা হয়েছে। কোন শালা বলে যে এখানে ভদ্রলোকে থাকে না।

বলে নাকি কেউ? কে বলে? সে শালার ঘাড়ে ক'টা মাথা?

অমল বলল, হাসতে হাসতে।

ভোঁদাই বলল, তাদের মাফ করে দাও অমলদা। পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়।

তিনি কি একা আসছেন? তাঁর স্ত্রী আসবেন না?

দীপিতা শুধিয়েছিল।

স্ত্রী থাকলে তো আসবেন? দাও না দেখে একটা ভাল মেয়ে। বয়স তো বেশি নয়। আমাদের চেয়ে ছোট। তোমার বয়সী হবেন, যা শুনেছি।

মেয়ের অভাব কি বাঙালিদের মধ্যে? সস্তা বলতে তো একমাত্র মেয়েরাই।

ভোঁদাই বুঝেছিল যে, কথাটাতে একটু খোঁচা আছে।

দীপিতা বলেছিল, আগে পাত্রকে নিজ চোখে দেখি। তারপর ঠিক করে দেব মেয়ে। কঠিন কাজ আর কি?

দিও তো। মা ও পিসীমাও তোমাকে বলবেন বলেছেন।

এই কথা রইল। তাহলে বিকেল-বিকেলই চলে এসো দু'জনে। পুঁটিকেও নিয়ে এসো।

তোমার পিসীমার ছোট জায়ের ছেলের নাম কি?

ভাল নাম জিজ্ঞেস করিনি। ডাক নাম, কাট্রুস।

কী নাম বললে?

কাট্রুস।

ও মা! কাট্রুস মানে কি?

কারোই ডাক নামের আবার মানে হয় নাকি?

অমল বলল, আছে আছে। কাট্রুস একরকমের গাছের নাম। নর্থ বেঙ্গলে হয়। দুবেজী, ডি এফ. ও.-র কাছে শুনেছি। উনি ছিলেন কিছুদিন নর্থ বেঙ্গলের বক্সা ডিভিশনে।

ভোঁদাই বলল, তুমি চেন সে গাছ?

আমি চিনব কী করে? পালামৌ-রাঁচী-হাজারীবাগে ও সব গাছ নেই।

দীপিতা ভাবছিল, ও চেনে। মানে চিনত একজন কাট্রুসকে। তবে এই কাট্রুস সে কখনওই হতে পারে না। দীপিতার জীবন থেকে সেই কাট্রুস ভো-কাট্টা ঘুড়িরই মতো কাট্রুস হয়ে গেছে দীপিতার বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই।

তারপর মুহূর্তের জন্য ভাবল, স্বপ্নে কত কী ঘটে। যদি এই কাট্রুস সেই কাট্রুস হয়। সেও তো এঞ্জিনীয়ারিং পড়ত।

দীপিতার সুখ স্বপ্ন ভেঙে তাকে চমকে দিয়ে ভোঁদাই বলল, বৌদি, তিনি নাকি গানও গান। তোমার সামনে গাইলেই মাল ক্যাচ হয়ে যাবে। একটু গলাটাও সেধে রেখো কিন্তু বৌদি। দেখো ব্যাংলো-বিহারিরা যেন পিওর কলকাত্তাইয়ার কাছে হেরে না যাই।

দীপিতা কথা না বলে, মুখ টিপে হেসেছিল। তারপরই গম্ভীর হয়ে গেছিল।

অমল বলেছিল, মেয়েলি-পুরুষ ছাড়া কেউ গান গায়! ধুস-স-স-স।

ভোঁদাই হেসে বলেছিল, নিজের গলাতে রামছাগল বেঁধে রেখেছ তাই ও কথা বলছ। বড়ে গুলাম আলি সাহেব বা কালে খাঁ সাহেব কি মেয়েদের মতো দেখতে ছিলেন?

তারা আবার কারা?

অমল বলল।

সে কথাতে ভোঁদাই এবং দীপিতা দুজনেই একসঙ্গে জোরে হেসে উঠল।

অমল লজ্জা পেয়ে বলল, হাসবার কি আছে?

ভোঁদাই বলল, তোমারই বা লজ্জা পাবার কি আছে? ওঁরা কি বলতে পারতেন পালাম্যুতে কতরকম বাঁশ হয়? অথবা কাট্রুস মানে কি? সবাই কি সব জানতে পারে? তবে গানবাজনা ভাল না বেসে, জানতেই পারলে না কী মিস করলে জীবনে।

অমল চুপ করে থাকল।

বাড়িতে ফিরে দীপিতা গারাজের সামনে জীপ থেকে নেমে ভিতরে গেল। অমল বলল, জীপটার হাওয়া চেক করিয়েই আসছি। কাল সকালেই টুটিলাওয়ার কাঠগোলায় যেতে হবে টোড়ি, বাঘড়া-মোড়, সীমারীয়া হয়ে। একেবারে ভোরে বেরোব। ডালটনগঞ্জ থেকে টোড়িই তো সাতান্ন মাইল। উল্টো দিকে যেতে গেলে সকালে দেরী হয়ে যাবে। হর্নটাও একটু দেখিয়ে নিতে হবে। মাঝে মাঝেই গোলমাল করছে। লুজ-কানেকশন হয়েছে বোধহয়।

ঘাড় এলিয়ে, নিরুচ্চারে, ঠিক আছে বলে, দীপিতা যখন ভিতর বাড়িতে গেল, দেখল ভিখুর মা সুরাতিয়া পুঁটিকে হাতে ধরে নিয়ে দোতলা থেকে নামছে। গম্ভীর মুখে সুরাতিয়া বলল, মা তোমাকে ডেকেছে বহুদিদি। না বলে কয়ে কোথায় চলে যাও হুট করে!

দীপিতার খুব রাগ হলো। সম্ভবত মাস দেড়েক পরে আধ ঘণ্টার জন্যে স্বামীর সঙ্গে বেরিয়েছিল। সে জন্যে...

দোতলাতে উঠতেই শাশুড়ি বললেন, তুমি কি স্বাধীন হয়ে গেছ বৌমা? বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ে একটু বলেও যেতে পারো না?

হাসিমুখেই দীপিতা বলল, মা! হঠাৎই...

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনার ছেলে তো নিয়ে যায় না কোথাওই কোনোদিন। নদীর ধারে গেছিলাম একটু আর প্রকাশের দোকানে...।

অতি ভাল কথা। কিন্তু বাড়িতে তো একটা ছোট ননদ আছে। তার কথা কি মনে পড়ল না একবারও। তাকেও তো সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতে! সাধ-আহ্লাদ তো তারও থাকতে পারে। আর আমার মেয়ে কি তোমার মেয়ের আয়া যে তুমি আহ্লাদ করে বেড়াবে আর আমার মেয়ে তোমার মেয়েকে দেখবে।

গা জ্বালা করে উঠল দীপিতার। দীপিতা জানে যে, সিমলি প্রায় প্রতি সপ্তাহেই শ্বশুরমশাই-এর অ্যাম্বাসাডর গাড়িতে করে কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে নদীর ধারে যায়। ফুচকা খেতে, বেড়াতে। মীরচাইয়াতে পিকনিক করতে। কিন্তু সিমলি কোনোদিনও বলেনি যে, বউদি তুমি যাবে? কিন্তু মুখে সে সব কথা কিছুই বলল না। শুধু বলল, পুঁটিকে তো আপনিই ভিখুর মাকে পাঠিয়ে চারটের সময় ওপরে নিয়ে গেছিলেন মা। তাই বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম আপনার কাছেই আছে।

তুমি তো অনেক কিছুই বুঝতে পারো না বউমা। আর কবে বুঝবে তাও জানি না।

তাছাড়া, আজকাল মুখে মুখে কথাও খুব বলতে শিখেছ দেখছি। দেখেও তো কিছু বুঝতে-শিখতে পারতে। তোমার না হয় ছেলেবেলাতে মা চলে গেছিলেন কিন্তু মামীমারাও কি সহবৎ বলে কিছুই শেখাননি তোমাকে?

এসব কথা এতোভাবে শুনেছে দীপিতা যে এখন আর গায়ে লাগে না। তাছাড়া, যে মামাবাড়িতে বিয়ের পরে এত বছরে একবারও যায়নি--সেও যেতে চায়নি, তারাও যেতে বলেননি, সেই মামাবাড়ি সম্বন্ধে সব দুর্বলতাও যেন আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে।

কলকাতার মানুষেরা প্রত্যেকেই ভীষণই ব্যস্ত থাকেন নিজের কাজ নিয়ে। তাঁদের এসব ফালতু সামাজিকতা করার সময় ও মানসিকতাও নেই। কিন্তু তাঁদের এই নিরাসক্তির কারণে অসহায় দীপিতার জীবন যে কত দুর্যোগময় হয়ে উঠেছে, সে কথা তাঁরা যদি জানতেন!

প্রতি বছরই শীতে আর জামাইষষ্ঠীর সময়ে শাশুড়ি নিয়মিত কথা শোনান। বলেন, কর্তাকে বলেছিলাম যে, বাঙাল বাড়িতে ছেলের বিয়ে দিও না। তাও আবার বরিশালের বাঙাল! না, জেদ করে তাই দিলেন। বামুনের ডানা-কাটা-পরী মেয়ে পেয়ে তিনি সব ভুলে গেলেন। কবে নাকি তাদের কোন জামাই জামাইষষ্ঠী খেতে গিয়ে মারা গেছিল সেই থেকে বুদ্ধিমানেরা জামাইষষ্ঠীই তুলে দিলেন। এরকম চোখের চামড়াহীন মানুষ হয়ই বা কী করে কে জানে! জামাইষষ্ঠী নেই বলে কি ভাইফোঁটাও নেই? তোমাদের ভাই নেই বলে? যাদের আছে? তারা বুঝি কোঁচা দুলিয়ে দিদি বা বোনের বাড়ি ভাইফোঁটা নিতে আর খেতে যায় না প্রতিবছর? আশ্চর্য সব নিয়ম কানুন বাবা। অজীব আদমী।

প্রথম প্রথম, বিহারে বহুদিন বসবাস করা তার শাশুড়ি অন্নদাদেবী যখন বিহারী উচ্চারণে 'অজীব আদমী' বাক্যটি দীপিতার পিতৃকুল-মাতৃকুলের মানুষদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতেন তখন ওর মনে হতো হিন্দী সিনেমার ডায়ালগ শুনছে বুঝি। এখন আর তা মনে হয় না। ও নিজেও সত্যি সত্যি একজন 'অজীব আদমী' হয়ে গিয়ে অন্যের সব অজীবপনা মেনে নিয়েছে। একই কথা, সহস্রবার বললে যে তার ধার বা ভার কমে যায়, তা কেন যে দীপিতার শাশুড়ি-মা বোঝেন না, তা জানে না দীপিতা। মাঝে মাঝে নিজেকে অভিশাপ দেয় ও। মাঝে মাঝে নিজের ওপরে, শৈশবেই চলে-যাওয়া মা-বাবার উপরে, তাকে ঘাড় থেকে নামিয়ে দেওয়া বড়মামীর উপরে এমন তীব্র অভিমান হয় যে, মনে হয় রাতের বেলা উঠোনের গভীর কুঁয়োতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু পুঁটির জন্যেই পারে না। ও মরলে তো পুঁটির অবস্থাও ওর নিজেরই মতো হবে।

কিছুই না-বলে মুখ নিচু করে শাশুড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রইল দীপিতা। শ্বশুরমশাই দোতলার বারান্দার ইজিচেয়ারে লুঙি আর গেঞ্জি পরে বসে পা দোলাচ্ছিলেন। তিনি সব শুনছিলেন। সব সময়েই শোনেন। দীপিতার মনে হয়, উনি দীপিতার প্রতি নিক্ষিপ্ত এই সব বাক্যবাণ খুবই উপভোগ করেন আর বাইরে ভাব দেখান যে এসব মেয়েলি ব্যাপারের উনি কিছুই বোঝেন না এবং বুঝতে চানও না। ওঁরা কে যে কাকে কখন চালনা করেন তা বোঝা ভার। আর ওঁদের দুজনকেই চালনা করে অমলের ছোট ভাই বিমল। যত কুমন্ত্রণা, দীপিতার এবং অমলের নামে যত কিছু লাগানো সবই তার ছোট দেওর বিমলই করে। তা জানে দীপিতা।

জীবনে অনেকের হাতে অনেকই কষ্ট পেয়েছে সে কিন্তু কারোকে ঘৃণা করেনি আজ পর্যন্ত। এই বিমলকে ছাড়া। এতো অল্পবয়সী ছেলের যে এমন নীচ ইতর চরিত্র হতে পারে তা বিমলকে নিজে চোখে না দেখলে দীপিতা হয়তো বিশ্বাসই করত না। আপাদমস্তক মিথ্যা

দিয়ে মোড়া। স্কুলের কোনো কোনো মাস্টারমশায়কে ঘুষ দিয়েই ও পাশ করে। হেডমাস্টারের বেকার ছেলেকে শ্বশুরমশায়কে বলে ছিপনাদোহরের ডিপোতে চাকরি করে দিয়েছে। গুণের 'গ' নেই অথচ নাম করার খুব ইচ্ছে। সমস্ত কিছুই ফাঁকি দিয়ে, বাবার টাকা এবং প্রতিপত্তি দিয়েই পেতে চায় বিমল। জীবনে চালাকির দ্বারা যে কোনো মহৎ কর্ম হয় না এ কথা ও বিশ্বাস করে না। টাকাই ওর জীবনের একমাত্র প্রার্থনা। টাকার বিনিময়ে যে নামযশ কিনতে পারা যায় তাই ও শুনেছে। ফুটবল খেলে থার্ড ক্লাস কিন্তু গেমস টিচারকে ঘুষ দিয়ে স্কুল টিমে চান্স পেয়েছে। যেটা দীপিতাকে আশ্চর্য করে, তা হচ্ছে এসব কিছু জেনেশুনেও শ্বশুর-শাশুড়ি তাকে প্রশ্রয় দিয়ে যান, তার সব প্রয়োজনেই টাকা যুগিয়ে যান।

সুরাতিয়া দোতলা থেকে নেমে আসার আগে আগেই বিমল দোতলা থেকে নেমে স্কুটার নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। শ্বশুরমশাই নতুন ভেসপা স্কুটার কিনে দিয়েছেন তাকে অথচ কমলকে দেননি। কমল হেঁটে স্কুলে যায়। ছোট ছেলে কি তাঁর কোনো গোপন কথা জানে? নইলে কী করে সে ব্রজেন করের মতো ধুরন্ধর মানুষকে এমন করে বশে রেখেছে? ভেবে পায় না দীপিতা।

কিছুক্ষণ পরে দীপিতা বলল, আমি আসি মা?

এসো। ছেলেটা সারা সপ্তাহ বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়, ছুটির দিনে তার কাছে কাছে একটু থাকো, তাকে একটু সঙ্গ দাও, সুখী করো, পুরুষ মানুষের অনেক রকম চাহিদা থাকে। তাহলেই কৃতার্থ হবো আমি। সংসারের জন্যে তো কুটোটিও নাড়তে হয় না তোমার। কাজের মধ্যে, পরী সেজে থাকা। তা যার সুবাদে পরী হয়েছ তাকে একটু দেখলেই কৃতার্থ হবো আমরা।

হঠাৎ বহুবচনে গেলেন কেন অন্নদাদেবী তা বুঝল না দীপিতা। সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে আসতে মনে মনে ও ভাবছিল বড় ছেলের প্রতি কত যে দরদ শ্বাশুড়ির, তা তার জানা আছে। তাছাড়া পুরুষমানুষদের চাহিদা সম্বন্ধে এতোই যদি জানেন তবে ষাটোর্ধ্ব শ্বশুরমশাই যুবতী মুসলমান রক্ষিতার কাছে যাবেন কেন? ভাবলেও হাসি পায় দীপিতার। নাটক-নভেলে অনেক অশিক্ষিত অত্যাচারী শাশুড়ির কথা পড়েছে দীপিতা কিন্তু জীবনেও যে তার শাশুড়ির মতো শাশুড়ি এই আধুনিক সময়েও কারও থাকতে পারে সে কথা মাঝে মাঝে ওর নিজেরই বিশ্বাস হয় না। ওর মনে হয় ওর শাশুড়ির শাশুড়ি বোধহয় তাঁর উপরে অত্যন্তই অত্যাচার করতেন। দীপিতার প্রতি অন্নদার ব্যবহার তারই শোধ তোলার জন্যে। মানুষের মনস্তত্ত্ব বোঝা ভারী মুশকিল।

মুখে তখনও প্রকাশের ফুচকার আর গোরখপুরী চায়ের স্বাদটা ছিল কিন্তু শাশুড়ির বাক্যবাণে মুখটা যেন তেতো হয়ে গেল।

আধখানা সিঁড়ি নেমেছে, এমন সময়ে পেছন থেকে কে যেন দীপিতার হাত ধরল।

স্পর্শেই বুঝল যে, তার একমাত্র ননদ সিমলি। এই মেয়েটা অন্যরকম। এ বাড়ির মতো নয়। চেহারাতে মা কী বাবা কারও ছাপ নেই। ও ব্রজেন করেরই মেয়ে যে, সে সম্বন্ধে মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। নিজে ও খুবই ছোট হয়ে গেছে, কত নীচ হয়ে গেছে, নইলে এই সব ভাবনা ওর মনে আসে কী করে। নিজের জন্যে ভারী কষ্ট হয় দীপিতার।

পিছন ফিরে তাকাতেই সিমলি বলল, চলো।

তারপর সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে বলল, দুঃখ কোরো না বৌদি। আমি কিন্তু মাকে কিছুই বলিনি। আমি তো নিবেদিতাদের বাড়িতেই ছিলাম। একটু আগেই এসেছি। বলে থাকলে, বিমলই বলেছে। তুমি তো জানোই ওকে। ওকে আমি ভাই বলে স্বীকার করি না। ও কিছু না বললে হঠাৎ এই আক্রমণ হবে কেন তোমার ওপরে। গেছ, বেশ করেছ। উল্টে দু'কথা শুনিয়ে দিতে পারো না তুমি?

দীপিতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমার কোন জোরটা আছে যে কিছু বলব আমি?

একতলাতে নেমে, দীপিতাদের ঘরের দিকে এগোতে এগোতে সিমলি বলল, তোমাকে দেখে আমি একটা ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলেছি।

কি?

নিজে স্বাবলম্বী না হয়ে আমি কখনওই বিয়ে করব না।

বিয়ে কি আমি আমার নিজের ইচ্ছাতে করেছিলাম রে সিমলি? না তুইই করতে পারবি? আমরা তো বিয়ে 'করিনি', আমাদের বিয়ে 'দেওয়া' হয়েছিল। ভবিষ্যতে একটা সময় হয়ত আসবে, যখন মেয়েরা সত্যিই নিজেদের মতে ও ইচ্ছাতে বিয়ে 'করবে'। আমাদের মতো তাদের বিয়ে 'দেওয়া' হবে না।

সিমলি বলল, কালকে কলেজে নিবেদিতা বলছিল যে, কলকাতাতে ও নাকি দেখেছে যে একটা অটো-রিক্সার পেছনে লেখা আছে 'নারীর সুখ স্বপনে, আর নারীর শান্তি শ্মশানে'।

তারপর হেসে বলল, সত্যি? তোমাদের কলকাতাতে কি এরকম সব লেখা থাকে নাকি অটোর পেছনে?

দীপিতা বলল, কী জানি রে! পাঁচবছর তো হয়ে গেল এসেছি কলকাতা থেকে। আর তো যাইনি। কী করে বলব বল? তবে তোর বন্ধু নিবেদিতা যখন বলেছে তখন নিশ্চয়ই তাই।

সিমলি বলল, আমি যাই একটু ভোঁদাইদাদের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। কাকীমা ডেকেছিলেন। ওদের বাড়িটা একেবারে অন্যরকম। ভারী ভাল লাগে আমার ওদের।

ভোঁদাইকে বিয়ে করবি নাকি?

মানুষটা তো ভালই, রসিক, কিন্তু ও সব এখনও ভাবার সময় আসেনি। স্বাবলম্বী হই আগে। তাছাড়া ভোঁদাইদা আমার চেয়ে অনেকই বড়। তাছাড়া শুধু বি. এ. পাশ।

তোর দাদাও তো শুধুমাত্র বি. কম. পাশ।

তুমি তো তা নও। আমার বরের আমার চেয়ে বেশী ভাল হতে হবে না! তা না হলে চলবে? আমি তো নামধারী কলেজ থেকে এ বছরই বি এ পাশ করে বেরোব।

লেখাপড়া যে সকলকেই অনেকদূর অবধি করতে হবে তার কী মানে আছে। কলকাতাতে আমি অনেকই লেখাপড়া করা খুব বড় বড় বদমাইস ছেলে দেখেছি।

সে যাই হোক। বলেছি তো, অন্য কারো ভরসাতে, নিজের মা-বাবার ভরসাতেও আমি বিয়ে করব না। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে তবেই করব। বিমল যেমন ছেলে, বাবার অবর্তমানে হয়ত দাদাকে কমলকে আর আমাকেও তাড়িয়েই দেবে বাড়ি থেকে। ও একটা সাংঘাতিক ছেলে। বাবাব প্রশ্রয়ে আরও সাংঘাতিক হয়ে উঠছে দিনকে দিন। ওকে আমি ভীষণই ভয় পাই, ওর দিদি হলে কী হয়।

দীপিতা বলল, আমিও পাই।



আজ দুপুরবেলা ভারী মেঘ করে এল।

মনে হচ্ছে যেন বর্ষাকাল। এই বৃষ্টির পরেই শীতকাল শুরু হবে। এতদিন হেমন্ত হেমন্ত ভাব ছিল। কালো মেঘের পটভূমিতে বেলোয়াটিকারের দিক থেকে এক ঝাঁক সাদা পায়রা ডিগবাজি খেতে খেতে উড়ে আসছিল নয়াটোলির দিকে। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল দীপিতা।

ওর শ্বশুরবাড়ির গেটের কৃষ্ণচূড়াগুলোর উল্টোদিকে পথের ওপরে একটি মস্ত গামহার গাছ আছে। গামহার গাছ দীপিতা চিনত না। অমলই চিনিয়ে দিয়েছে। ভিতরে আছে একটি বটলব্রাশের গাছ। অনেক পুরনো। শ্বশুরমশাই-নাকি ঐ গাছটি সুদ্ধই জমিটি কিনে বাড়ি বানিয়েছিলেন। আরও একটি গাছ ছিল নাকি ঐ বটলব্রাশ-এর জোড়া। সেটি নাকি বাড়ি বানাবার সময়ই কেটে ফেলা হয়েছে। ভাবলেও খারাপ লাগে। গাছ কেউ কাটে? সে যে গাছই হোক না কেন।

বটলব্রাশ-এর গাছ দীপিতা কলকাতাতে তার কলেজের এক বন্ধুদের বাগানবাড়িতে দেখেছিল। প্রকৃতি যে তাকে এখনও মোহিত করে, তার মধ্যে আলোড়ন তোলে, একথা ভেবেও অবাক লাগে দীপিতার। বিশ্বাস-বাড়ি থেকে কণিকা ব্যানার্জি বা নীলিমা সেনের বা অতুলপ্রসাদের গান, বা রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুরাতনী গান ভেসে এলে এখনও কেন মন উচাটন হয়? এখনও সব সূক্ষ্মতা বোধহয় নষ্ট হয়নি। হয়নি যে, সেটাই বড় কষ্টের। পুরোপুরিই যদি ভোঁতা হয়ে যেতে পারতো, সুখী হতে পারতো হয়তো। খেতে-পরতে পাওয়াই তো একজন মানুষের সুখের চরম নয়, পরম প্রার্থনা নয়!

কবিতা লেখে না আর ও, গানও গায় না, এমনকি কবিতা পড়েও না। এ বাড়ির সঙ্গে কবিতা, গান এসবের কোনো সম্পর্কই নেই। সকাল থেকে রাত অবধি টাকা রোজগার আর খাওয়ার চিন্তা। বিনোদন বলতে একমাত্র পরনিন্দা আর পরচর্চা। তবু ও যে বেঁচে আছে এখনও, তা বুঝতে পারে আজকের মেঘলা দুপুরের মতো প্রাকৃতিক কোনো হঠাৎ অভিঘাতে। বেঁচে আছে বলে নিজেকে অভিশাপও দেয় দীপিতা। এ বাঁচা কি বাঁচা! আজকাল ওর প্রায়ই মনে হয় যে, কিছু একটা করতে হবে। ওর জীবনটাকে এভাবে নষ্ট হতে দেবে না দীপিতা। প্রায়ই ভাবে, যখন একা থাকে। ওর আগের জীবনটা, কুমারী জীবনটা, গায়ে-মাখা সুগন্ধি সাবানেরই মতো হঠাৎই হাত পিছলে শ্বশুরবাড়ির কুয়োতে পড়ে গেছে। পড়ে গিয়ে গলে গেছে। আর তাকে উদ্ধার করার উপায় নেই কোনো।

বিয়ের পরে পরে, যখন অমল এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সময় দিত দীপিতাকে,

তখন রবিবারের দুপুরে অনেক গল্প করত ওরা। অমলের গ্রাম্য সারল্য মুগ্ধ করত দীপিতাকে। কবিতা বা গানের বা নাটকের বা সাহিত্যের গল্প নয়। এমনিই সব গল্প। অন্য পরিবেশের, অন্য জীবনের সব সাধারণ গল্প। তাই অসাধারণ মনে হতো দীপিতার কাছে। এখন অমল খালি ভস ভস করে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়।

বিয়ের পরে পরে অমল দীপিতার এই গাছ-প্রীতির কথাতে হাসত। বলত, নানারকম গাছ কেটে, তাদের চিরে-ফেড়েই তো আমাদের রুজি-রোজগার। গাছকে অত ভালবাসলে, খাব কি? শুকিয়ে মরতে হবে। ব্যবসা লাটে উঠবে।

সে কথা ভাবলেও খারাপ লাগত দীপিতার।

একদিন অমলকেও বলেছিল, দেখো, তোমাদের একদিন খুব পাপ লাগবে। যারা মদের ব্যবসা করে তারা যেমন কখনও সুখী হয় না, যারা গাছ কেটে পয়সা রোজগার করে, তাদেরও তেমন কখনও ভাল হতে পারে না। গাছেদের প্রাণ নেই বুঝি?

তোমার বড়মামা তো সবই জানতেন। তোমাকে বলেননি উনি আমাদের কিসের ব্যবসা?

অমল জিজ্ঞেস করেছিল।

নাঃ আমাকে কেউ কিছুই বলেননি। শুধু বলেছিলেন, হবু-জামাই ডালটনগঞ্জের বড় ব্যবসাদারের ভাল ছেলে। সচ্চরিত্র। তখন ডালটনগঞ্জ নামের যে একটা জায়গা আছে, অথবা সেটা কোথায়, তাও জানতাম না। বড়মামীমা বলেছিলেন সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ঐ সব জায়গাতে তোলা।

অমল বলত সব তো মোহনদারই বন্দোবস্তে হয়েছিল। ঐ ছবির পেছনে মোহন বিশ্বাসের যে কত টাকা গলে গেছে সে সময়ে, সে আমরাই জানি।

বড়মামা বলেছিলেন, জামাই বিরাট ব্যবসার পার্টনার।

হ্যাঁ। পার্টনার ঐ নামেই। ইনকাম-ট্যাক্স কমাবার জন্যেই তো পার্টনার করেছিলেন বাবা। ছাতার পার্টনার আমি। অমল বলত।

তারপরে দীপিতা বলত, আমিও আশ্চর্য হতাম ভেবে যে, কোথায় কলকাতার বরানগর আর কোথায় এই পালামৌর ডালটনগঞ্জের নয়াটোলি! তোমার বাবা খুঁজে খুঁজে আমাকে বের করলেন কী করে?

বাঃ রে! তোমার বড়মামার সঙ্গে আমার বাবার যে যোগাযোগ ছিল অনেকই আগে থেকে। তোমার বড়মামা তো পুলিসের এস. পি. ছিলেন ওড়িশার সম্বলপুরে। আমার বাবাও তো তখন সেখানেই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের রেঞ্জার ছিলেন। কী কারণে জানি না, কোনো গূঢ় কারণ নিশ্চয়ই থাকবে, আমার বাবা তোমার বড়মামার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ ছিলেন। সেই কৃতজ্ঞতার ঋণ মিটোতেই আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তোমাকে নিয়ে এসেছিলেন আমার বাবা। তোমার মামারা সত্যি সত্যিই তোমাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছিলেন। আমি কি কোনোদিক দিয়েই তোমার যোগ্য? রূপে-গুণে তুমি তো সরস্বতী। সফিসটিকেটেড।

সফিসটিকেশান সব ধুয়ে মুছে যেতে বসেছে। পাঁচ বছর তো হলো কর-বাড়িতে। তারপর উদাস গলাতে দীপিতা বলেছিল, আমারই বা কী যোগ্যতা। যে মেয়ে স্বাবলম্বী নয়, যে নিজে রোজগেরে নয় অথবা যার বাবার টাকার জোর নেই তার কোনো গুণই গুণ নয়।

এমন অভাগীও তো সকলে হয় না। কারও মা-বাবা আর দুই দিদি কি একই সঙ্গে প্লেন ক্র্যাশে মারা যায়?

তারপরে একটু চুপ করে থেকে বলত, আসলে, মামাবাড়ির, মানে, বড়মামা বড়মামীকেই মা-বাবা বলেই জেনেছিলাম। মেজমামার মেয়েদের না-থাকা দিদিদের মতোই দেখেছিলাম। কলকাতা শহরের শিক্ষিত, সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষেরাও যে এমন হতে পারেন তা কী করে জানব বলো? তাছাড়া আপন মামাই তো! অবশ্য শুনেছি যে, বাবার দশ লক্ষ টাকা ইনস্যুওরেন্স ছিল। আরও কী কী ছিল তা আমি জানি না। সবই বড়মামাই নিয়েছিলেন। আমার তো তখন পাঁচ বছর বয়স।

তোমার বড়মামা বাবার কাছ থেকেও এক লাখ টাকা নিয়েছিলেন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়ার জন্যে। পণ। তা কি তুমি জানো?

সে কী! টাকা তো মেয়ে পক্ষই চিরদিন দেন বলে শুনেছি।

আমি শুনেছি, তোমার বড়মামার কাছে আমার বাবার এত গভীর ঋণ ছিল যে তাঁকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করেও সেই ঋণশোধ হয়নি, উল্টে ঐ টাকাও দিতে হয়েছিল।

কিসের ঋণ?

পুলিস সাহেবের কাছে তো কারো টাকার ঋণ থাকে না।

অমল মুখ নামিয়ে বলল।

তবে?

আমি জানি না। তবে সম্বলপুরের ফরেস্ট অফিসের এক পিওন বাবুলি বেহারা, যার কাছেই আমি মানুষ হয়েছিলাম বলতে পারো, যার কাছে আমার অক্ষর পরিচয়, আমার হাতে খড়ি, তার কাছ থেকেই আমি শুনেছিলাম যে, বাবা একটি খুনের মামলাতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এবং মিথ্যে খুন নয়। ফাঁসি হয়ে যেত। তোমার বড়মামা বাবাকে বাঁচিয়েছিলেন।

এসব কথা তুমি বিশ্বাস করো? তোমার নিজের বাবা সম্বন্ধে এসব কথা?

বিশ্বাস করতে ভাল লাগেনি। কারই বা লাগে? কিন্তু করি। কারণ বাবুলি কাকা ভগবানের মতো মানুষ ছিলেন। সম্বলপুর ছেড়ে তাঁর দেশ বারমাতে চলে যাবার আগে উনি বলেছিলেন অমু, বাবার মতো হয়ো না, তুমি, তোমার মতোই হয়ো।

মানুষ হয়ো। সন্তানহীন বাবুলি কাকা আমাকে নিজের সন্তানের মতোই দেখতেন। কিন্তু কথা রাখতে পারিনি। ছেলেরা হয়তো বাবার মতোই হয়।

তোমার বিয়ের সময়ে তাঁকে তো দেখলাম না। নেমন্তন্ন করোনি?

আমার বিয়েতে আমার কতটুকু হাত ছিল? কোনো ব্যাপারেই আমার কোনো অধিকারই ছিল না। না তখন ছিল, না এখন আছে। আমি বাবার কর্মচারী। নিজের বাবার চাকরি করার মতো বাজে ব্যাপার আর হয় না। যারা জানে, তারাই জানে।

দীপিতা বলেছিল, তুমি কি পুরুষ মানুষ? তোমার এসব কথা বলতে লজ্জা করে না?

করে। আবার করেও না। আমি পুরুষ মানুষ কী না জানি না। আমি ভাল মানুষ। বলতে পারো বোকামানুষ। এমনকি মেয়েমানুষও বলতে পারো। অনেকরকম মানুষ নিয়েই তো এই সংসারের চিড়িয়াখানা ভরা।

মানুষ কি হতে পেরেছ? তোমার বাবুলি কাকার কথা মতো?

না।

তবে?

জীবনে মানুষ আর ক'জন হতে পারে বল? মানুষের চেহারা তো কোটি কোটি মানুষের প্রত্যেকেরই থাকে কিন্তু মানুষ ক'জন হতে পারে? তবে হতে যে পারিনি তার জন্যে বাবার শিক্ষাও অনেকখানি ছিল। বাবুলি বেহারার সব প্রভাব থেকে যাতে আমি মুক্ত হই বাবা তার সব বন্দোবস্তই করেছিলেন। তাছাড়া আমার মধ্যে সাহস ছিল না। বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মতো চরিত্রজোর আমার ছিল না। পড়াশুনোতেও তো সাধারণই ছিলাম। মেরুদণ্ড এমনি এমনি গজায় না, তার জন্যে শক্ত ভিত-এর প্রয়োজন হয়। বাবা তাড়িয়ে দিলে তোমাকে আর পুঁটিকে নিয়ে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াব? কী এমন নিজস্ব যোগ্যতা আমার!

একটু চুপ করে থেকে অমল বলেছিল, বাবাকে কোনোদিনও ভালবাসতে পারিনি, শ্রদ্ধা করতে পারিনি। ভয়ই পেয়েছি চিরদিন। সম্পর্কটা বাবা-ছেলের হতে পারেনি কোনোদিনও, রাজা-প্রজারই ছিল। আমার মেরুদণ্ড বলে যাতে কিছু গড়ে না ওঠে তার সব বন্দোবস্তই বাবা করেছিলেন। তবুও বিদ্রোহী হয়ে উঠতাম মাঝে মাঝে। অক্ষমের, দুর্বলের বিদ্রোহ। এখনও হই। বিদ্রোহের বীজ সম্ভবত এখনও সুপ্ত আছে আমার মধ্যে। তাই বাবা আমার চেয়ে কমল আর বিমলকে অনেক বেশি ভালবাসেন। তারা যে বাবার বুড়ো-বয়সের ছেলে কী না! তারা বাব্যর স্বপ্নের ছেলে, বাবার আদর্শে, তাঁর মানসিকতায়, তাঁর জীবনদর্শনেই তারা বড় হয়ে উঠছে। যাকে ইংরেজীতে বলে, মানে, যেমন ফরেস্ট কনসার্ভেটর ঘোষ সাহেব প্রায়ই বলতেন, 'Like Father like Son.'

তারপর বলেছিল, আমার মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো?

কি?

কমল আর বিমল বড় হয়ে ব্যবসাতে এলেই বাবা আমাকে লাথি মারবেন। পরিবারের স্বার্থরই জন্যে বাবা আমাকে ব্যবহার করছেন! আমাকে উনি পছন্দ করেন না! তাছাড়া উনি প্রায়ই একটি বাক্য ব্যবহার করেন, 'ওকে টাইট করে দেব'। আমাকে একা নয়, পৃথিবীর সবাইকেই। এই 'টাইট করা' মনোবৃত্তি থেকেই বাবার সব স্বাভাবিকতা আর ভালত্বর প্যাঁচগুলো বোধহয় আস্তে আস্তে একেবারে কেটে গেছে। ঐসবগুণ বাবা আর ইচ্ছে করলেও ফিরে পাবেন না। একসময়ে ঐসব গুণ অবশ্যই ছিল। নইলে, আমার মধ্যে ওসব বোকা-বোকা বোধ এল কী করে! আমিও তো বাবারই ছেলে। আমি যে-সময়ে মায়ের গর্ভে আসি তখন সম্ভবত বাবা মানুষটা অন্যরকম ছিলেন। আস্তে আস্তে বদলেছেন। বোধহয় সব মানুষের বেলাতেই তাই হয়। সে কারণেই বোধহয় সব স্বামী-স্ত্রীর প্রথম সন্তানেরা সরল, ভাল অথবা বোকা-বোকা হয়। তারা ধূর্ত হয় না সাধারণত। অবশ্য ব্যতিক্রম কি আর নেই? অবশ্যই আছে।

থাক এসব কথা।

দীপিতা বলেছিল, অমলের পিঠে হাত রেখে।

তারপর গাঢ় স্বরে বলেছিল দীপিতা অমলকে, সোনা, আমার এসব খারাপ কথা শুনতে ভাল লাগে না গো। এসব তুমি কখনও বোলো না আর আমাকে। আমি বুঝতে পারছি যে

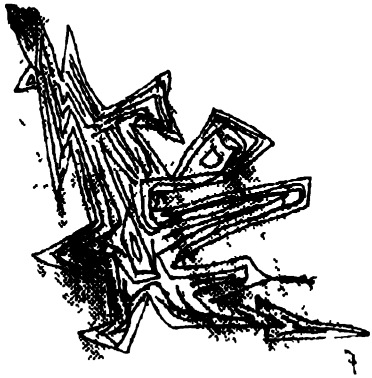
ক্রমশ আমি তোমাদেরই মতো হয়ে যাচ্ছি। আমার নিজস্বতা বলতে আর কিছুমাত্র রইল না। থাকবে না।

একটু পরেই অমলের নাক ডাকতে শুরু করল। দীপিতার ঘুম আসছিল না। সে আবার জানালার কাছে মোড়াটাকে টেনে নিয়ে এসে বসল।

রঙ্গনের ডালে বৃষ্টির ফোঁটা জমে আছে। বৃষ্টিতে ভেজা গাছ-গাছালি থেকে দারুণ একটা গন্ধ উঠছে। ভেজা ইউক্যালিপটাসেদের গা থেকেও ভারী সুন্দর গন্ধ ছড়াচ্ছে। আস্তে আস্তে নয়াটোলির এই কটুগন্ধী বাড়ির ভিতরে বৃষ্টি শেষের হাওয়াতে ভর করে এক মিশ্র সুগন্ধ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে, কর-বাড়ির দূষিত আবহাওয়াতে সেই অসময়ের বৃষ্টিবাহী সুগন্ধ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। ধীরে, ধীরে, খুবই ধীরে ধীরে।

দীপিতা ভাবছিল, সেও কি নিজের এই নষ্ট হয়ে-যাওয়া পানাপুকুরের জীবনকে বদলাতে পারবে? আস্তে আস্তে, খুব আস্তে আস্তে?

কর-বাড়ির আবহাওয়া ক্রমশই অসহ্য হয়ে উঠছে ওর কাছে। কিন্তু জীবন তো ব্লাউজ বা শাড়ি নয়, যে ইচ্ছে করলেই ছেড়ে ফেলা যায়। এই জীবন তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। এই বাঁধন ছেঁড়ার ক্ষমতা তার একার হাতে নেই। অথচ...



পালামৌ ন্যাশনাল পার্ক এর মধ্যে গাড়ু থেকে মারুমারের মাঝে মীরচাইয়া ফলস-এর পরে পিচ রাস্তা থেকে ডানদিকে একটি পথ বেরিয়ে গেছে বন বিভাগেরই বানানো। সে পথে ক্বচিৎ বনবিভাগের জীপ ছাড়া অন্য কোনো যানবাহনের চাকা গড়ায়। পালামৌ টাইগার প্রজেক্টের 'কোর এরিয়ার' মধ্যে পড়ে এই সব অঞ্চল। এতো বছরে বাঘের সংখ্যা সত্যিই বেড়েছে কি না, তা বনবিভাগের আমলারাই বলতে পারবেন। কিন্তু টাইগার প্রজেক্ট চালু হওয়ার পরে এ অঞ্চলের অগণ্য মানুষ যে অনাহারে মারা গেছে, অগণ্য মেয়ে দেহপসারিনী হয়ে গেছে এ কথা ভোঁদাই জানে। এই সমস্ত অঞ্চলের মানুষদের এই রুখু অরণ্য-বেষ্টিত গ্রামের মধ্যেই বাস। তাদের ফসল ফলানোর মতো জমি নেইই বলতে গেলে। যতটুকু আছে, তাতে গোন্দনি, সাঁওয়া, চিনামিনা এই সব জঙ্গলী ধান কিছু করে ওরা। বাজরা মকাইও করে, কেউ কেউ মটরছিম্মি বা লাউকি। কিন্তু সেই ধান খেয়ে বড়জোর তিন মাস চলে। ছিপাদোহর, ও গাড়ুর হাটে অন্য ফসল বেচে যা সামান্য আয় হয় তাতেও মাসখানেকের খোরাকির সংস্থান হয়। বাকি সময়ের খাবার এরা আগে জোটাত বাঁশ ও কাঠের ঠিকাদারদের কাছে কুলি-কামিনের কাজ করে। কিন্তু টাইগাব প্রজেক্ট হওয়ার পর থেকে সে সব রোজগার একেবারেই নেই, কারণ, বাঘেদের নির্বিঘ্ন-প্রজননের জন্যে জঙ্গলের মধ্যে সবরকম ক্রিয়া-কর্মই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শুকনো মহুয়া, বুনো আম, এবং অন্যান্য ফল ও ফুল এবং নানা মূল, কান্দা-গেঠি এই সব খুঁড়ে বের করে খেয়ে কোনোক্রমে, মানুষের মতো নয়, পশুরই মতো বেঁচে থাকে এরা। আজকাল ডাকাতিও শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন হল। নকশাল ছেলেদের আড্ডাও হয়েছে। কী করবে মানুষ। বাঁচতে তো হবে। বুড়োরা, হায় রাম! বলে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাদের ভাগ্যকে দোষারোপ করে অনাহারে মরছে। কিন্তু শিশুরা এখন যুবক হয়েছে। তারা অত সহজে ভাগ্যর উপরে সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। তাই ট্যুরিস্টদের ছিনতাই করা শুরু করেছে। ডাকাতিও হচ্ছে প্রায়ই।

ঐ লালমাটির বন-পথের পাশে, জীপের বনেটের উপরে ভোঁদাই, ইমরাত আর ইমরাত-এর এক রিস্তেদার রহমত বসে ছিল। ইমরাত আর রহমত মহুয়া খাচ্ছিল। বিটকেল, ওদের ভিজিয়ে রাখা ছোলা, ভাজা আর কাঁচা লঙ্কা আদার কুচির সঙ্গে মাটির ভাঁড়ে করে এগিয়ে দিচ্ছিল। চোরা-শিকারে এলে ওরা সঙ্গে কখনও কখনও বিটকেলকে নিয়ে আসে। অতটুকু ছেলেকে সঙ্গে দেখে চেকনাকাতে কেউ সন্দেহও করে না।

ইমরাত এর এক রিস্তেদার মৌলবী, জঙ্গলের মধ্যে ডেরা করেছে বেশ কিছুদিন হলো। ওদের দুজনকে জীপে বসিয়ে রেখে ইমরাত আর রহমত তার কাছে গেছিল। ডিজেলের জেনারেটর আছে মৌলবীর। টিভি আছে। রেডিও আছে। সরকার এই অভয়ারণ্যের মধ্যে তাকে থাকতে দিয়েছে কেন কে জানে। লোকটার জীবিকা কি তাও বুঝতে পারে না ভোঁদাই। কিন্তু বিহার-শরিফ থেকে, নওয়াদা থেকে, রাংকা থেকে, গাড়োয়া থেকে কাবুলিওয়ালার মতো দেখতে মানুষেরা এর কাছে আসে যায়। সবই একে ডাকে 'মৌলবী সাব' বলে। ইমরাত এর এই রিস্তেদারের চেহারা কখনও দেখেনি ভোঁদাই। লোকটার কাছে বন্দুক, রাইফেল আছে। ইমরাত-এর গুলি-বন্দুক সব সেই যোগান দেয়। দারুণ দারুণ বিলিতি গুলি। কী করে পায়, কোথা থেকে পায়, কে জানে।

শিকার হয়ে গেলে জঙ্গলেই তা কেটে-কুটে একটা রাং মৌলবী সাহেবকে দিয়ে বাকিটা ওরা নিয়ে যায়। ইদানীং নিজেদের বন্দুক রাইফেলও আনে না। চেকনাকা পেরোতে সুবিধে হয়। মৌলবীর কাছ থেকে ধার নিয়ে বন্দুক রাইফেল, তাকেই ফিরিয়ে দেয় ইমরাতরা।

শিকার বলতে চিতল হরিণ, কোটরা, খরগোস। শম্বর, ছোট পেলে মারে। বড় শম্বর মারলে অনেকই হ্যাপা। ম্যানেজ করা যায় না। খেতেও ভাল নয়। একবার একটা বাচ্চা মেরেছিল মাসখানেকের। ভারী নরম মাংস ছিল। ইমরাতরা গরুও খায়।

কেমন খেতে, তা জানার জন্যে এবার একটা বাইসনের বাচ্চাও মেরেছিল। ভারতীয় বাইসনের আসল নাম গাউর। বাইসন, উত্তর আমেরিকার প্রাণী। গাউরের চেয়ে অনেকই ছোট। সাধারণে অনেকেই জানে না এসব।

ইমরাত বলে যে, মৌলবী সাহেব এদিকে অনেক মাদ্রাসা বানাবার জন্যে এসেছেন স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে। পাটনার বড়া মসজিদের ইমামই নাকি তাঁকে পাঠিয়েছেন। এখন বিহারে লালু যাদব-রাবড়ি দেবীর জমানাতে যাদব আর মুসলমানদের কেউ কিছু বলে এমন হিম্মৎ বা মূর্খামি কারও নেই। তাছাড়া কোনো অজ্ঞাত কারণে বনবিভাগও মৌলবী সাহেবকে বেশ সমীহ করে চলে। অংক কি তা ঠিক বোঝে না ভোঁদাই।

ভোঁদাই বোঝে যে, কিছু একটা গোলমাল আছে। তবে ইমরাত-এর কোনো গোলমাল নেই। নানা জায়গাতে উ্যনিফর্ম সাপ্লাই করে জীবিকা নির্বাহ করে সে। আঠারো ঘণ্টা খাটে। পুরো বিহার জুড়ে ওর ব্যবসা। ব্যবহারও খুব ভাল। হেরাফেরিও করে না কোনোরকম। দিব্যি দিন চলে যায়। তার দুই বিবি বছর বছর বিয়োয়। বিরিয়ানির দাওয়াত লেগেই থাকে। উদার মানুষ। তবে টোকা মারলেই বোঝা যায় যে তার ভিতরেও একজন কট্টর মুসলমান বাস করে। বাইরের ঔদার্য তখন ঝুরোমাটির মতো ঝরঝরিয়ে ঝরে যায়।

ইমরাত-এর চরিত্রর নিষ্ঠুর দিকটা ফুটে ওঠে যখন ও গুলিতে আহত অথবা মৃত জানোয়ারকে দৌড়ে গিয়ে জবাই করে। ওরা বলে, 'হালাল করা'। এ বছরের শীতে কান্দাহারে খুনী হাইজ্যাকারেরা যেমন করে রূপীন কাটিয়ালকে জবাই করেছিল। গলাতে আমেরিকান রেমিংটন কোম্পানির বড় ছুরি দিয়ে আড়াই প্যাঁচ লাগায়। এই 'জবাই' একটা বীভৎস ব্যাপার।

বেতলার ট্যুরিস্ট লজ-এর বাবুর্চির হেল্পার একদিন নাকার পাশে একটা বড় মোরগকে হালাল করে ছেড়ে দিয়েছিল। তখন ভোঁদাই পথের পাশে জীপে বসেছিল। শ্বাস-নালী-কাটা মোরগটা কীভাবে দাপাদাপি করছিল, এক এক ঝটকাতে রক্তর ফিনকি ছিটিয়ে কত

দূরে দূরে গিয়ে পড়ছিল, তা দেখেই ভোঁদাই বুঝেছিল, জীবন্ত অবস্থাতে হালাল-করা প্রাণীর রকমটা। এর চেয়ে বলি অনেকই ভাল। এক কোপে ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা হয়ে যায়। কষ্ট অনেকই কম হয়। ভোঁদাই তাই ভাবে, গরু বা আহত বড় জানোয়ারকে জবাই করলে তাদের মৃত্যু যন্ত্রণা কেমন হতে পারে। মানুষের কথাতো ছেড়েই দিল। জানোয়ার মরে গেলেও, মরে তার জিভ বেরিয়ে গেলেও, ইমরাত তবু তাকে হালাল করে। অথচ যে প্রাণীকে হালাল করে মারা না হয়েছে তাকে খাওয়া ইসলামে বারণ আছে। কখনও ইমরাত ভোঁদাই-এর সঙ্গে একা থাকলে কিন্তু হালাল নিয়ে অমন বাড়াবাড়ি করে না। সঙ্গে অন্য কোনো মুসলমান থাকলেই অমন বাড়াবাড়ি করে। পাছে সেই সঙ্গী ভাবে যে, ইমরাত-এর মুসলমানত্বে কোনো খামতি আছে। মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের সম্ভবত এখানেই তফাৎ। ইসলামের যেটা গুণ সেটাই হয়ত দোষ। বড় বেশি ঘেরাটোপ, বাঁধাবাঁধি ওদের ধর্মে। হিন্দুধর্ম হিন্দু-ধর্মাবলম্বীদের অনেক স্বাধীনতা দিয়েছে। দোষ বলতে, জাতপাতের নোংরা ব্যাপারটা। কিন্তু ইসলাম ধর্মে গোঁড়ামিটাই একটা গুণ। ওদের সবচেয়ে বড় গুণ এই যে, মানুষে মানুষে কোনো তফাৎ করে না ওরা। ওদের বিরাদরীকে তারিফ করে ভোঁদাই। এই কারণেই কত হিন্দু অপমানে, অসম্মানে মুসলমান হয়ে গেছে।

হিন্দুরা সকলেই যে দেবদেবী মানে এমন আদৌ নয়। কিন্তু মুসলমানদের আল্লার প্রতি অন্ধ-ভক্তি না থাকলেই চলে না। এই ব্যাপারটা একটু অবাক করে ভোঁদাইকে।

ছেলেবেলার সুখদুঃখের বন্ধু ইমরাত। তার চেয়েও বড় কথা, শিকারের বন্ধু। অনেক বিপদকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে 'সামনা' করেছে ওরা কৈশোর থেকে। এই বন্ধুত্বের রকম অন্যে বুঝবে না।

বিটকেল একদিন বলেছিল ও বাজারে শুনেছে যে, পুরুলিয়ায় প্লেন থেকে যে অস্ত্রশস্ত্র ফেলা হয়েছিল তার সঙ্গে এই মৌলবী সাহেবের নাকি সম্পর্ক আছে।

যতদিন না দোস্তীতে ফাটল ধরছে ততদিন বাজারী গুজবে দোস্ত-এর বিচার করতে বসতে রাজী নয় ভোঁদাই। তাছাড়া ইমরাত পুরো দস্তুর হিন্দুস্তানী। গাছের খাওয়া আর তলার কুড়োনাটা ও অত্যন্ত অপছন্দ করে। ওর নামে মিথ্যে কথা রটায় অন্য মুসমানেরাই।

জঙ্গলে আসার সময়ে নিজেদের অস্ত্র নিয়ে চেকনাকা পেরিয়ে যাওয়া এবং আসাটাও বিপজ্জনক। তাই মৌলবীর বন্দুক নিয়ে শিকার করাটাই সুবিধেজনক ওদের পক্ষে। শিকার নিয়ে ফেরাটাও বিপজ্জনক। তবে নাকাতেও ওরা দিয়ে যায় নজরানা। ধরা পড়লে, কম করে দশ পনেরো বছর সশ্রম কারাদণ্ড। অধুনা ভারতবর্ষের আইন হচ্ছে "Live and let live."! চুরি করো, ডাকাতি করো, ঘুষ খাও, ঘুষ দাও, খুন করো, ধর্ষণ করো, টাকা থাকলেই পার পেয়ে যাবে। ভোটের সময়ে ছাপ্পা মারো, মেরে ক্ষমতাতে এসো। কেউ তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। Nothing succeeds like success.

কেয়া ইয়ার? হুয়া ক্যেয়া?

তবিয়ৎ গড়বড়া গিয়া।

কাহে?

কওন জানে।

তবিয়ৎ, না দিল? রানী মুখার্জী? "পেয়ার কিয়া তো ডোরনা ক্যা?" গান ধরেছিল।

মজাক মত উড়ানা।

বলল, ভোঁদাই বিরক্ত হয়ে।

চলো, মেহমান আওয়াবেগা আজ চাতরা সে। কুছ মিল গ্যায়া তো আচ্ছাহি হ্যায়, খাতিরদারিমে কাম আয়েগা।

তুমহারা শালা কিতনা হ্যায় ইমরাত?

বহুত হ্যায়। মগর তুমহারা তকলিফ কওন চি কি? একভি সাদীভি করনেকা হিম্মৎ হুয়া নেহি তুমহারা, শালা, ক্যা আসমানসে গীড়েগা সুরত হারাম?

শাদী করনেমে ঔর আওলাদ পায়দা করনেমে কওনেসি হিম্মৎকি জরুরৎ পড়তি হ্যায়?

তারপর ইমরাত বলল, লেরে বিটকেল। তুহর চানা-পিঁয়াজ ঔর হারা-মিরচা।

ইমরাত বলল, অব ম্যায় জীপ চালাউঙ্গা,আজ হামারা রিস্তেদার রহমত মিঞা মারেঙ্গে।

ইমরাত স্টিয়ারিং-এ বসল। রহমত গিয়ে সামনের বাঁদিকের সীটে বসল, বন্দুকের ব্যারেল বের করে। সীলড-বিম স্পটলাইটটা এঞ্জিনের বনেটের নীচের ব্যাটারির সঙ্গে ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকানো ছিল। কিন্তু জঙ্গলের আরও গভীরে না গেলে স্পট করা যাবে না। কারণ, পিচ রাস্তা থেকে কোনো গাড়ি বা ট্রাক বা বাস গেলে তারা আলোর আভাস পাবে।

মাইলখানেক গিয়েই পথটা ডানদিকে একটা হেয়ার-পিন টার্ন নিয়েছে। বর্ষার পরে জঙ্গলের বাড় হয়েছে ভীষণ। স্পট ফেললেও নিবিড় আন্ডারগ্রোথ-এর জন্যে দেখা যায় না কিছুই। কোনো জানোয়ার আত্মহত্যা করতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে এলে, অথবা গেলে, অথবা রাস্তা পেরোবার সময়েই একমাত্র তাকে মারার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।

জীপটা সেই হেয়ার পিন বাঁকের মুখে আসতেই দেখা গেল পথজুড়ে দঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড এত দাঁতাল শুয়োর। সাদা দাঁতদুটো জীপের হেডলাইটের আলোতে চেকনাই পেয়েছে।

হারাম। মারো শালেকো।

ইমরাত বলল।

হেডলাইটের আলোর আভাতে বারো-বোর দোনলা শটগানের নাকের মাঝি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। রহমত মিঞা গুলি করল। বন্দুকের ডান দিকের ব্যারেলে "বল" ছিল। বলটা গিয়ে পড়ল শুয়োরটার সামনের পা-এর হাত খানেক আগে। মাটি ছিটকে উঠল। বিশ্রী একটা ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আওয়াজ করে শুয়োরটা তিন লাফ দিয়ে চরকি মেরে জঙ্গলে ঢুকে গেল ঝোপঝাড় ভেঙে।

ভোঁদাই বলল, আইয়ে রহমত ভাই, পিছে আইয়ে। মুঝে জারা চান্স দিজিয়ে।

অত বড় শুয়োরটাকে যে অত কাছ থেকে কেউ মিস করতে পারে, ভাবা যায় না। রহমত ইমরাত-এর শালা হতে পারে কিন্তু শিকারী নয়। মানুষ-মারা শিকারী হয়ত হতে পারে কিন্তু বন্যপ্রাণী মারা শিকারী নয়। সব ব্যাপারেই শিক্ষানবীশী করতে হয়। পৃথিবীতে কোনো কর্মই সোজা নয়, তা দূর থেকে যতই সোজা বলে মনে হোক না কেন!

ইমরাত কিছু বলল না।

রহমত মিঞা পেছনে এল।

ভোঁদাই বলল, সামনে গিয়ে বাঁদিকে উঠে, ইক চান্স হামারা। ইনকো বাদ ম্যায় স্টিয়ারিংমে বৈঠেগা, তুম মারেগা ইমরাত।

জীপটা স্টার্ট করে একশ গজ যাওয়ার পরেই ঐ শুয়োরটাই ডানদিকের জঙ্গল ফুঁড়ে

বাঁদিকের জঙ্গলে যাওয়ার জন্যে দৌড় লাগল। রানিং-এর উপরেই মারল ভোঁদাই মৌলবী সাহেবের দেওয়া, ইংলিশ আলফাম্যাক্স-এর নতুন পৌনে-তিন-ইঞ্চি এল. জি. দিয়ে। এক্কেবারে কানপাট্টিয়ামে।

শুয়োরটা পথের উপরেই পড়ে গেল।

এঞ্জিন বন্ধ করো।

ভোঁদাই বলল।

কাহে?

উঠানা নেহি হোগা?

হারাম হামলোগোনে খায়েগা থোরী।

হামলোগোনেতো খায়েগা।

উ হোনে সেকতা। তো তুম দোনো উঠাও। মগর ই হারামমে হামলোগোনে হাথ নেহি লাগায় গা।

ভোঁদাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। আজ ইমরাত-এর ইয়ার্কি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বেশি মহুয়া খেয়ে ফেলেছে।

তারপর বলল, অজীব বাত! খ্যয়ের ঠিক্কে হ্যায়, হাম ঔর বিটকেল উসকি দাঁত কাট লেগা আর পিছলাওয়ালা দো রাং। উসকি বাদ হাম দোনো পিছে বৈঠেগা তুম দোনো সামনামে বৈঠো মজেমে।

কী ভেবে, ইমরাত বলল, ঠিক্কে হ্যায়। তব উতারো তুম দোনো।

তারপরে বলল, বিটকেল-এর দিকে ফিরে, ঔর বুতল নেহি হ্যায় রে বিটকেলোয়া? সুরতহারাম।

হ্যাঁ জী। হ্যায় হুজৌর।

গরীব বিটকেল বলল, বাধ্য বান্দার মতো। বলে, মহুয়ার নতুন একটি বোতল এগিয়ে দিল ইমরাত-এর দিকে।

ভোঁদাই নামল, জীপের পেছনের সিট-এর নীচে রাখা ছুরিটা বের করে। বিটকেলও নামল।

ভোঁদাই বলল ইমরাতকে, হেড লাইট নেহি না বুতানা।

জী হুজৌর।

ইমরাত বলল। ঠাট্টার গলাতে।

জীপ থেকে নামবার সময়ে বন্দুকটা 'সেফ' করে রহমত মিঞার হাতে দিয়ে দিল ভোঁদাই। বাঁ ব্যারেলেও এল. জি. ভরা ছিল।

মহুয়ার বোতল থেকে ঢকঢক করে অনেকখানি মহুয়া খেল ইমরাত, তারপর রহমত-এর দিকে এগিয়ে দিল বোতলটা।

ভোঁদাই আর বিটকেল যখন শুয়োরটার কাছে গিয়ে পৌঁছেছে তখনই মারুমারের দিক থেকে একটা বড় বাঘ-এর ডাক শোনা গেল। পরপর কয়েকবার। পাহাড়, বর্ষণক্ষান্ত ঘন বন সব যেন থরথরিয়ে কেঁপে উঠল।

বিটকেল ভয় পেয়ে ভোঁদাইকে জড়িয়ে ধরে বলল, কাকু-উ-উ! বাঘ।

ভোঁদাই হেসে বলল, কোনো ভয় নেই। বাঘ সঙ্গিনীকে ডেকেছে। আয়। চটপট কাজ

সারি। আঃ কী নদনদে চর্বিরে। যা ভিণ্ডালু হবে না! মগনাটা আবার শুয়োরের ভিণ্ডালুটা রাঁধে দারুণ।

ভোঁদাইরা যখন কাজ শুরু করেছে তখন হঠাৎই এঞ্জিনটা স্টার্ট করে ইমরাত জীপটাকে এক ঝটকাতে ব্যাক করে নিয়ে পথের মোড়ে মুহূর্তের মধ্যে ঘুরিয়ে, জোরে চালিয়ে চলে গেল ওদের অন্ধকারে ফেলে রেখে। ভোঁদাই তার টর্চটাও নিয়ে নামেনি, জীপের হেডলাইটের আলো ছিল বলে।

এমন ইয়ার্কি কেউ করে? বলো ভোঁদাইকাকু?

বিটকেল বলল।

ভোঁদাই বলল, ইমরাতটা ওরকমই। ইয়ার্কি নয়, তিড়ি মারে। ও চিরদিনই এইরকমই। মনে মনে আসলে ছেলেমানুষই আছে। শরীরের বয়স বত্রিশ, মনের বয়স দশেই আটকে আছে।

এখন কী হবে?

আতঙ্কিত বিটকেল বলল।

কী আবার হবে। এমন নধর শুয়োরটা খাওয়া হবে না। দাঁত দুটো দিয়ে ভাল ছুরি হতো, চাবির-রিং, শু-হর্ন।

অন্ধকারে কিছুক্ষণ থাকতেই চোখ সয়ে এল। উপরে চেয়ে দেখল বিটকেল, তারারা ঝকমক করছে। তবে কৃষ্ণপক্ষর রাত। আজ দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া হবে। চাঁদ উঠবে শেষ রাতে। লাল মাটির পথ আবছা দেখা যায় দু'পাশের সবুজ অন্ধকারে ঢাকা বনের মাঝখানে, কোরা-রঙা নতুন শাড়ির মতো মেলা আছে।

কী করবে ভোঁদাইকাকু?

দাঁড়া। একটু দেখি। ভাবি একটু। যদি ইয়ার্কিই মেরে থাকে তো ফিরে আসবে। তবে কখন? সেই হচ্ছে কথা।

আর যদি না ফেরে?

ভয়ার্ত বিটকেল বলল।

না ফিরলে, আমরা হাঁটা লাগাব। মারুমারে গিয়ে রামধানীয়ার বাড়ি শুয়ে থাকব। মহুয়াডাঁর থেকে আসা লাস্ট বাস তো কখন চলে গেছে। কাল সকালের বাসে ফিরব ডালটনগঞ্জে। অত চিন্তার কি আছে?

পিসী যে চিন্তা করে করে মরে যাবে ভোঁদাইকাকু।

আরে পিসী তো আমারও আছে, না কি? তার ওপরে আমার মাও তো আছে। বাইরে বেরোলে, বিশেষ করে জঙ্গলে, অত মা-মাসীর কথা ভাবলে চলে না।

তারপর বলল, মাঝে মাঝে মা-মাসী-পিসীদের চিন্তা করা ভাল আমাদের জন্যে। বুঝলি। দাম বাড়বে।

বিটকেল কোনো মন্তব্য না করে চুপ করেই রইল।

এই অন্ধকারে মারুমারে হেঁটে হেঁটে যেতে গিয়ে পথে যদি অন্য শুয়োরে ফেড়ে দেয় আমাদের? ভাল্লুকে নাক খামচে তুলে নেয়? সাপ কামড়ায় যদি? যদি বাঘে ধরে।

যদি ফ্যাল নদীতে। অত যদি নিয়ে জঙ্গলে আসা যায়?

ভোঁদাই আর বিটকেল প্রায় মিনিট পনেরো ঐ অন্ধকারে মৃত শুয়োরটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল কিন্তু ইমরাত ফিরল না জীপ নিয়ে।

এও হতে পারে যে, ওর শালার জন্যে কোনো হরিণ-টরিন মেরে ফিরে আসবে এখানে। ইমরাত-এর শালা আসছে আজ রাতে চাতরা থেকে, শুনলি না। সে তো আর শুয়োর খাবে না।

কেন?

আরে গাধা শুনলি কি তবে এতক্ষণ? শুয়োর খায় না মুসলমানেরা। শালার খাতিরদারীর জন্যেই তো আজকে এসেছে ও। আমার জীপ, আমার ডিজেল, ধরা পড়লে জীপ বাজেয়াপ্ত হয়ে আমারই দশ-পনেরো বছরের জেল হবে। সশ্রম কারাদণ্ড। তোরা তো সকলে জঙ্গলে জঙ্গলে সটকে যাবি। ফিগার ভাল হয়ে যাবে শাহরুখ খানের মতো। আর দ্যাখ আমার সঙ্গেই এরকম পেঁয়াজি। আমাকে চেনে না ইমরাত। একদিন এমন শেখাবো না!

বলেই, কান খাড়া করে উৎকর্ণ হয়ে শুনল, ঐ দিকে কী খসখস শব্দ হল একটা।

এবার চলো ভোঁদাইকাকু।

জঙ্গলে ওরকম কত শব্দ হয়। জংলী ইঁদুর-ফিঁদুর হবে। জঙ্গলে এরকম রাতের বেলা অন্ধকারে ঘোরার মতো মজা আছে? আমি তো এই মজার জন্যেই আসি। ইমরাতটা তো শুধু জানে গুলি করতে আর মরা জানোয়ারকে হালাল করে নিয়ে গিয়ে খেতে। চিজ একটা। ওর মধ্যে অন্য অনেক গুণ আছে কিন্তু সূক্ষ্মতা বলে কোনো ব্যাপারই নেই। অমলদারই মতো। তারপর বলল, বেঁচে গেছে। যে মানুষ যত সূক্ষ্ম, যত সুরুচিসম্পন্ন, যত স্পর্শকাতর তার দুঃখও তত বেশি!

বিটকেল এসব কথার কিছু বুঝল না। যেদিক থেকে খসখস শব্দটা এসেছিল সেদিকেই তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে সেদিকের সবুজ অন্ধকারে।

চল এগোই। ইমরাত ইচ্ছে করলে আজই আমাকে ফাঁসাতে পারে। মানে ওর ইয়ার্কিটা যদি একটু বাড়াবাড়ি রকমের করে আর কী। শালার সামনে বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে কত কী করে মানুষে!

কী করে?

বিটকেল জিজ্ঞেস করল।

কোনো কিছু মেরে, মানে, হরিণ-টরিণ, বাঘ-ভাল্লুক মারার হিম্মৎ তো ওর নেই। তাছাড়া জানে ও, যে মারলে, হ্যাপাও অনেক। যে-জানোয়ারই মারুক, মেরে আমার জীপের মধ্যে মরা জানোয়ারটাকে ফেলে রেখে যদি তার মৌলবীর বাড়ি গিয়ে বিরিয়ানি খায় তাহলে কালই আমাকে অ্যারেস্ট করবে পুলিস, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের করা ডাইরীর জোরে।

এমন করতে পারে?

পারে না? বলিস কি? সেদিন মোহনদাদের একজন ট্রাক ড্রাইভারের ট্রাকের চাকার তলাতে একটা ব্যর্থ-প্রেমিক খরগোস আত্মহত্যা করল দৌড়ে এসে, সে জন্যে এখনও কেস চলছে। শুনলাম, মোহনদা দশ হাজার টাকা খেসারত দিয়ে অফেন্স 'কম্পাউন্ড' করে কেস মিটিয়ে নেবে। বোঝ তবে। একেই বলে, বজ্র-আঁটুনি, ফস্কা-গেরো।

বিটকেল-এর মাথার ওপর দিয়ে কথাগুলো ঝোড়ো হাওয়ার মতো বয়ে গেল। ওর বোধগম্য হলো না কিছুই। বিটকেল শুধু বলল, আমারও জেল হবে তোমার সঙ্গে ভোঁদাইকাকু? তাহলে আমার পিসীর কি হবে?

উলুবনে মুক্তো ছড়ালো তা বুঝতে পেরে বিরক্ত স্বরে ভোঁদাই বলল, আমার পিসীর যা হবে, তোর পিসীরও তাই হবে। তোর পিসীকে আমার মা আর পিসী আমাদের বাড়িতে এনে রাখবে। কিন্তু তোর জেল হবে কেন? আমি বলব, তুই আমাদের সঙ্গে ছিলিই না।

তুমি বললে কি হবে। সকলে বুঝি দেখেনি আমাকে? নাকাতে? তাছাড়া ইমরাত কাকুই বলে দেবে।

না, না। ইমরাত মানুষ ভাল। ও বলবে না। তোর ক্ষতি করে ওর কী লাভ হবে?

তারপরে বলল, তুই চুপ করত। সে আমি বুঝব। জঙ্গলের মধ্যে কথা বললে কখন কোন জানোয়ার এসে ঘাড়ে পড়বে তার শব্দ পাবি কেমন করে? একদম চুপ করে চল।

বিটকেল চুপ করে গেল। কিন্তু মনে মনে বলল, নিজে যে এতক্ষণ গড়গড় করে কত কথা বললে তার বেলা কিছু নয়।

মিনিট পনেরো হাঁটার পরে বিটকেল বলল, ভোঁদাইকাকু, যদি দারহা মেলে পথে।

দারহা মানে?

তুমি দারহা কি জানো না?

না তো!

দারহা একরকমের জংলী ভূত। রমেন জ্যাঠার কাছে শুনেছি আমি। রাতের বেলা হঠাৎ জঙ্গলের পথে সামনা-সামনি এসে দাঁড়িয়ে পড়বে। তাল গাছের মতো লম্বা। এদিকে রোগা টিঙটিঙে। মুখটা পেছন দিকে থাকে। সে বলবে, আও। হামসে কুস্তী লড়ো।

আর না লড়লে?

না লড়লে তোমাকে গলা টিপে মেরে জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

দারহার সঙ্গে দেখা হলে আমি তো আর বেঁচেই থাকতাম না। তাই দেখিনি। তুই দিনে দিনে একটা রামছাগল হচ্ছিস। রমেনদার গুলকে তুই সত্যি ভেবে বসে আছিস?

পিসীও তাই বলে।

কি বলে?

আমি একটা রামছাগল।

কাত্যায়নী মাসী ঠিকই বলে।

এমন সময় গুম্ করে একটা শব্দ হলো দূরে।

ওটা কিসের শব্দ?

দাঁড়িয়ে পড়ে, বিটকেল বলল।

বনের গভীরে রাইফেলের শব্দ একরকম শোনায়, বন্দুকের শব্দ অন্যরকম। গুলি যদি জানোয়ারের গায়ে লাগে তাহলে একরকম শব্দ হয় আর যদি ফসকে যায় তাহলে অন্যরকম শব্দ হয়। ছেলেবেলা থেকে বনে জঙ্গলে ঘুরছে বলে ভোঁদাই এসব জানে। ফাঁকা জায়গাতে শব্দ একরকম শুনতে লাগে, গভীর জঙ্গলে অন্যরকম। জলের ওপরে আরও অন্যরকম।

বিটকেল আবার উদ্বিগ্ন গলাতে বলল, ও কিসের শব্দ ভোঁদাই কাকু?

হরিণ কিংবা অন্য কিছু মারল ইমরাত।

কত দূরে?

খুব বেশি দূরে নয়। মীরচাইয়া ফলস্-এর কাছাকাছিই হবে।

ও। তবে আমাদের ফেলে যায়নি।

ওর ঘাড়ে ক'টা মাথা। আমাকে ও ভাল করেই চেনে।

তবে ইয়ার্কি মারছিল বলো। এ কী রকম ইয়ার্কিরে বাবা!

ওর ইয়ার্কি ওরকমই। ছেলেটা কিন্তু ভাল। মনটা খুবই বড়। ওকি আমার আজকের দোস্ত? নেঙ্গোটিয়া দোস্ত। বাবার অসুখের সময়ে ও যা করেছে তার ঋণ কোনোদিনও শোধবার নয়।

তবে ইমরাতকাকুর সঙ্গে অত ঝগড়া করছিলে কেন?

আরে ঝগড়া তো মানুষে কাছের মানুষের সঙ্গে, ভালবাসার মানুষের সঙ্গেই করে। যে পর, তার সঙ্গে কি কেউ ঝগড়া করে?

তা ঠিক।

তবে চল আমরা ফিরি।

কোথায়?

বাঃ! শুয়োরটার কাছে।

কেন?

হায়নাতে বা শেয়ালে এসে খেয়ে যেতে পারে। নেকড়েও আছে বেতলার জঙ্গলে। খেতে পারে খিদে থাকলে। তাছাড়া, আমরা ওখানেই না থাকলে ইমরাত ভাবতে পারে, ওরা আমাদের অন্ধকারে ফেলে চলে গেছে বলে খুবই ভয় পেয়েছি আমরা।

কী জানি কাকু। তোমাদের বন্ধুত্বর রকমটা ভারী গোলমেলে।

তা হোক। মগনা যা ভিণ্ডালু রাঁধবে না ঐ শুয়োরের। তুই শুয়োর খেয়েছিস আগে?

দূর। গু খায় ওরা।

আরে সে তো ধাঙ্গড়-বস্তির শুয়োর। এই শুয়োরেরা তো বনের গাছ-পাতা ফল-মূল খায়। রামচন্দ্র যখন বনবাসে ছিলেন তখন বন্যবরাহ শিকার করে খেতেন। শুধু রামচন্দ্রই কেন? রাম লক্ষ্মণ সীতাও। ফারস্ট-ক্লাশ মাংস না হলে তাঁরা কি খেতেন।

তাহলে ইমরাত চাচারা খায় না কেন?

ওদের কথা ছাড়। ওরা তো গরু খায়। ওরা ওদের মতো থাকুক, আমরা আমাদের মতো। 'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান।' গান শুনিসনি?

আমি আর কী শুনেছি ভোঁদাইকাকু! ভোর পাঁচটাতে উঠি, এগারোটাতে শুই। কী করে যে আমার আর পিসীর দিন কাটে, তা আমরাই জানি। তাও তো নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। আজকাল এই সব বাঙালি মিষ্টি-ফিস্টি বাঙালিরা খায় না।

হুঁ। বাঙালি জাতটাই মুছে যাবে আস্তে আস্তে। তারা বাংলা পড়ে না, শাড়ি পরে না, বাঙালি রান্না খায় না। দারহার মতোই আশ্চর্য ভূত হয়ে উঠছে তারা আস্তে আস্তে।

ওরা শুয়োরটার কাছে পৌঁছতে পৌঁছতেই জীপের এঞ্জিনের আওয়াজ এল দূর থেকে।

আসছে বাঁদরটা।

বলল, ভোঁদাই।

তোমরা কি প্রায়ই এরকম ঝগড়া করো।

তা করি।

বাবা!



ভিখুকে দিয়ে দীপিতা বানোয়ারির দোকান থেকে একটা মাইসোর স্যান্ডাল সাবান আনিয়েছিল আজ সকালেই তাব হাতখরচের পয়সা থেকে। শাশুড়ি নাকি চিরদিন নিম সাবান মাখেন, তাই বাড়িতে শুধু নিম সাবানই আসে গায়ে মাখার জন্যে। শাশুড়ি আর্নিকা তেল ব্যবহার করেন মাথায় অতএব দীপিতারও তাই মাখতে হয়। তার স্বভাব-চরিত্র অভ্যেস সবকিছুই বদলে যেতে বসেছে বিয়ের পরে। কম্যুনিস্ট রাশিয়াতেও বোধহয় এমন ব্রেইন-ওয়াশিং কবা হয় না।

চন্দনের গন্ধ খুব ভালবাসে দীপিতা। সাবান, কী পারফ্যুম, কী আতর যে মাখে, তার নিজের জন্যে সে সুগন্ধ যতখানি, তার চেয়ে অনেকই বেশি তার কাছে-থাকা মানুষদের জন্য।

কলকাতাতে যখন ছিল দীপিতা আতব কাকে বলে জানত না। ডালটনগঞ্জে আসার পর ভোঁদাইই প্রথমে আতর নিয়ে এসে ক্রমে দীপিতাকে আতরে অভ্যস্ত করিয়েছে। তার স্বামী অমলের শখ বলে কিছু নেই। এক খাওয়া আর ঘুম ছাড়া। দীপিতা কী শাড়ি পরল, কী সাবান মাখল বা কী সুগন্ধে সুগন্ধী হলো সে সবে তার কোনোই খেয়াল নেই। বিবরবাসী নগ্ন-মানুষ যেমন তার সঙ্গিনীর নগ্না-শরীর অন্ধকার বিবরের মধ্যে কর্ষণ করত, কী করছে তা না জেনেই, নিছকই অভ্যাসবশেই, অমলও তার মানসিক ক্লান্তি, পারিবারিক অশান্তি, একঘেয়েমি এবং যৌবনের তীব্র গতিজাড্য অপনোদন করত অন্ধকার-করা ঘরে প্রায় বিবরবাসী পুরুষেরই মতো। যে-নারীর উপরে তার একশ ভাগ অধিকার, তার শরীর নিয়ে যা খুশি তাই করত। তার নিজের সুখটুকুই সব ছিল। অন্ধকারে দীপিতার দু'চোখের কোল গড়িয়ে যে জলের ফোঁটা পড়ে বালিশ ভিজে যেত সেই খবর অমল কোনোদিনই রাখেনি, অন্য অনেক মূর্খ, স্বাধিকার-মত্ত স্বামীরই মতো।

এ সব দুঃখের কথা আলোচনা করে এমন কোনো নারীই ছিল না ডালটনগঞ্জে ধারে-কাছে দীপিতার। কেন জানে না, আজ বিকেলে চন্দন সাবান দিয়ে গা ধুতে ধুতে ওর হঠাৎ ভীষণই কান্না এল। একবার ভাবল, যাবে না ভোঁদাইদের বাড়িতে। তার কারো সামনে বেরোতেই আর ইচ্ছে করে না আজকাল। কুনো হয়ে গেছে, না-বেরিয়ে বেরিয়ে। কে না কে আসছে তার জন্যে দীপিতার যাওয়ার কী দরকার। যাদের পড়শি সেই অমল আর তার বোন সিমলি গেলেই তো চলে।

তবুও বাঁ হাত দিয়ে চুলের ঝুঁটি উঁচু করে ধরে ডান হাত দিয়ে খুব ভাল করে ঘাড়ে

সাবান ঘষল। তারপর বাঁ হাত দিয়ে। গলায়, বুকে, তলপেটে, হাতে, পায়ে, মেয়েলি শরীরের নানা পর্বত-কন্দরে। সর্বাঙ্গে সাবানের ফেনা তুলে দারুণ চান করে উঠল ও। শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করেই চানে গেছিল। যাবার আগে শাড়ি-ব্লাউজ বের করেই রেখে গেছিল। একটা মাহেশ্বরী শাড়ি, জারুল ফুলের মতো হালকা বেগুনি তার রঙ, আর তার সঙ্গে সাদা ছোট-হাতা কটন-এর ব্লাউজ। তার মায়ের একছড়া গার্নেটের হার ছিল। বিয়ের সময়ে বড়মামী তাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরেনি কখনও। আজই পরবে বলে বের করে রেখেছিল। ঐ শাড়িটাতে Falls লাগানো ছিল না। ভোঁদাই গত রবিবারে নেমন্তন্ন করার পরই ভিখুকে রহমান-দর্জির কাছে পাঠিয়ে ফলস লাগিয়ে এনেছে। এই সময়টা ডালিয়া ফোটার আসল সময় নয়, তবে সবে ফুটতে আরম্ভও করেছে। ভিখুকে দিয়ে সিভিল কনট্রাকটর বিষেন সিং সাহেবের মেয়ের কাছ থেকে একটা ফিকে বেগুনি-রঙা ডালিয়া আনিয়ে গেলাসে নুনজল দিয়ে রেখেছিল চানে যাবার আগে।

শ্যাম্পু করে চান সেরে যখন সাজগোজ শেষ করল, চোখে গাঢ় করে কাজল দিল, বাহুমূলে আর স্তনসন্ধিতে ফিরদৌস আতর, তারপর ফুল গুঁজল খোঁপাতে, তখন সত্যিই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে রানী মুখার্জির মতোই মনে হলো ওর। ভোঁদাই ঠাট্টা করে ওকে রানী মুখার্জি বলে ডাকছে কিছুদিন হলো। মিল ঠিক কোথায় তা জানে না, তবে মুখের বুদ্ধির প্রসাধনে সম্ভবত মিল আছে কিছু। পুরুষেরা তার মধ্যে কী যে দেখে, তা তারাই বলতে পারে। তবে তার স্বামী অমল যে বিশেষ কিছুই দেখে না তার মধ্যে, সে কথাটুকুই সে বলতে পারে।

চান করার আগে চানঘরে রাখা নুনের বয়ম থেকে আজ নুন নিয়ে গ্লাসে করে গিজারের গরম জলে গার্গল করেছিল। যদি সত্যি সত্যিই গান গাইতে হয়ই, সে জন্যে।

অমল অনেক আগেই তৈরি হয়ে বারান্দার রেলিং-এর উপরে পা তুলে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। পুঁটি যাবে না। শাশুড়ির মানা। উল্টোপাল্টা খেয়ে শরীর খারাপ করতে পারে, সেই জন্যে। পুঁটি, অন্নদাদেবী আর সুরাতিয়ার কাছেই থাকে বেশি সময়। আগামী মাসে চার-এ পড়বে। তাকে এবার স্কুলে দেওয়া দরকার। কিন্তু শাশুড়ির ভীষণই আপত্তি। বলেছেন, ছ'বছরে পড়লে তবেই স্কুলে যাবে ও। সিমলি যেমন গেছিল। সিমলিদের সময় আর এখনকার সময় যে এক নয়, এ কথা তাঁকে বোঝাবে কে? মেয়েটার স্বভাবই ছিচকাঁদুনে হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। নিজের সন্তানকে যেভাবে মানুষ করবে ভেবেছিল তার কিছুই হচ্ছে না। পুঁটির উপরেও দীপিতার কোনো অধিকার নেই। রাতেও অন্নদা তাকে শুতে দেন না দীপিতার সঙ্গে। বাঁকা চেখে বলেন, তোমাদের সুবিধের জন্যেই তো রাখি আমার কাছে। বলেন, আমাদের শাশুড়িরা যদি এমন হতেন তো আমরা তখনকার দিনের বৌরা বর্তে যেতাম। কে জানে! 'তখনকার দিনের' অন্নদার মতো বৌ-এরা বোধহয় দাম্পত্য বলতে ঐ একটা জিনিসই বুঝতেন। ভাবলেও গা ঘিনঘিন করে।

আসলে পুঁটিকে অন্নদা তাঁর খেলনা করেছেন। ধীরে ধীরে মেয়েটার সঙ্গে দীপিতার আত্মিক যোগ হালকা হয়ে যাচ্ছে। ওর 'নিজস্ব' বলতে তো শুধু ঐ আত্মজাই। সেই আত্মজার শিকড়টিও তার থেকে শাশুড়ি আলগা করে দিচ্ছেন ক্রমাগত। বুঝতে পারে দীপিতা। চারদিক থেকে এক গভীর চক্রান্ত তাকে ঘিরে ফেলছে। এই লক্ষ্মণরেখা ছিঁড়ে তাকে বেরোতেই হবে। কিন্তু বেরোবে কী করে।

তৈরি হয়ে দরজা খুলে ভিতরের বারান্দা হয়ে যখন বাইরের বারান্দাতে এল তখন দেখল অমল বারান্দাতে নেই। বাগানে পায়চারি করছিল সে। দীপিতাকে দেখে জ্বলন্ত সিগারেট-এর টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে বলল, বাবাঃ! যাবে তো পাশের বাড়িতেই, সাজ দেখে মনে হচ্ছে যেন অভিসারে চলেছ! সিমলি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে করে চলে গেছে। আমিও চলেই যাচ্ছিলাম।

দীপিতা ভেবেছিল, অমলকে জিজ্ঞেস করবে, কেমন দেখাচ্ছে আমাকে? ভেবেছিল, আবার ভাবেওনি। বিয়ের পর থেকে আজ অবধি অমল নিজে থেকে কখনও বলেনি তাকে কেমন দেখাচ্ছে। যায় না তো ও কোথাওই! কোনো বিয়ে-বাড়িতে যাওয়ার সময় একটু সাজগোজ করার পরে খুবই ইচ্ছে করে বাড়ির লোকে কেউ একটু বলুক, 'বাঃ! বেশ দেখাচ্ছে তো।'

এ বাড়িতে কেউ কোনোদিনও বলেনি। সাজগোজ করতে জানেও না কেউ। তবে ননদ সিমলি কোথাও যেতে হলে দীপিতার কাছে সাজতে আসে। ওর কোনো কোনো বন্ধুও আসে। এক বন্ধুর বিয়ের সময়ে তার মা সিমলিকে অনুরোধ করেছিলেন দীপিতাকে কনে সাজাতে আসতে। অন্নদাদেবী যেতে দেননি। বলেছিলেন, তার চেয়ে চুল-বাঁধার নখ-কাটার দোকান দিলেই হয়. কর-বাড়ির বউ নাচতে নাচতে কোথাও গিয়ে কারোকে সাজাবে না।

তারপর সিমলিকে বলেছিলেন, সাজতে হলে, তোর বন্ধুকে বল এখানে এসে সেজে যাবে। বিয়ের দিন বিয়ের কনের পক্ষে আসা সম্ভব হয়নি। এই ঘটনাতে সিমলির খুব রাগ হয়েছিল তার মায়ের উপরে।

অমল অমন সাধ-করে সাজা দীপিতার দিকে একবার পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল না পর্যন্ত। বিরক্ত মুখে বলল, আমি এগোলাম। বলেই, আগে আগে গেট খুলে বেরিয়ে গেল। দীপিতা অনেকখানি পেছনে পেছনে হেঁটে যেতে লাগল। ও ভাবছিল, এমন ভাবেই যদি যাবে তাহলে আর দীপিতার অপেক্ষাতে আদৌ থাকা কেন? চলে গেলেই তো হতো। কে জানে। ওর বাবাকে দেখে হয়তো ও শিখেছে যে, স্ত্রীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করাটাই 'শিভালরি'। দোষটা অমলের নয়, অমলের রক্তের।

সারাটা সপ্তাহ দীপিতার কেবলই মনে হয়েছে এই কাতুস সেই কাতুস নয় তো? তার কলেজের বন্ধু মাধবীর কাজিন। মাধবীদের বাড়িতেই আলাপ হয়েছিল। দীপিতাকে দেখেই যে কাতুস একেবারে Head over Heels প্রেমে পড়েছিল এটা কোনো কথা নয়। সে অনেক পুরুষেই পড়েছে তার কৈশোর থেকেই। কথাটা হচ্ছে এই যে, দীপিতারও তাকে ভীষণই ভাল লেগেছিল। ঠিক ঐরকম ছেলে তাদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে একজনও ছিল না। ছেলে বন্ধুদের আজকাল সকলেই মেয়ে বন্ধুদের মতো 'তুই তুই' করেই বলে কিন্তু কাতুসের মধ্যে কিছু একটা বা একাধিক ব্যাপার ছিল যে কারণে ওকে তুই বলতে পারেনি দীপিতা প্রথম দর্শনে। মনে মনে সম্ভ্রমে তাকে আপনিই বলতে চেয়েছিল কিন্তু তা না বলে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করেছিল। অনেক গল্প হয়েছিল। গান হয়েছিল। এক গভীর ভাললাগায় ভাসতে ভাসতে সেই সন্ধ্যেতে মামাবাড়িতে ফিরেছিল দীপিতা।

পরদিন মাধবী ফোন করে বলেছিল, তুই কাতুসদার মাথাটি আস্ত চিবিয়ে খেয়ে গেছিস কালকে দীপিতা। প্রেমে পড়লে চালাক মানুষেরা বোকা হয়ে যায় আর বোকারা চালাক,

এমন শুনেছিলাম কিন্তু সত্যি সত্যিই যে হয় তা কাট্টুসদাকে দেখেই প্রথম বুঝলাম। প্রাণে মারিস না প্লীজ আমার ভাল দাদাটাকে।

তারপরে আর কাট্টুসের সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে ফোন করত সে প্রায়ই। দীপিতাও ফোন করত মাঝে মাঝে। বড়মামা কাট্টুসের সঙ্গে তার সেই প্রথম আলাপের মাস দুয়েক পরই দীপিতাকে হঠাৎই ঘাড় থেকে নামালেন। ব্রজেন কর নামক খুনী-খুনী মানুষটি এক সকালে এলেন। বড়মামা দীপিতাকে ডেকে বললেন, প্রণাম করো।

যাকে-তাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে একেবারেই ভাল লাগে না দীপিতার ছেলেবেলা থেকেই। তবু করতেই হলো। বড়মামী তারপরে দীপিতাকে অমলের একটি ফোটো দেখালেন নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে। জিনস-পরা আর আডিডাসের গেঞ্জী-পরা স্পোর্টসম্যানের মতো দেখতে লম্বা-চওড়া একটি ছেলে জীপ গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তবে, গ্রাম্য-গ্রাম্য। বোকা-বোকা চেহারা।

বড়মামী বললেন, ব্রজেনবাবু তোর বড়মামার বহুদিনের বন্ধু। খুবই উপকারী বন্ধু। অবস্থা দারুণ ভাল। ছেলে বি.কম পাশ, বাবার ব্যবসার পার্টনার। ডালটনগঞ্জে বাড়ি, গাড়োয়াতে বাড়ি, দু'খানা গাড়ি, একমাত্র ননদ, তারও বিয়ে হয়ে যাবে ক'দিন পর। এখন ক্লাস নাইনে পড়ে। তার দুই ছোট দেওর। এরকম ঝামেলাহীন পরিবার হয় না। তোর অনেক কপাল যে বাড়ি বয়ে উনি তোকে নিতে এসেছেন।

আমার পড়াশুনো মামীমা?

প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেছিল দীপিতা।

পার্টটুতে বসলে কি আর লেজ গজাবে! পরীক্ষার ফল তো মেয়েদের বিয়ের জন্যেই দরকার। তা তুই পরীক্ষা না দিয়েই যদি এই বিয়ের পরীক্ষাতে পাশ করে যাস তাহলে আর মিছিমিছি পরীক্ষার জন্যে অপেক্ষা করবি কেন? এম.এ., এম. ফিল, পি. এইচ. ডি করে কারা? যে সব মেয়ের বিয়ে হয় না। প্রত্যেক মেয়ের জীবনের পূর্ণতাই বিয়েতে। সংসার করবি, মা হবি, সুখে থাকবি, এর চেয়ে বড় চাওয়া মেয়েদের জীবনে আর কী থাকতে পারে! তাছাড়া যা প্রতিযোগিতার দিন আজকাল! পড়াশুনা করতে চাইলেই কি সকলেই তা করতে পারে, না? করার যোগ্যতা রাখে! তোর মামা রিটায়ার করেছেন চার বছর হলো। ওঁর কিছু একটা হয়ে গেলে তোকে নিয়ে আমি কী করব? তোর মামা যা বলেন তাই কর। মা-বাবা মরা তোকে কি আর উনি ভাসিয়ে দেবেন? আমরাই তো মা-বাবা চলে যাওয়া তোকে এত্ত বড়টি করে তুললাম। না, কি?

দীপিতা মনে মনে বলেছিল, তা তুলেছিলে, কিন্তু মামাতো-দিদি অনুরাধার আয়ার মতোই ব্যবহার করে এসেছিলে চিরদিন। অনুদিই বরং তাঁর সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করত। অনুদি যখন তার ব্রিলিয়ান্ট প্রাইভেট-টিউটার শেখরদার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করল আর আহমেদাবাদে চলে গেল তার পরের বছর দুয়েক মামা-মামীমা তার সঙ্গে মেয়ের মতোই ব্যবহার করেছিলেন অবশ্য।

যাই হোক, দীপিতার আপত্তি করার কোনো উপায়ই ছিল না। তাছাড়া ভেবেছিল, বিয়েই সম্ভবত মেয়েদের সমস্ত সুখ ও আহ্লাদের শেষ কথা। যে মেয়ের বিয়ে না হয়, তার জীবনই বৃথা। তাছাড়া, বিয়ে তো সবসময়ই একটা জুয়া। ভালবেসে বিয়ে করলেও তাই,

না-ভালবেসে করলেও তাই। চারদিকে তো কতই দেখল ছেলেবেলা থেকে। এমনকি অনুদি-শেখরদারও নাকি বনিবনা হয় না এখন। এতো প্রেম ছিল যাদের। অনুদি নাকি কম্প্যুটার কোর্স করে একটি চাকরি নিয়ে মেয়েদের হস্টেলে একা থাকে। শেখরদার একটি বড়লোক গুজরাটি মেয়ের সঙ্গে ভাব হয়েছে। তাই যদি হবে তবে মামা-মামীর কথাতে রাজী হয়ে যেতে আপত্তিই বা কি?

আশ্চর্য!

দীপিতা মনে মনে নিজেকে বলল, এতো সব কথা ভোঁদাইদের বাড়িতে যাবার সময়েই কেন মনে হচ্ছে দীপিতার? তার মন আজকে সকাল থেকেই এমন বিবশ কেন? সে কি মনে মনে নিশ্চিতই হয়েছে যে মাধবীর পিসতুতো দাদা কাট্টুসই ভোঁদাই-এর পিসিমার ছোট জা-এর ছেলে কাট্টুস? হওয়াটার সম্ভাবনাই বেশি। কাট্টুস নামটাই এমন যে, তা বেশি মানুষের থাকা সম্ভব নয়। ভেরী আনকমোন নাম।

ভোঁদাইদের বাড়ির দোতলা থেকে সাউন্ড সিসটেমে অজয় চক্রবর্তীর ভজন ভেসে আসছিল। অজয় চক্রবর্তীর একমাত্র সন্তান কৌশিকী নাকি দারুণ গাইছে। দেখতেও নাকি ভারী সুন্দরী। এখনও তাকে কিশোরীই বলা চলে। সেদিন কোন কাগজে যেন পড়ছিল। ভোঁদাই-এর মায়ের কাছে উস্তাদ রাশিদ খাঁ-এর দুটি ক্যাসেট আছে। মেঘগর্জনের মতো গলা। সামনে থেকে এঁদের কারোকেই তো আর শোনা হবে না এ জীবনে, ক্যাসেটই সার। অমলকে যে বলবে একটা সি.ডি প্লেয়ার কিনে দাও তাও তার সাহস হয় না। যে মানুষ গান পছন্দই করে না, তাকে বলেই বা কোন মুখে? বললেও বলবে, তোমার জন্যে কি চুরি করব? ঐ কটা টাকা তো দেন বাবা! অনেক পাপ করলে মানুষে আমার মতো বাপের চাকরি করে।

অমল ততক্ষণে ভিতরে ঢুকে গেছিল। ভোঁদাইদের অ্যালসেশিয়ান কুকুর, যার নাম পিশাচ, সে খোলা ছিল। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে-থাকা সিমলি বলল, গলা তুলে, ঐ তো বৌদি আসছে।

দীপিতা মুখ তুলে বলল, পিশাচকে বাঁধতে বল সিমলি।

ভোঁদাইও বারান্দার রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়াল এসে, গলা চড়িয়ে ডাকল, রামলগন! বাঁধ। বাঁধ। পিশাচকে বাঁধ।

রামলগন দৌড়ে এল। এসে বাঁধল কালো অ্যালসেশিয়ানটাকে।

রামলগন পিশাচ বলতে পারে না, বলে পীযূষ। ঝুমরী তিলাইয়াতে বাড়ি রামলগনের। সেখানে একটা দাড়িওয়ালা চশমাপরা নোংরা বাঙালি হাজামৎ, অর্থাৎ নাপিত আছে, তার নাম নাকি পীযূষ। সে একদিন রামলগনের দাড়ি কামাতে গিয়ে তার বাঁ কানের অনেকখানি কেটে দিয়েছিল। তখন থেকে রামলগনকে ঝুমরীতিলাইয়ার মানুষে কান-কাটা রামলগন বলে ডাকে। সেই রাগেই এই লাল চোখো কালো কুকুরটাকে রামলগন পীযূষ বলে ডাকে। কান কাটা যাওয়ার পর থেকে সব হাজামৎ, সব পীযূষই তার কাছে পিশাচ। যদিও পিশাচ শব্দটির মানে জানে না রামলগন, তবে জানে বেশ খারাপই কিছু হবে নিশ্চয়ই!

ভোঁদাই বলল, বাবাঃ। খোঁপাতে আবার ফুলও লাগিয়েছ আজ।

বলেই বলল, নাঃ। আজ, কুছ কুছ হোগা। পুটুস আজকে ফুটুস করে ফুটে যাবে।

পুটুস আবার কে?

ঐ তো পিসিমার দেওরের ছেলে।

তুমি যে বললে, তাঁর নাম কাট্টুস।

আমি ভুল শুনেছিলাম। তাঁর নাম কাট্টুস নয়, পুটুস।

তিনি আসেননি এখনও? ওপরেই এসো তো আগে। তারপরে কথা হবে। তুমি কি শুধু নন-এগজিস্টেন্ট কাট্টুস-এর জন্যেই আমাদের বাড়ি আসতে রাজী হয়েছিলে? আমরা কেউই নই?

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে যাওয়ার সময়ে দীপিতা দেখল, সিঁড়ির পাশে একতলার ঘরে অমল বসে আছে। টেবলের ওপর রাম-এর বোতল, গ্লাস, বরফের বাটি, লেবু সব সাজানো।

মনে মনে বলল, ও। ঐজন্যেই এত তাড়া!

অমল বলল, দীপিতাকে, ভোঁদাইকে নীচে পাঠিয়ে দিও তো!

কেন জানে না, হঠাৎ অমলের ওপরে ভীষণই বিরক্তি বোধ করল দীপিতা। অমলের কথার উত্তর না দিয়ে, ও ওপরে উঠে গেল আস্তে আস্তে।

সত্যি বৌদি। আজ তোমাকে যা দেখাচ্ছে না, তোমার জন্যে আমি আজ জীবনও দিয়ে দিতে পারি। একেবারেই রানী মুখার্জীর রেপ্লিকা।

মনে মনে খুব খুশী হলেও, দীপিতা বলল, আমি, আমিই থাকতে চাই। কারো রেপ্লিকাই হতে চাই না।

দোতলাতে উঠতেই ভোঁদাই-এর মা দীপিতার থুতনি ধরে আদর করে বললেন, ভোঁদাই কিন্তু বাড়িয়ে বলেনি বৌমা। তোমাকে আজ ভারী-সুন্দর দেখাচ্ছে। সেজেছোও ভারী সুন্দর। এই গয়নাটা তো দেখিনি আগে কখনও।

সিমলিই বলল, তার বৌদির হয়ে, এটা বৌদির মায়ের গয়না। গার্নেট।

পিসীমা বললেন, শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করে ডালিয়াটা কেমন লাগিয়েছে দীপিতা খোঁপাতে! অমন জারুল ফুলের রঙের ডালিয়া পেলে কোত্থেকে?

না গো মেয়ে, তোমার রুচি আছে। পিসীমা বললেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল দীপিতার।

পুটুস-এর জন্যে অপেক্ষা করে করে থেকে এই পাঁচ মিনিট আগে হাটিয়া থেকে ফোন এল যে প্লান্টে ব্রেকডাউন হয়েছে। অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও ওর পক্ষে আজ আসা সম্ভব হবে না। অবশ্য বিকেল তিনটেতেই জানিয়েছিল যে, বোধহয় এসে পৌঁছতে পারবে না। তবু চেষ্টা করছে। না আসতে পারলে জানাবে।

ভোঁদাই ঠাকুরপো বলেছিলেন আপনার দেওরের ছেলের নাম নাকি কাট্টুস?

দীপিতা বলল ভোঁদাই-এর পিসিমাকে।

না না, ওর নাম পুটুস। পুটুস ফুল দেখেছো তো। পুটুসের ঝাড়।

না তো।

সে কি!

পিসিমা বললেন, এদিকে পথের পাশে পাশে যে কটুগন্ধী ঝাড়গুলো হয় না? দেখোনি? নানা-রঙা ফুল হয় তাতে।

ইংরাজী নাম LANTANA।

বিশ্বাস-কাকীমা বললেন, তোমার কাকাবাবু আমাকে এই ইংরেজী নামটা বলেছিলেন।

পিসীমা বললেন, পুটুস এঞ্জিনীয়র। হাটিয়ার হেভি এঞ্জিনীয়ারিং করপোরেশনে কাজ করে! ও খড়গপুরের আই. আই. টি. থেকে পাশ করে বেরোয়। মেকানিকাল এঞ্জিনীয়র। রুচি শখ, সবই এরকম। ভোঁদাই-এরই মতো। ভোঁদাই ওকে দেখেনি। এলেই আলাপ হবে প্রথম। সাহিত্য, গান, ছবি আঁকা সবেতেই তো দুজনের সমান উৎসাহ।

এমা! উনি আসবেন না। তাহলে আমাদের একটা খবর পাঠালেন না কেন বিকেলেই কাকীমা?

মনমরা হয়ে বলল, দীপিতা।

কেন? তোমরা কি একদিনের বদলে দু'দিন খেতে পারো না আমাদের এখানে? মগনলাল-এর রান্না তো সব প্রায় হয়েই এসেছিল। আজ মিষ্টি পোলাও করেছে মগনলাল, কচি পাঁঠার মাংস, দই দিয়ে রুই মাছের রেজালা। ভোঁদাই কোথা থেকে বটের মেরে এনেছিল তাই বটেরের কাবাব। ছোলার ডাল, নারকোল দিয়ে তোমারই জন্যে, সঙ্গে ফুলকো-লুচিও করতে বলেছি। পেঁপের চাটনি, দুখুয়ার দোকানের কাঁচাগোল্লা আর রাবড়ি। আজ খাও তারপরে পরের সপ্তাহেও আবার হবে। তিনদিনের জন্যে আসবে বলেছে ও।

তারপর বিশ্বাস-কাকিমা বললেন, খাওয়া দাওয়া তো আছেই। তার আগে কটা গান শোনাও তো আমাদের।

ভোঁদাই বলল, বৌদি আজ তোমার সামনে দাঁড়ানোর মতো বুকেরপাটা আমার নেই। শুধু আমার কেন, কোনো পুরুষেরই হবে না। সব পুরুষেরাই কচুকাটা হয়ে যাবে আজ। পুটুস না এসে ভালই হয়েছে। এলে তার প্রাণই যেত আজ। বলো মা! এতো সুন্দরী হওয়ার কোনো মানে হয়? বৌদির জন্যেই আমার বিয়ে করা হলো না। হবেও না এ জন্মে।

ওমা! এ আবার কী কথা!

সিমলি হেসে উঠে বলল। দীপিতা বিব্রত হয়ে মুখ নামিয়ে নিল।

ও তুই বুঝবি না। তোর দাদার, মানে অমলদার হাতখানা একদিন দেখিস, মানে হাতের পাতা। আরে সাব্বাশ। ফেট-লাইনখানা কী! একেবারে এধার থেকে ওধারে চলে গেছে। আর এই দ্যাখ আমারটা। আধখানা আসার পর ছাগলে মুড়িয়ে খেয়ে দিয়েছে। বুঝলি না, কপালে গোপাল করে। যার কপাল-ফাটা তার সবই ফাটা।

তোমাকে কিন্তু ডাকছে তোমার অমলদা নীচে।

দীপিতা বলল, ভোঁদাইকে।

যাচ্ছি। একা তো আর নেই। রামবাবুকে দেখলে না?

প্রথমে বুঝতে পারেনি দীপিতা। বুঝতে পেরে, হেসে বলল, ও হ্যাঁ। দেখলাম বটে।

তবে আর কী। যাচ্ছি। একটা গান আমিও শুনে যাই। তবে, অন্যদিকে চেয়ে শুনব।

কেন? অন্যদিকে চেয়ে কেন?

আরে সেই যে, শায়েরী আছে না একটা?

কি? আমি শায়েরী জানব কোত্থেকে? কার শায়েরী?

কার অত মনে নেই, মীর্জা গালিব বা জওক বা জীগর মোরদাবাদী বা ফিরাখ গোরখপুরী কারো হবে। সেই যে...

আহা! বলোই না।

"অ্যাইসা ডুবা হুঁ তেরী আঁখো কি গেহরাইমে

হাঁথমে জাঁম হ্যায়, মগর পীনেকি হোঁস নেহি।"

মানে কি হল?

মানে হলো, তোমার চোখের গভীরে আমি এমনিই ডুবে গেছি যে হাতে আমার পান-পাত্র ধরাই আছে, কিন্তু চুমুক দিতেও ভুলে গেছি। জাঁম মানে পান-পাত্র, জানো কি? তারপর বলল, তুমি আজ এমন করে কাজল পরেছ না বৌদি! তুমি আজ সত্যিই প্রাণঘাতিকা।



রক্তর নানারকম রিপোর্ট, এক্স-রে'র প্লেট, ই.সি.জি.-র গ্রাফ সব মনোযোগ দিয়ে দেখার পরে ডাক্তার ঝাঁ স্টেথোটা ভোঁদাই-এর বুক থেকে নামিয়ে ওর নাড়ি টিপে বসে রইলেন। জ্বর এখন একশ পাঁচ। ভুল বকছে। জ্বর এসেছে চারদিন হলো। দোতলাতে ওর ঘরে মা এবং পিসীমা। দীপিতা ওর পায়ের কাছে শুকনো মুখে দাঁড়ানো।

ডাক্তারবাবু এসেছেন প্রায় ঘণ্টাখানেক। আজকালকার কোনো ডাক্তার কোনো একজন রোগীর জন্যে এত সময় ব্যয় করেন না অনেক অর্থের প্রলোভন ছাড়া। অনাদি বিশ্বাস, ভোঁদাই-এর বাবা, ডাক্তার ঝাঁ-র প্রথম জীবনে অনেকেই রকম সাহায্য করেছিলেন। সে কথা ডাঃ ঝাঁ ভোলেননি। এখনও কিছু মানুষের বুকে কৃতজ্ঞতাবোধ বেঁচে আছে হয়তো।

ওঁরা একেকজনে একেক জিনিস আনতে গেছিলেন। সিমলি ওদের কলেজের ফাংশানে যাবার আগে ওখান থেকে ফিরে গিয়ে বলেছিল দীপিতাকে, বৌদি! তোমার কাছে ওডিকলোন আছে? একটু নিয়ে যাও না ভোঁদাইদাদের বাড়ি। ভোঁদাইদা বোধহয় বাঁচবে না। মাও তো গেছিল কাল রাতে। কাকীমা বললেন, তোমার কথা নাকি খুব বলছে।

দীপিতা চুপ করে রইল। খবর তো সবই পায় কিন্তু যেতে লজ্জা করে। ভয়ও করে। অমল আজকাল যেন কেমন ব্যবহার করছে দীপিতার সঙ্গে। ভোঁদাই যে দীপিতাকে ভীষণ পছন্দ করে তা তো ভোঁদাই কারো কাছেই গোপন করে না। মনে পাপ থাকলে কি করত? তাছাড়া পাপেরই বা কি? ভাললাগা, ভালবাসা কি পাপ?

দীপিতা, সিমলিকে বলল, তাই?

তারপর বলল, যাচ্ছি।

ভয়ে ওর বুক দুরদুর করে উঠল। ওর কথা যে ভোঁদাই বলছে, এ কথা অন্নদা জানলে নতুন করে নিগ্রহ শুরু হবে ওর উপরে। হয়তো জেনেছেন বলেই দীপিতাকে যেতে বলেননি। অমলও বলেনি ওকে যেতে। কিন্তু সিমলি বলেছে। এবারে যাবে দীপিতা।

শাড়িটা বদলে একটা সাদা-কালো কটকী শাড়ি পরে ওডিকোলনের বড় শিশিটা নিয়ে চলে এসেছিল। কাকীমা আর পিসীমা খুবই খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু ভোঁদাই-এর চোখ বন্ধ। জ্ঞান নেই।

অমল ভোরেই বেরিয়ে গেছে। কাল রাতে একবার গেছিল মিনিট পনেরোর জন্যে ভোঁদাইকে দেখতে। অথচ ওর এর চেয়ে অনেক বেশী কনসার্নড হবার কথা ছিল। ওদের বাড়িতে ভোঁদাই ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষ নেই। ডাক্তার-টাক্তার সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়ার ছিল।

প্রয়োজনে নার্সিং হোম-এ দেবে কি না...না, সেসব-এর কিছুই করেনি। করবার মধ্যে করছে ইমরাত। আর বিটকেল খাটের পাশে বসে রয়েছে সর্বক্ষণ। যে যা বলছে, করছে। কাত্যায়নী দিদিও সকাল-সন্ধে এসে খোঁজ নিয়ে যাচ্ছে। গরীবে তো পয়সা দিয়ে ভালবাসা দেখাতে পারে না, শুধু শরীর দিয়ে, সেবা দিয়ে, উদ্বেগ দিয়েই পারে।

আরও বসে আছে পিশাচ, খাটের নীচে, রামলগন যাকে পীযুষ বলে ডাকে। কুকুরের ভালবাসা যে অনেকাংশে অকৃতজ্ঞ মনুষ্য-জাতের ভালবাসার চেয়ে অনেকই পবিত্র, অনেকই গভীর, তা এমন এমন সময়ে বোঝা যায়। পিশাচ খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে দু'দিন হলো, ভোঁদাই অজ্ঞান হয়ে যাবার পর থেকেই।

ডাঃ ঝাঁ বিশ্বাস-কাকীমাকে জিজ্ঞেস করলেন, দীপিতা কওন হ্যায় ভাবীজী?

দীপিতা?

কাকীমা ও পিসীমা চমক উঠে বললেন।

দীপিতা ওডিকোলোনের শিশিটা তেপায়ার উপরে রেখে বলল, আমি বারান্দাতে আছি কাকিমা। আমাকে ডাকবেন, ডাক্তারবাবু চলে গেলে।

এসো মা। তবে চলে যেও না।

দীপিতা বাবান্দাতে দাঁড়িয়ে গামহার আর কৃষ্ণচূড়া গাছগুলোর দিকে চেয়ে রইল। ওর খুব ভয় করছিল। আটদিন আগে শনিবার সন্ধেবেলা ভোঁদাই ওদের বাড়িতে এসেছিল। ব্রজেনবাবু তো গাড়োয়া গেছিলেন। শাশুড়ি ও সিমলি সাইকেল রিক্সাতে করে মাধুরী দীক্ষিতের কী একটা ছবি হচ্ছে সিনেমা হল-এ, সেই ছবি দেখতে গেছিলেন। ভোঁদাই হয়তো সব জেনে শুনেই এসেছিল। পুঁটি ছিল সুরাতিয়ার কাছে দোতলাতে। ভিখু গেছিল শাশুড়ির পানের সব সরঞ্জাম আনতে। দীপিতা শোবার ঘরে বসে 'নবকল্লোল' পড়ছিল। 'নবকল্লোল', 'তথ্যকেন্দ্র', আর 'সংবাদ প্রতিদিন' এই তিনটি পত্রিকা চেয়ে এনেছিল বিশ্বাস-কাকীমার কাছ থেকে দীপিতা। "সংবাদ প্রতিদিন" দৈনিক কাগজটাও দিনকে দিন ভাল হচ্ছে।

ভোঁদাই ঘরে ঢুকেই বলেছিল, কী করছ একা একা?

ওর মুখে মদের গন্ধ পেল দীপিতা।

তুমি মদ খেয়ে এসেছ?

হ্যাঁ। আমি মিথ্যা বলি না। আজ খেয়েছি। কিন্তু খাই না। কেন?

আজ তোমাকে একটা চুমু খেতে এসেছি।

খুব রেগে দীপিতা দাঁড়িয়ে উঠল। বলল, তোমার সাহস তো কম নয়।

কারোকে ভালবেসে ভীষণ কষ্ট যারা পায় তারা বুঝি খুব সাহসী? তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না দীপিতা। তোমাকে আমি বিয়ে করব।

তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

সে কথা বলল বটে কিন্তু ওর মাথার মধ্যে পৃথিবী ঘুরে গেল। কিন্তু তারই সঙ্গে মুক্তির আভাস পেল যেন ও হঠাৎ। যে কয়েদীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়েছে তাকে যদি হঠাৎ ছুটি হয়ে গেছে এ কথা কেউ এসে বলে তার মনে যেমন হয়, তেমন আর কী!

কিছুক্ষণ মুখ নামিয়ে চুপ করে থেকে ভোঁদাই বলল, তা বলতে পারো। কিন্তু গত এক বছর হলো এ নিয়ে আমি ভেবেছি। তুমি কি কিছুই বুঝতে পারোনি? সত্যি করে বল তো?

তোমাকে এ বাড়িতে নানা কষ্ট সহ্য করতে হয়। আমার মা-পিসীমাও সে কথা জানেন। তোমাকে নিয়ে গেলে ওঁরা তোমাকে মাথায় করে রাখবেন। তুমি এখানে নষ্ট হয়ে যাচ্ছ, তিল তিল করে ফুরিয়ে যাচ্ছ দীপিতা। তা আমি হতে দেবো না। তুমি অমলদাকে ডিভোর্স করো। চলো আমাদের বাড়িতে। পুঁটিকেও নিয়ে যাব। তোমাদের সঙ্গে পুঁটিকেও আমরা পুরো পরিবার সানন্দে গ্রহণ করব। সত্যি বলছি। আমি আমার মা ও পিসীর মন বুঝেই এ কথা বলছি। পুঁটিকেও এরা নষ্ট করে দেবে। এই পরিবারের অনেক নোংরা কথা আমি জানি। কিন্তু তোমাকে বলব না। আমি তোমার পিশাচ হয়ে থাকব বাকি জীবন। বিশ্বাস করো।

তুমি এখন যাও ভোঁদাই। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বড়ই ছেলেমানুষ তুমি।

এসো, কাছে এসো, তোমাকে একটা চুমু খাব, তোমার বুকে একটু মাথা রাখব। তোমার ছায়াতে একটুক্ষণ থাকব। পৃথিবীতে বড় রোদ্দুর বৌদি।

বলেই, দীপিতার কাছে এসে তার কোমর দু'হাতে জড়িয়ে ধরল ভোঁদাই।

ঠাস করে এক চড় মারল ওকে দীপিতা। এত জোরে মারল যে, ওর গালে পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেল।

স্তম্ভিত হয়ে গেল ভোঁদাই। ওর ওপরে জোর করল না, ওর ওপরে রাগ করল না, স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল দীপিতার দু'চোখে। ঝরঝর করে জল ঝরতে লাগল ছ'ফিট লম্বা, সুগঠিত ভোঁদাই-এর দু'চোখ দিয়ে।

তারপর ও মুখ নামিয়ে বলল, ক্ষমা কোরো আমাকে তুমি।

বলেই, যেমন এসেছিল, তেমনই দ্রুত চলে গেল ঘর ছেড়ে।

সিমলির কাছে শুনেছিল দীপিতা যে ডাঃ ঝাঁ গতকাল রাঁচীর মেন্টাল হসপিটালের ডাঃ সেনকে কল দিয়ে নিজের গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে এসেছিলেন ভোঁদাইকে দেখাতে। কোনো এক্সট্রিম মেন্টাল শক-এর জন্যেই নাকি এই সাংঘাতিক জ্বর হয়েছে। দীপিতা জোর করে হেসে, মুখে হাসি রেখে বলেছিল, চোরা-শিকার করতে গিয়ে ধরা পড়ল না কী? নাকি কারো প্রেমে পড়ে হতাশ হয়েছে! পড়তে পারে। প্রেমে পড়া তো অপরাধ নয়।

কার প্রেমে পড়ল?

সিমলি অর্থবহ স্বরে বলেছিল, তা কী করে বলব। তুমিও যতটুকু জানো, আমিও ততটুকুই। তবে আমার প্রেমে যে পড়েনি তা তুমি নিশ্চয়ই জানো।

বেশ কিছুদিন হলো সিমলি তার বন্ধু মাধবীর দাদার প্রেমে পড়েছে বলে মনে হয়। বড় ঘন ঘন মাধবীদের বাড়ি যাচ্ছে। সেদিন সে সিনেমাতে গেছিল তাও মাধবীর দাদাই টিকিট কেটে নিয়ে গেছিল। মাধবীর মা-ও নাকি যাবেন। হয়তো তাই, প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে প্রেমে পড়া যে অপরাধ নয় এই স্থবির সত্যকে নতুন করে আবিষ্কার করেছে ও। তাদের কাছে না হলেও, প্রেমে পড়া অন্যদের কাছে যে গর্হিত অপরাধ এ কথা এখনও বোঝেনি সিমলি। তার বাবা ব্রজেন করের অন্য মূর্তি যখন দেখবে তখন জানবে।

মাধবীদের অবস্থা একেবারেই ভাল নয়।

ছেলের বৌ আনবার সময়ে অসহায় মেয়ে দেখে আনেন কর পরিবার আর মেয়ের বিয়ে দেবার সময়ে সম্পদশালী ক্ষমতাবান পরিবারের খোঁজ করেন।

দীপিতা মুখে বলেছিল, তুই যা তোদের কলেজের ফাংশানে, তোর দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি যাচ্ছি।

চোখে একটু কাজল দিয়ে, খোলা চুলটাকে এলো খোঁপা করে, শাড়িটা বদলেই ওডিকোলোনটা নিয়ে চলে গেছিল দীপিতা।

ডাক্তার ঝাঁ আরও মিনিট পনেরো পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বিশ্বাস-কাকীমা সঙ্গে এলেন। পিসীমা ঘরেই রইলেন ভোঁদাই-এর কাছে। ডাক্তার ঝাঁ-এর ব্যাগ বয়ে নিয়ে গেল রামলগন। কাকীমা সিঁড়ির মুখ অবধি পৌঁছে দিলেন। কাকীমাকে ফিরে আসতে দেখেই দীপিতা বাইরে থেকে ভিতরে মুখ ফেরাল।

কাকীমা বললেন, চা খাবি দীপিতা?

কখনও তুই করে বলেননি উনি দীপিতাকে। আজ বললেন। কেন, কে জানে!

তারপর বললেন, চল, খাবার ঘরে যাই।

মগনলালকে চা ভেজাতে বলে খাবার টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে, দীপিতাকে বসিয়ে বললেন, আমার ছেলের জীবন এখন তোরই হাতে। তোর সঙ্গে কি কোনো ঝগড়া-টগড়া হয়েছিল ভোঁদাই-এর?

না তো।

বলল, দীপিতা।

সত্যি করে বল মা। আমার একটি মাত্র সন্তান। তোর পিসীমাও নিঃসন্তান। ও ছাড়া আমাদের কেউই নেই। ওর প্রয়োজন নেই তাই ও চাকরি বা ব্যবসা করে না, কিন্তু ছেলে তো ও খারাপ নয়। মাঝে মাঝে একটু মদ-টদ খায়, সে আজকাল কেই বা না খায়? ইচ্ছে করলেই ব্যবসা করতে পারে। আজ অবধি ওর মন কারোতেই বসেনি। একমাত্র তুইই ব্যতিক্রম। তুই হয়তো জানিস না, পড়াশোনাতেও ও খুব ভাল ছিল। কিন্তু ইংরেজিতে বি.এ. করার পরে আর পড়ল না। গান-বাজনা, সাহিত্য, খেলাধুলো, ছবি আঁকা, শিকার সব ব্যাপারেই ওর তুমুল উৎসাহ ছিল। জীবনকে ও দারুণ ভালবাসে। আমার সন্তান বলে বলছি না, মানে...

এসব কেন বলছেন কাকীমা আমাকে?

ভোঁদাই তোকে ভালবাসে। এতো ভালবাসা সম্ভবত কম মানুষই কম মানুষকে বাসে। তুই বিয়ে হয়ে এখানে আসার পরমুহূর্ত থেকে ও তোর প্রেমে পড়েছে। আমি ওর মা, ওর কষ্ট আমি সব বুঝি। কিন্তু আমার করার তো কিছুই নেই। না তোর, না ওর, না আমাদের! ও যে তোর জন্যে কত কষ্ট পেয়েছে ও পাচ্ছে সে আমরাই জানি। ওর স্বভাবটাই কেমন হয়ে গেছে। মনমরা, উদাসীন।

আমি কী করতে পারি কাকীমা...

তুইও তো কর-বাড়িতে গত পাঁচ বছরে কম কষ্ট পাসনি। এখনও তো আনন্দে নেই। তোর বাপের বাড়ি বলতেও কিছু নেই যে রাগ দেখিয়ে সেখানে গিয়ে দু'দিন কাটিয়ে আসবি মন শান্ত করতে। তোকেও তো বুঝি আমরা। তোকে কথা দিচ্ছি আমি, তোর ছেলেবেলাতে হারিয়ে-যাওয়া মায়ের অভাব পূরণ করব। আমাদের, মানে পিসীমারও যা-কিছু আছে সবই তোর, ভোঁদাইসুদ্ধু।

আমি কী করতে পারি...

আবারও বলল একই কথা দীপিতা, যেন ঘোরের মধ্যে।

তুই ও বাড়ি ছেড়ে আমাদের বাড়ি চলে আয়।

স্তম্ভিত হয়ে গেল দীপিতা সে কথা শুনে। এমন প্রস্তাব যে কেউ দিতে পারেন তা অভাবনীয়।

এমন সময়ে পিসীমাও এলেন।

কী হলো দিদি, তুমিও চলে এলে?

ইমরাত আর ঝাণ্ডুরাম এসেছে।

তাই?

ওরা আছে। কিন্তু ওরা খেতে যাবে। খেয়ে আবার ফিরে এসে থাকবে নীচে, রাতে।

পিসীমা বললেন, দীপিতা চা খেয়ে আয় মা, একটু ওডিকোলনের জল-পট্টি দিয়ে দিবি কপালে। অজ্ঞানাবস্থায় সমস্তক্ষণ তোর নামই বলেছে। ডাক্তার খাঁ-ও শুনেছেন। তিনি তো জানেন না দীপিতা কে? তাই আমাদের জিজ্ঞেস করছিলেন।

তাহলে তুমি ইমরাতদের এখন যেতে বলো। বলো, খাওয়া-দাওয়া করে আসুক। রাতে একজনের তো থাকা দরকার। রাত-বিরেতে কী দরকার হয়। ওরা চলে গেলে দীপিতা যাবে চা খেয়ে ঘরে।

কাকীমা বললেন।

তাই ভাল।

পিসীমা বললেন।

চা খাওয়া হলে দীপিতা গিয়ে একটা চেয়ার নিয়ে ভোঁদাই-এর মাথার কাছে বসে ওর কপালে ওডিকোলনের জলপট্টি দিতে লাগল একটা রুমালে ভিজিয়ে। একটি কাপে ওডিকোলোনের সঙ্গে জল মিশিয়ে নিয়েছে। এখন টেবল-লাইটটা জ্বলছে শুধু ঘরে। আলোতে দেখা যাচ্ছে টেবিলের উপরে সাজানো আছে অমিতাভ দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং জয় গোস্বামীর কবিতা। ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় আর বাণী বসুর লেখার খুব ভক্ত। আসলে সব বই আছে ওর লাইব্রেরি ঘরে। তথ্যকেন্দ্র, দিশা, বিভাব, কবিতা-পাক্ষিক, এসব দীপিতা তো এ বাড়ি থেকে চেয়েই পড়ে। তাদের বাড়িতে শাশুড়ি শুধু সাপ্তাহিক বর্তমান রাখেন।

টেবল লাইটটার আলো এসে ভোঁদাই-এর মুখের একটা পাশে পড়েছে। থুতনিতে। সাতদিন দাড়ি না-কামানোতে মাজা রঙের ওপরে ফলসা রঙা ছায়ার মতো দাড়ি গজিয়েছে। ও একবার দেখবার চেষ্টা করল ওর মারা চড়ের দাগটা এখনও ভোঁদাই-এর গালে আছে কি না।

ভোঁদাই-এর ভাল নাম অনিকেত। কিন্তু ও নামে কেউই তাকে ডাকে না। এতো কাছ থেকে এতো মনোযোগ দিয়ে কখনও তাকায়ওনি ও ভোঁদাই-এর মুখের দিকে। দেখতে সে বেশ ভালই। ফিগার তো দারুণই ভাল। সরু কোমর, চওড়া বুক, লম্বা ঘাড়, একমাথা অবাধ্য চুল, কিন্তু তার ওপরে মুখটিও সুন্দর। সবচেয়ে বড় কথা, মানুষটি শরীরসর্বস্ব নয়, তার একটি সুন্দর, সুরুচিসম্পন্ন, রসিক, দরদী মন আছে। এতোদিন ইয়ার্কির ছলে অনিকেত যা-কিছু বলে এসেছে দীপিতাকে সকলের সামনে এবং একা পেয়েও, তা যে ইয়ার্কি নয়, মর্মান্তিক সত্যি একথা এই বেহুঁশ অনিকেতের পাশে বসে উপলব্ধি করল দীপিতা।

অস্পষ্ট গোঙানির সঙ্গে চোখ চাইল আস্তে আস্তে অনিকেত। চোখ মেলে, তার মুখের ওপরে ঝুঁকে-পড়া দীপিতার মুখটিকে দেখেই আতঙ্কে অথবা আনন্দে তার দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। তারপরই বিড়বিড় করে বলল, ক্ষমা কোরো, ক্ষমা কোরো।

তখন ঘরে আর কেউই ছিল না। ভোঁদাই-এর গলার স্বর শুনতে পেয়ে খাটের তলাতে শুয়ে-থাকা পিশাচ তড়াক করে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে তেপায়াটার পায়ে ধাক্কা দিতেই ওডিকোলনের কাপটা পড়ে ভেঙে গেল। এমন সময়ে বিটকেল এল ঘরে। দীপিতা কাকীমাকে ডাকতে বলল তাকে।

ওঁরা দু'জনেই দৌড়ে আসতেই দীপিতা বলল, চোখ মেলেছিল। কথাও বলেছিল। বিড়বিড় করে কী বলছিল, বুঝতে পারিনি। কাপটা ভেঙে গেল। পিশাচ।

অন্য একটা কাপ আনছি, বলে পিসীমা চলে গেলেন।

এবারে ভোঁদাই পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। প্রথমে কাকীমার দিকে, তার পর দীপিতার দিকে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, কটা বেজেছে?

ন'টা। মা তুমি এতক্ষণ বৌদিকে আটকে রেখেছ! অমলদা রাগ করবে।

রাগ করবে কেন? সে কি অবুঝ? না অমানুষ?

কাকীমা বললেন।

না, বকবে বৌদিকে।

আরে না, না। চলে যাবে দীপিতা একটু পরে।

হ্যাঁ। তা তো যাবেই। যেতে তো হবেই বৌদিকে। সন্ধ্যে হলেই পশুপাখি মানুষ সকলেই যে যার ঘরে ফিরে যায়। যার যার নিজের ঘরে। এখন রাত। তুমি চলে যাও বৌদি তোমার নিজের ঘরে।

এবারে মাঝে মাঝেই চোখ মেলতে লাগল ভোঁদাই। দীপিতার অনিকেত।

জ্বরটা কি নামছে?

দীপিতা নতুন পট্টি লাগাবার সময়ে ওর কপালে ডান হাতের পাঁচটি আঙুল ছোঁয়াল। কেঁপে উঠল ভোঁদাই। শীতে, না ভয়ে, না আনন্দে, তা সেই জানে।

কাঁপুনি দিয়ে ছাড়ছে জ্বর।

পিসীমা স্বগতোক্তি করলেন।

দীপিতা ভাবছিল, কিসের কাঁপুনি, কেন কাঁপুনি, কে জানে!

কী রে ভোঁদাই, কেমন লাগছে এখন?

ভাল।

কিছু খাবি?

হুঁ।

ডাক্তার খাঁ বলেছেন সাবুর খিচুড়ি দিতে। খাবি?

হুঁ।

বাবাঃ ধড়ে প্রাণ এল আমাদের।

পিসীমা হেসে বললেন।

ভোঁদাই ওর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল দীপিতার দিকে। কাকীমা ও পিসিমা উদ্বিগ্ন এবং অপ্রতিভ মুখে তাকিয়ে ছিলেন দীপিতার মুখের দিকে। একমুহূর্তে কী ভেবে দীপিতা তার

ডান হাতটা ভোঁদাই-এর হাতের দিকে বাড়িয়ে দিল, ডুবন্ত মানুষ যেমন করে কুটোকে আঁকড়ে ধরে, যেন তেমন করেই আঁকড়ে ধরল ও দীপিতার হাতের পাতাকে। দীপিতা আলতো করে চাপ দিল অনিকেতের হাতে।

ভোঁদাই এমন করে দীপিতার হাতটি ধরল যেন আর কোনোদিনও ছাড়বে না।

পাঁচ মিনিট পরেই ভিখু এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলল, বহুদিদি, বড়দাদা ঘর লওটা হ্যায়। আপকি বোলা রহা হ্যায়।

ভোঁদাই-এর মা ভিখুকে মাথায় হাত দিয়ে বললেন, যাকর বোলনা, হামে সবেহি হিঁয়া হ্যায়, বহুদিদিকে আভি ভেজ দুংগা। হামারা নাম লেকর বোলনা। সমঝা না ভিখু!

জী মাইজী! সমঝা।

বলে, ভিখু চলে গেল।

দীপিতাকে যখন রামলগন ওদের বাড়ির গেট-এ পৌঁছে দিয়ে এল তখন রাত দশটা বাজে। দীপিতা ভাবছিল, আজ অমলের চাতরাতেই তো রাতে থেকে যাবার কথা ছিল। ফিরে এল যে বড়!

বারান্দা পেরিয়ে ঘরে ঢুকতেই অমল বলল, বিদ্রূপের সঙ্গে, কাঁহা চলে গ্যেয়ীথী আপ দীপিতাজী?

দীপিতার ইচ্ছে করল ওয়ার্লর্ড-কাপ-এর সময়ে একটা বিজ্ঞাপনে রানী মুখার্জি যেমন করে বলেছিল তেমন করেই বলে, 'হামারা আসলি হিরো কি পাস।'

তোমার তো আজ ফেরার কথা ছিল না।

তারপর বলল, তুমি জানো না?

জানি না, কিছুই জানি না। ফিরব না জেনে, রাতভর থেকে যাবে প্রেমিকের কাছে। তাই কি ঠিক করেছিলে?

কে প্রেমিক?

বাজে কথা বলো না। বিমল আমাকে সব বলেছে। বলছে, বহুদিন থেকে। আমিই বিশ্বাস করিনি বোকা বলে।

আকাশ থেকে পড়ে দীপিতা বলল, বিমল! অতটুকু ছেলে! ও কী বলেছে?

ওই তো আজকে ফোন করে বলল বিকেলে আমাকে চাতরাতে। গত বুধবার রাতে আমি যখন ছিলাম না তখন তোমার সঙ্গে রাত কাটিয়ে যায়নি ভোঁদাই? সপ্তাহে দু'তিনদিন দুপুরে আসেনা ও তোমার কাছে?

কী বলছ কী তুমি!

আতঙ্কিত ও আহত গলাতে বলল, দীপিতা।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে অমল বলল, সত্যি কথা বল, সে রাতে সে আসেনি তোমার কাছে?

দীপিতা বুঝল, অমলের নেশা হয়ে গেছে। চেয়ারের পাশে একটা মহুয়ার বোতল। অন্য একটা পড়ে আছে নীচে।

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে দীপিতা বলল, হ্যাঁ। আমি মিথ্যে বলি না। এসেছিল।

এসেছিল? তুমি মিথ্যে বলো না বলে আবার গর্ব করে বলছ!

বলেই, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে দীপিতাকে প্রচণ্ড শব্দে এক চড় মারল অমল।

দীপিতা মাথা ঘুরে খাটের ওপরে পড়ে গেল। জোরে চিৎকার করে কেঁদে উঠতে গেছিল সে কিন্তু একটা ভোঁতা হ্রস্ব আওয়াজ তার গলা অবধি উঠে স্তব্ধ হয়ে গেল।

অমল ঘৃণাভরে তাকে চুলের মুঠি ধরে তুলে আবারও এক চড় মারল, দীপিতার 'আর মেরো না' বলবার মুখে।

তারপর বলল, কলকাতার রান্ডী! যাও, ভিখুকে বলে এসো আমার খাওয়ার নীচে নিয়ে আসতে।

পরক্ষণেই বলল, না তুমি নিজে যাও। আমার খাওয়ার নিজে হাতে বয়ে নিয়ে এসো। সব যেন গরম থাকে। আমি চানে গেলাম।

বলেই, বাথরুমের দরজা বন্ধ করল প্রয়োজনের চেয়ে অনেকই জোরে। 'দড়াম' শব্দটা মাথার মধ্যে দপদপানি তুলল। দীপিতা একমুহূর্ত ভাবল। তারপরে ঘরের বাইরে এসে দোতলার সিঁড়ির সামনে দাঁড়াল সামান্যক্ষণ। তারপরেই গেট খুলে বাইরে বেরিয়ে ভোঁদাইদের বাড়ির দিকে এগোল।

এমন সময়ে দোতলার তাঁর শোবার ঘরের লাগোয়া ছোট ঝুল-বারান্দাতে দাঁড়িয়ে অন্নদা বললেন, এত রাতে কোথায় চললে? বৌমা!

দীপিতা মুখ না-তুলে, কথা না-বলে, বিশ্বাস-বাড়ির দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

সিমলি, মাধবীদের বাড়ি থেকে দীপিতা ফেরার পরে পরেই ফিরেছিল। মাধবীর দাদা রণেশের গলা শুনেছিল দীপিতা। সাইকেলে ডাবল-ক্যারী করে পৌঁছে দিয়ে গেল সম্ভবত ও সিমলিকে। হয়তো কলেজের ফাংশানের নাম করে নদীর ধারে গেছিল। বা ওদের বাড়িতেই বসে গল্প করছিল। ভদ্রলোকের বাড়ি সেটা, গল্প করতেই পারে। কর-বাড়ির মতো ছোটলোকের, অসুস্থ মানসিকতার মানুষদের বাড়ি নয় তো! সিমলি তার মায়ের পাশে বারান্দাতে দাঁড়িয়ে বলল, যাও বৌদি, চলে যাও। আর ফিরে এসো না। অনেক অপমান, অনেক কষ্ট সয়েছো এখানে তুমি। আর এসো না।

অন্নদা সিমলির হাত ধরে হিড়বিড় করে টেনে তাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। ঠাস! করে একটি শব্দ হলো। সম্ভবত অন্নদা সিমলিকে চড় মারলেন।

পরমুহূর্তেই অন্নদা বাইরে এসে বললেন, পুঁটিকে আমি তোমার কাছে একমুহূর্তের জন্যেও পাঠাব না। কাল সকালেই তো ফিরে আসতে হবে। যাও আজ গোসা-ভাঙিয়ে এসো। গোসাঘরে চললেন বিবি! ছিঃ! ছিঃ।

মুখ না তুলেই বলল দীপিতা, আর আসব না আমি।



গেট বন্ধ করে পিশাচকে ছেড়ে দিয়েছিল রামলগন। রামলগনের "পীযুষ"। বাকরুদ্ধ কণ্ঠে দীপিতা বলল, রামলগন, পিশাচকে বাঁধো।

দীপিতার গলার স্বর শুনে ভোঁদাই-এর মা-পিসীমা দোতলার বারান্দাতে এসে দাঁড়ালেন এবং ঠিক সেই সময়ে ইমরাত খাঁ তার সাইকেল করে গেট-এর কাছে এসে পৌঁছল। তার গালে অমলের পাঁচ আঙুলের দাগ, এলোথেলো চুল এবং চোখের জল পৃথিবীর কারো কাছেই আর লুকোবার প্রয়োজন মনে করল না দীপিতা।

ইমরাত পূর্ণ দৃষ্টিতে দীপিতার মুখের দিকে একমুহূর্ত চেয়ে থেকে কী ভেবে রামলগনকে বলল, রামলগন ম্যায় আভ্‌ভি আয়া লওটকে। তুম ভাবীকে উপ্পর লে যাও।

বলেই, সাইকেল ঘুরিয়ে চলে গেল।

দোতলার বারান্দাতে পৌঁছবার আগেই কাকীমা আর পিসীমা ওকে দেখে দৌড়ে একতলাতে নেমে আসছিলেন। সিঁড়ির দেড়তলার ল্যান্ডিং-এ দেখা হলো ওঁদের দীপিতার সঙ্গে। দীপিতার মুখের দিকে চেয়ে ঐ অবস্থা দেখে দুজনে একই সঙ্গে কেঁদে উঠলেন।

পিসীমা বললেন, আমাদের জন্যে তোমার! ইস্‌স্‌!

কাকীমা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আয়। আয়। মা। তিন বছর বয়সে মাকে হারিয়েছিলি, আমি আজ থেকে তোর মা হলাম। তোকে আর ছাড়ব না।

পুঁটিকে আনলে না?

পিসিমা বললেন।

না। ও তো আমার নয়। ও টেস্ট-টিউবেও হতে পারত। ও অমলের আর আমার শ্বশুর-শাশুড়ির। হয়তো সুরাতিয়ারও। কিন্তু আমার নয়। ও বাড়ির কোনো স্মৃতিই আমি রাখবো না।

তোমার মায়ের দেওয়া সেই গার্নেটের মালাটাও? সে তো ওদের নয়, তোমার মায়েরই তো।

পিসীমা বললেন।

ভোঁদাই-এর মা বললেন, আমি ওকে ঠিক ওর মায়ের দেওয়া মালারই মতো গার্নেটের মালা-গড়িয়ে দেব। আর আমার বৌমার জন্যে তো সব গয়না গড়ানোই আছে। গয়নাতে মুড়ে দেব ওকে।

দীপিতা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, আমার কিছুই চাই না মা, শুধু একটু ভালবাসা...

ভোঁদাই-এর মা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি, ছোড়দি, ভোঁদাই, রামলগন,

পিশাচ—আমরা সকলে তোকে ভালবাসায় মুড়ে দেব। তুলোর মধ্যে করে রাখব তোকে। তোকে জীপে চড়তে হবে না। মারুতি কিনে দেব তোকে তোর পছন্দসই রঙের।

ভোঁদাই এই সব উচ্চগ্রামের কথাবার্তাতে সচকিত হয়ে বিছানার ওপরে উঠে বসার চেষ্টা করছিল। ওঁরা ঘরে ঢুকে হাঁ হাঁ করে উঠলেন। বললেন, পড়ে যাবি পড়ে যাবি।

তুমি যে আবারও এলে!

আধশোয়া হয়েই বলল, ভোঁদাই।

তোরা কথা বল। আমি দেখি সাবুর খিচুড়ির কতদূর হলো।

কাকীমা বললেন।

তারপর বললেন, চলো ছোড়দি, ওদিকটা দেখি গিয়ে আমরা। সকলেই আজ সাবুর খিচুড়ি খাব।

দীপিতা গিয়ে ভোঁদাই-এর সামনে দাঁড়াল। প্রথমে ভোঁদাই যেন বুঝতে পারেনি, তারপরই টেবিল-লাইটের আলোতেই তার গালে পাঁচ-আঙুলের দাগ দেখতে পেয়ে ব্যথায় নীল হয়ে গিয়ে বলল, এমনও কেউ করতে পারে? পিশাচ আমার পিশাচ নয়, আসল পিশাচ অমলদা। ঈস্‌স্‌!

দীপিতা, অনিকেতের গালে নিজের হাতের পাতা ছুঁইয়ে আর্ধেক হেসে, আর্ধেক কেঁদে বলল, কেউ কেউ পারে।

দীপিতার মারা চড়ের দাগটা মিলিয়ে গেছিল অনিকেতের গাল থেকে। মেয়েদের হাত তো নরম হয়। মেয়েদের সবকিছুই নরম হয়। সবচেয়ে বেশী নরম হয় মন। এই সহজ কথাটা অমল কর বুঝল না।

দীপিতা বলল, তোমার অমলদাকে চিরদিনের জন্যে ছেড়ে এলাম। এবার থেকে তোমাদের বাড়িতেই থাকব।

অনিকেত দীপিতার হাতের ওপরে নিজের হাতটি রেখে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, সত্যি?

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, এতোদিনে তুমি সত্যি সত্যিই দীপিতা হলে। দীপিতা!

দীপিতা বলল।

তারপরেই ওর মনে হলো যে, ও ভুলেই গেছিল ওর মা-বাবার দেওয়া নামের একটা মানে ছিল। মানেটা এত বছর পরে ফুলের মতোই ফুটে উঠল যেন।

ইমরাত আর ঝাণ্ডুরাম একটু পরে ফিরে এসে রামলগনকে ডেকে গেট খোলাল। ওর বন্দুকটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। অমলকে বা ব্রজেন করকে এই গেটের মধ্যে আর কোনোদিনও ঢুকতে দেবে না ইমরাত এবং ভোঁদাই-এর অন্য বন্ধুরা। আসতে পারে, শুধু ভোঁদাই আর দীপিতার বিয়ের দাওয়াতে। তা নইলে নয়।

ঝাণ্ডু বলল, ইমরাতকে, তুমকো ম্যায় বোলা থা ইয়ার যো ডালটনগঞ্জকি ইয়ে রাণী মুখার্জিনেহি ভোঁদাইকি জান খায়েগা।

যোভি বোল্‌, বহতই খুবসুরত হ্যায় উও জেনানা।

স্রিফ খুবসুরতই নেই হ্যায়, এইসী লেড়কি লাখোমে এক মিলতি হ্যায়।

ইমরাত বলল।

পিশাচ যেন ওদের দুজনকে সমর্থন করে বলল, ভৌ। ভৌ।